রঙ্গিণী দুহিনা

(কাল, লগ্ন-উষা)

মানস গুহ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ বিধান সরণি
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দশ টাকা

আমার মা-কে

বাংলা উপন্যাসে ভূমিকা লেখার রেওয়াজ নেই। তবু দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

মধ্যপ্রদেশের প্রায় মধ্যভাগে বন-জঙ্গল ঘেরা গ্রাম, সেখানে পার্বত্য নদী আছে, আছে কিছু আদিম মানুষ। জাতি হিসাবে সেখানকার মানুষ-জনদের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। আর যেহেতু এটা উপন্যাস, সে-ব্যাখ্যা খোঁজারও কোন চেষ্টা করা হল না। ওদের মুখের কথ্য ভাষাও আগাগোড়া ব্যবহার করা হয় নি। তাইতে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হতো না ভেবেই এই এড়িয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের ভাষা অনেকখানি সহজবোধ্য ও রসের সহায়ক হতে পারে বলে, তাই অনুসৃত হয়েছে। আসলে এ কাহিনী ট্রি-লজি হতে পারত। আদিম জীবনে অর্থনৈতিক সভ্যতার প্রবেশ দিয়ে যার আরম্ভ। তারপর যখন ওরা সভ্যতার স্পর্শ পাচ্ছে, অপরদিকে হারিয়ে যাচ্ছে তাবৎ রীতিনীতি ও স্বাভাবিকতা। বস্তুত, উষা লগ্নের কাহিনীও তা-ই। পরে লগ্ন সন্ধ্যায় সেখানে আরেক আলোর ছবি দেখা যাবে।

পরিশেষে, এ বই ছাপার হরফে দেখে গেলে সবচেয়ে যিনি খুশী হতেন, সাহিত্যিক অগ্রজ কবি ৺সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

লেখক

ধামটারী থেকে গলুইয়া। মাঝে রাজিম।

পরে পুবের বাঁক সেরে আরো পাঁচ ক্রোশ পথ। চড়াই-উৎরাই ভেঙে লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে তার যতি।

লালকুঁয়ো!

বাওয়া মাতব্বররা বলবে, হিংনানা তকদীরে দাঃ। অর্থাৎ আসলে তাদের অদৃষ্টই এই। নদীর জল।

ঝাঁকড়া-চুলো সাণ্ডি-জোয়ান ছোকরাদের কণ্ঠে কিন্তু প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে এ-কথায়। পাড়াঘরের বুড়োবুড়ীদের মুখে তারা শুনেছে, যখন তুলকার (টাকা) ছায়া পড়ে নি এই আদিম অরণ্য-বাসীদের চোখে—এই বনভূমির রূপ ছিল অন্যরকম। ভিন্ন ভাষায় কথা কওয়া হত এই বিজন বনের বাতাসে। এখন সে-সব গেছে। সেই মিঠেল বিচিত্র সংগীত। তারা চেঁচিয়ে বলবে, তুয়ারা সিদিন হারামজাদাদির ঢুকতে দিছিলি কেনে, মোদির ই জাদান নীলবান (পবিত্রভূমি) গাঁয়ে। কেনে?

হারামজাদারা হল, বাঁড়িয়া মহাজন। শহুরে ব্যবসাদার।

অমনি মাতব্বরের মুখের কথা মিলিয়ে যায়। অপরাধ তাদের নিশ্চয় কিছু হয়েছে। একদিন ওদের সপক্ষে অনেক কণ্ঠেই ফতোয়া উঠেছিল, হাই গ, বাঁড়িয়া বলো আর যাই বলো, মেহমান সবাই। অতিথি। আর অতিথির হাজার অন্যায়ও ধরতে নেই।—সাধ কর‍্যা কেউ আপ্‌না ধরম লাই দিলে, তা'সি যিভাবেই হোক, কেউ লিতে পারে? ই কি সুস্থুর বাং। মৌমাছি? উড়ে এসে লিয়ে যাবেক?

তাদের আগমন সেই শুরু হয়েছিল। প্রথম প্রথম বিনিময় মূল্যে নানান সামগ্রী গছিয়ে গেছে। অগ্রিম ধার দিয়েছে গ্রামীণ মানুষকে ডেকে।—এগুলো ধর, ফসল উঠলে দাম শোধ করিস। বলে সাদা কাগজে বুড়ো আঙুলের টিপ নিয়েছে। অতশত বোঝে না

দেহাতী গাঁওইয়া। বুড়োরা অমনি বিগলিত মুখ হয়েছিল। তারা হেসেছে, আমরা তোদের গাতে, বুঝলি কিনা। দোস্ত যার নাম।

এইছিল তাদের প্রথম আমলের চাল। পরে, তারা এসেছে আলাদা চেহারায়। ঘাটে নৌকা এনে বলেছে, দাদন নিয়েছিলি, এবার কড়ায়-গণ্ডায় পাওনা আমাদের চুকিয়ে দে।

—কিসের পাওনা?

অমনি হেসে উত্তর হয়েছে, আমরা মহাজন রে, দে তোদের ফসল এই ঘর থেকে কিনে নিয়ে যাই।

ততদিনে নেশাটা জড়িয়ে গেছে রক্তে। বহুপ্রকার চাহিদা বেড়েছে বাওয়া কোড়া-কুড়ীর। সুতরাং অনিবার্যভাবে কায়েমী পাট্টায় আসন পাকা হয়েছে ভিন্ পারসী মানওয়াদের।

—শহরে যাওয়ার হুজ্জতি কম নাকি? নানা ঠগ-জোচ্চর আছে, জিনপরী দুষ্ট আত্মা কত। সেখানে ঘরে বসেই কাজ সারছিস, ছাখ্। আর মানুষের মতন না বাঁচলে, বেঁচে ফয়দা কি? জানিস, তোরা যেভাবে থাকিস, শহরের হাঁড়ুটাও এর চেয়ে ভাগে থাকে। নেংটি ইঁদুরটা ভাল কাটায়।

অতঃপর বহুবিধ সন্দেহের বাধা সত্ত্বেও হাসি হাসি মুখে তারা একে অন্যের কাছাকাছি হয়েছিল।

ভিন্ জাতির মানুষ এইভাবে তাদের সামাজিক জীবনযাত্রাকে ছত্রায়িত করেছে। জোয়ানরা তাই আজ সাশ্রুলোচনে কথার ঝড় তুলে বলে, মোদির কিদরাটো আসলে জখম হয়্যা গেছে। রুখে দাঁড়াব, উ সিতাম কুথা? সেই জোর কোথায়?

কুঁড়ি মেয়েরা হেসে চৌপাট হয়। এ যেন তাদের রক্তের উছল সংগীত। সামান্য অছিলায় মাতব্বররা অহোরাত্রি নিষ্পেষণ করে, ধরম বিলোনোর সন্দেহ তুলে। তারা খলখল করে হেসে উঠে বলে, সারি-সারি! মুরোদ লাই বাওয়ানী মেয়ার মন ভরানোর, মুখে সব ছোকানবুলি। বড় বড় কথা।

বয়সের বাওসী মাওকিরাও টেপা মন্তব্য রাখে। তাদের সায়ও ওইদিকেই। বুড়োরা রঙে থাকলে তাদেরকেও ছেড়ে কথা কয় না। এবং বয়েসকালে যুবতী মন একদিন তাদেরও ছিল। সুতরাং অল্প-আধটু উড়ুক্কু হওয়া একেবারে অন্যায় কর্ম মনে হয় না। তারা চোখ-ভুরু নাচিয়ে বলে, আঁখের বিষ।

তবে এই প্রকার পরিণতির কথা কে আর ভেবেছিল? এত দেখ্-ভাল ছিল নাকি কারো? জলঘূর্ণির পাক কখনো-সখনো তুহিনার গহিন হৃদয়ে ওঠেই। তুরন্ত ঢেউ আছড়ায় পাড়ে। অচিরেই আপন নিয়মে সব থেমে যায় আবার। দিক্-বিশারী থমথমে নৈঃশব্দ্য তখন বিরাজ করে পূর্বমতো।

আর, এ হল বাওয়া অনুশাসনের এক রীতিও বলা চলে। নিয়তির তুমরী সুর। মাঝে মাঝে পাখি ডেকে উঠবে ডালে। নতুন এক প্রকার সুর-কম্পন বাতাস মথিত করবে। ঘরবাসী সকলে শিউরে উঠবে তাইতে। অশুভের সূচনা দেখবে। তারপর একসময় আবার সব থেমে কোলাহলহীন নিঝুম হবে বনপ্রান্তর।

তাই বুড়োরা এখন যাই কিছু বলুক, মেয়েরা উপমা রাখবে পাটকেল-ছোড়া কথার বিপরীতে।—সাকমল, তুয়াদির সাকমল কি করল শেষ পর্যন্ত?

গাঁয়ের প্রাচীনা মেয়েমানুষ ঝউলীর ছেলে সাকমল চৌতী। তুলকার ডাকে সে-ই বুঝি প্রথম গরম খেল জাদান ঘরে। তখনো মহাজনের আনা সামগ্রীতেই নেশা আবদ্ধ ছিল গাঁওইয়া মেয়ে-মরদের। বাঁড়িয়া একজনের নাও-এ উঠে বসে সাকমল আর নামল না। পাড়ি জমাল নদী পেরিয়ে ওপারের শহরে। মাওসী নীলবান গাঁ, ঘরে বারো বছরের রূপছাঁদা জরু—কিছুর জন্যই তার মন পিছটান অনুভব করল না। পরে একদিন সংবাদ এল, সে নাকি শহরে কোন এক বেসাতী ঝুমরী মেয়েকে নিয়ে আস্তানা বেঁধেছে।

সেই ক্ষোভ থেকেই গাঁয়ের সাণ্ডি জোয়ান ছোকরা বলেছে, শকুন।

অল্পবয়েসী তাগড়া ছেলে দেখলেই ফুসলে নিয়ে যেতে চায় ওপারের শহরে, মজুর খাটাবে বলে। এবং লোভার্ত, হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকে যুবতী মেয়েদের দিকে। চোখ নাচিয়ে অশ্লীল ইশারা করে। আরণ্যক গাঁয়ের রূপবুনিয়ার কুঁড়ি ইল্‌কা, সামান্য কারণেই যাদের লতানো গহিন শরীরে হাসির লহর খেলে।

বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল জনাকয়েক। পারে নি। বাওয়া কানুনের সেই দোহাই। মেহমানকে অপমান করা যাবে না। বুড়ো মাতব্বররা এবারে শান্ত স্বরে বুঝিয়েছিল, মোদির ধরমের এট্টা হেক্কাই আছিক লাই। সম্মান আছে না?

জোয়ান মরদরা তবু যখন তর্ক তুলেছিল, আর যা কিছু লিক্। লেকিন মোদির মাওকি-মায়জু, ইল্‌কা-লাবু, ইদের ইজ্জতের দিকি হাত বাড়ায় যি দুশমনরা—। বউ-মেয়ের দিকে কেবল নজর ফেলে থাকে।

তখন প্রতিমন্তব্যে পূর্বাপর ঝেঁজে উঠেছিল প্রতিপক্ষ, যা, যা, ঘর যারা সামাল দিতি লারে, তারা আবার চোট্ দিখায় জোয়ান মরদ বল্যে। বা মজা। তুয়াদির মায়জু যদি এতনা ঘুরিনা হবেক, উয়াদির ডাকের সাড়া ল্যে কেনে? সতী সাধ্বী স্ত্রী হলে ওদের হাতছানিকে আমল দেয় কেন? কাঁচের চুঁড়িয়া ঔর মুদাম-নেকী লিয়ে কি ঘরের মধ্যে দানো হয়্যা এস্যা লিয়ে যায় উটো? মুদান-নেকী হল, আয়না-চিরুনি।

এ যুক্তি হয়তো এক কথাতেই উড়িয়ে দেবার ছিল না। স্বতঃই সাণ্ডি জোয়ান ছেলেরা সেবার নিরুত্তর হয়েছিল।

অগুনতি কুলির গাঁইতির কোপ পড়ছে লাল শক্ত জমাট মাটির

গায়ে। বোবা মাটি যেন অন্তিম ছটপটানি নিয়ে আকুলি-বিকুলি কান্নায় আবিল। সারা দিক্‌প্রান্ত জুড়ে তারই প্রতিধ্বনি বাজে নিত্য সময়। ধূসর আকাশ, স্পিলওয়ে দরজার উপরের ছাদ, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করে। সঙ্গে সোমত্ত যৌবনা আদিবাসী মেয়ের তরল কণ্ঠের হাসি আছে।

বাঁধ!

নর্মদার শাখা নদী গাহুয়া তুহিনা। মহাকাল আর সাতপুরা পর্বতের ঘোলাটে-স্বচ্ছ জলধারা বয়ে ছুটে চলা ব্রীড়াবীরা 'নাই'। আড়াআড়িভাবে বয়ে চলেছে পুব-পশ্চিমে। তার বুকে লাওলী বেড পড়বে। আড়িয়ার বন্ধন।

সাউরি-পালুই (কাটা খাল)-এর নাবাল ধরে বহতা-ধারা ছড়িয়ে যাবে দূর নিকটের মাঠে-ময়দানে। আসমানের জলের জন্য আর উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকবে না হেরেল-পরজা। চাষী। মাথা খুঁড়ে মরবে না। বঙ্গার কাছে মানত করবে না। অবশেষে কাঁচা সোনা রঙের মেলা বসবে জেরাত জুড়ে। ফসল উঠবে পূর্বাপেক্ষা দু'গুণ-তিনগুণ।

রাত্রিদিন যান্ত্রিক আর্তনাদ। সম্মিলিত বহু কণ্ঠের হৈ-হট্টগোল। মাটিকাটা খাড়ি পারের ওপর বেনার দাম আর হিজলের ফল শুকোচ্ছে রাশি রাশি। জল নিকাশী নতুন কাটা ক্যানেলের আড়ে আড়ে সবুজ-হরিৎ বাসকঝাড়ের ঝুপসি বন।

সে তো আজকে নয়। তখন 'সুতনুকা' আমল ভারতবর্ষের ইতিহাসে। সমুদ্রের উপকূল-ঘেঁষা উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের এই আরণ্যক দ্বীপগুলো সেদিন সাপের পায়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষের রাজ্য। বিদেশী পর্তুগীজ বোম্বেটে, আর আরব বণিকদের বাণিজ্যতরী ভেড়ে শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে। চাই মসলা। চাই নানাবিধ দুর্লভ পাথর-রত্ন, যা কিছু আছে।

সেরমা-মাহার কথা। পুরোনো দিনের কাহিনী। বুড়োবুড়ীরা অনেকে আজো বলবে নবীনদের। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তখন গলে

গলে বাইরে পড়বে। সেজের টিমটিমে আলো জ্বলবে দাওয়ায়। বাতাসে তার শিখা কাঁপবে তিরতিরিয়ে। কথক বুড়োবুড়ীরা কুঞ্চিত চোখে হাসবে, কোন্ স্মরণাতীত যুগের ঘটনা সে-সব। আর, বাওয়া তরুণ-তরুণীরা তাই শ্রবণে রোমাঞ্চ-পুলকে বিস্ময় মানবে। জন্ম ইতিবৃত্ত যদি এত কৌলিন্য-ভরা হয়ে থাকে, গর্বে তাদের বুক হবে এই পাহাড় বনের চাঁই পাথর।

মহাকালের-টানে একদিন সে-দস্যুতার অবসান হয়েছে। তখন আপন ঘর পথের যাত্রী হয়েছে তারা। আবার যায়ও নি অনেকে। আদিবাসীদের মতো চট্‌কা আর গোলপাতায় ছাওয়া ঘর তৈরি করে ওদেরই নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। শেষে আদান-প্রদান, ছোটখাটো ব্যবসা, উৎসব-পার্বণের মাধ্যমে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে মৈত্রীর রাখী-বন্ধন হয়েছে। ক্রমে মিলিত রক্ত ধারায় জগতে নতুন মানুষের জাত এসেছে 'বাওয়া'। নয়া আদমী মানুষের গায়ের বর্ণ হল গেরিমাটির মতন। আর বড় বড় ঘন পল্লব ছাওয়া কৃষ্ণকালো চোখের এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় দৃষ্টি। টান করে বাঁধা আঁটালো উদাম বুকের ওপর কাঁচুলির ঘের উঠল মেয়েদের। পুরুষরা পরল লাঙুটির মতো ছোট্ট একফালি কিচ্‌ড়ি-আব্‌ফা। আবরণ।

নদীর পাড় ঘেঁষা মানওয়ারা দেবতার মতোই ভক্তি করে এই পবিত্র বারিধিকে। এ জল তো তারা শুধু পান করে না। এরই স্পর্শে ক্ষেতের রাসুজনি (ফসল) চারা মাথা ঝাঁপিয়ে ওঠে। তাদের সম্-বছরের মুখের রুজির যোগান হয়।

জাদান সন্তানেরা প্রথম বিস্ময় পেল, এক শীতের সকালে। আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠে সবে বাইরে এসেছে, বিপর্যয়ের দিক্-বিশারী বার্তায় যেন খুঁটি নাড়া হয়ে গেল। দূর সীমান্ত রেখা পারে. ক্রমেই একটা অস্বচ্ছ বিন্দু স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

ধুলোর মেঘ উড়িয়ে হাজার ঘোড়ার বীরবিক্রমে ছুটে আসার ধরন তার। এবং সে বুঝি আসছে, এই মেঠো গাঁয়ের দিকেই।

পাহাড়-মাটির আসমান বাতাস বেড়ে এ যেন এক নয়া এয়াড়ী পয়গম। নতুন মৃত্যু-সংবাদ। মুখ চাওয়া-চায়ি করলে সকলে। কিন্তু সঠিক জবাব কে দেবে, কি আসছে ওটা? কেন আসছে? এক ভাবনা, এক জিজ্ঞাসায়, সবাকার গ্রন্থিবদ্ধ মুখ নিশ্চুপ। শীতের ভোরবেলা। উত্তর দিক্ হতে হাওয়া আসছে। অদৃশ্য চুপিসারে ছুটে আসা রাক্ষসীর মারণ কামড়ের খিঁচুনি তার ঝাপটায়। তবু এরই মধ্যে একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শীত করছে না কারো। বরং রোম কূপে কূপে ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে। কণ্ঠার নলীর কাছে ঢেলা চাঙড়ের অস্বস্তি।

চোখের পাতা নাচিয়ে ভাবল বুড়ো মাতব্বররা, তাদের এতখানি বয়েসের মধ্যে এমনধারা কিছু দেখেছে নাকি? খারোয়ার বর্তমান মুরুব্বি ডমরুর দৃষ্টি বিস্ফারিত হল। বাসি মুখ, পিচুটি-ভরা চোখ, উসকো-খুসকো চেহারায় একেবারে দিশাশূন্য দেখাচ্ছে তাকে। যেন কিছুতেই কিছু ভেবে সাব্যস্ত করতে পারছে না, ব্যাপারটার গতি-প্রকৃতি। অতঃপর সে তার ঝোলা গোঁফে ঝাড়া দিয়ে ভিড় জমানো মানুষদের উদ্দেশ্যেই এক সময় ধমকে উঠল, জানতি চাই মো, তিন বিশ দুই সাল ভর্যে কি জাদান ভুঁইয়ের সাথ্ রেগ্তির ঘর করলাম। অর্থাৎ বাষট্টি বছরের বাস তার, এই বাওয়া পট্টিতে।

শুধু মুরুব্বির কথা হিসাবে নয়। ডমরু যা কিছু বলে, একটা বিশেষ ধার থাকে তাইতে। ডমরুর চিৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে গমগম করে বেজেছে অনেক সময় ধরে। কিন্তু যথার্থ উত্তরটা কে বলতে পারবে? সকল অন্তরেই তো একই ঢিপঢিপুনির মত বাজছে। এবং আরণ্যক বিষয় বাদে অন্যান্য ব্যাপারে জ্ঞানগম্যিতে ফারাক তাদের খুবই সামান্য।

নাগরা গাঁয়ের পাচন বস্তি শহরে গিয়েছিল টৌটকা-টাটকী বি

কয়েকটা জড়ি-বুটি বেচতে। সঙ্গে বুঝি এ গাঁয়ের বুরন গুণিন ছিল। দু'জনার মেলাই ভাব। 'জীবনে একবার শহর দেখতে হবে'—অনেক সলা-পরামর্শের পর তীব্র এক বেপরোয়া মনোভাব কি কারণে যেন চেপে বসেছিল ওঝা যুগলের মনে, ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে। এবং তারাই এসে দুর্যোগের সংবাদটা প্রথম শুনিয়েছিল, গাঁ-লালকুঁয়োর এরূপ নাকি আর থাকবে না। বেমালুম পালটে যাবে ভোল।

শুনে ভীষণ ভড়কে গিয়েছিল গাঁওইয়া জনতা। পালটে যাবে, অর্থাৎ তাদের মাওসী জেরাত ভূমি, শহর হয়ে যাবে? তবে তারা যাবে কোথায়? বাঁড়িয়া মানুষদের আসতে দেওয়ার সপক্ষে একদিন অনেক কণ্ঠই নীচুস্বরে বেজেছিল। এ কি তবে তারই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে চলেছে?

এখন সেই প্রশ্নটাই দমকা একযোগে সকলের মনে খেলে গেল। এই অরণ্য-পাহাড়বেষ্টিত পরিবেশ আর এ রকম থাকবে না!

লালকুঁয়োর নির্জন বনপটে এ নির্যাতন তবে তো তাদের জাতিধর্মের ওপরই আড়কাটি চালানো। তাদেব জাদান ঘর বলতে কিছু থাকবে না। তারা আড়বানা হবে, উদ্বাস্তু। বাওয়া মানওয়াব ক্ষেতজমি নেই। পাড়া নেই। সে কি তবে গেবস্ত হল নাকি? কোম্‌ড়া তো। চোব যাকে বলে।

ডমরুর চিৎকাবেব জবাবে চট্ করে কম বয়েসীবা কেউ যেমন উত্তব কবল না, সেই সব মাতব্ববরাও বেবাক্ স্তব্ধকণ্ঠ হয়ে থাকে। বরং শঙ্কা-বেদনায় ক্রমেই আরো কেমন যেন আলুথালু হয়ে পড়ছে তারা। তা-ই যদি সত্যি হয়, তো এখন কি জবাবদিহি করবে জোয়ানদের কাছে? একদিন তাদেব মধ্যে অনেকেই বহু প্রকার প্রশ্রয়কে বিধান বলে জারী করেছিল। যদিও ডমরু ছিল বরাবরই কিছুটা বিরুদ্ধবাদী মতের মানুষ। কোড়াকুড়িদের আজ যার বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ। শহুরে বাঁড়িয়া মহাজন এসে তাদের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গেছে। কলুষিত করেছে রক্ত আর ধবম। আরো নতুন

মানুষ, অবাঞ্ছিত আগন্তুক পরে পরে সেই সূত্র ধরে আসবে। লালকুঁয়োর নিস্তরঙ্গ স্বভাব ছরকুটে যাবে। তুহিনার জলধারায় বাজবে ভিন্ন চমক। আকাশের নীল-নীলিমা, বনের এই সবুজ সৌন্দর্য, মসীলিপ্ত হবে।

ভিড় ঠেলে বুরন সামনে এসে বিষয়টা খোলসা করতেই, একটা চকিত বিরতির পর, সামুদ্রিক ঝড়ের গোঙানির মতো সকলকে ভড়কে দিয়ে আচমকা আবার চেঁচিয়ে উঠল ডমরু, ই শালো ছেলানী লিকিন, হাঁ? মোদির জাদান গাঁয়ে ভিন্ পারসী মানওয়া আসবেক, মোদির না শুধায়ে? ভিন্ন ভাষার মানুষ আসবে তাদের গাঁয়ে, তাদের বিনা অনুমতিতে। কাকে বলছে কথা, ঠিক নেই। ডমরু পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকল।

বুরন কথাটা পরিষ্কার করতে চেয়ে বলেছিল, হঁ গ, শোহুরে গে ইসব কেস্তো দেখলম্। হাঁক পারে দানোর মতুন। ছুটে সাদমের জোর। অর্থাৎ হাঁকে দানবের মতো। ছোটে ঘোড়ার চেয়েও জোরে।

যারা এত অল্পে বোঝে না তার বক্তব্য, অবুঝের ভাবে বলে উঠলে, ভয়ের কুছ লাই ত গ গুণিন? আগে সিটো কও।

বুরন ঝানু গুণিন। আবার ওঝাও। তাইতে করে দূর-দূরান্তরে যেমন কিছু যাতায়াত আছে, দেখ্-ভাল্ও অনেকের চেয়েই বেশি। অন্তত এ-গাঁয়ে জান-বুঝ মানুষ বলতে বুরনের চেয়ে ওস্তাদ লোক পাওয়া দুষ্কর। ফলে সকলের নজর এখন তার দিকে। এবং তাকে ঘিরেই ভিড়টা জমে ওঠে কায়দা মতো। সে হোহো করে হেসে উঠে এবারে জানালে, ই কি ঢুক্‌রা-তর্‌হা বাত্ বুলছ গ তুয়ারা। বোকার মতন কথা। উটো ভয়ের কুছ্ হবেক কেনে? উ তো কল্-জানোয়ার। শোহুরে বাবু-মান্ষেরা চড়ে। গাড্ডী আরেক নাম।

কল্-জানোয়ার!

—মাজাকি পেয়েইনছে শালো।

বুরনের ব্যাখ্যায় এমনিতেই তারা কেমন একরকম হতবুদ্ধি হয়েছিল, পুনরায় ডমরুর চেল্লানি শুনে শীতের সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার কশা সহসা সকল হৃদয়ে থমথমিয়ে উঠল। তারা উদাস শঙ্কিত চোখে দূর মাঠের পানে অপলকে তাকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে হাজার ঘোড়ার বীরবিক্রমে ক্রমেই বিন্দুটা নিকটতর হচ্ছে। ধেয়ে আসছে তাদের মাওসী গাঁয়ের পথে।

ডমরু ফিরে চেঁচাল, দেখব, মো দেখব, হঁ।

তারপরই কোন্ ভূত মাথায় চড়ল তার, নেচে-কুঁদে হঠাৎ আরো উচ্চগ্রামে চিৎকার করে উঠল, মো জানি, কেনে ইসব হছে। তামাম দেশ-গাঁ একরোজ রাপুৎ যাবেক কয়্যা দিলম্, হঁ। উৎসন্নে যাবে দেখো। বলে মুরুব্বি আসল রাস্তায় গেল না, প্রত্যহকার আপন-স্বভাব মতন মেয়েদের দোষারোপ করে পুনরায বলে উঠল, ই তো যত কুঁড়ি ইল্‌কাদিব গিদ্‌না কামের দাল। নোংরা কাজেব ফল রাখের ইজ্জৎ খোয়ানো। বংশের সম্মান নষ্ট করা

ভয়-আতঙ্কে যে সব মেয়েরা আগ্রহান্বিত হয়ে ছুটে এসেছিল, একযোগে সবাই কেমন বিহ্বল—হতভম্ব হয়। আর্তচোখে চাবিধাবে দেখতে থাকে ঘন ঘন।

আব প্রায় তখুনি শীতেব সকাল পিষ্ট কবে কোথায় একটা কাদা-খোঁচা পাখি বুঝি ডেকে উঠল, পক্কব পা-না। পিকুব আ-আ-আ।

নীলবান গাঁয়েব মানুষ শুনল, চেঁড়েটা যেন তাব মাদী সঙ্গিনীটাকে ডুকবে ডুকবে কেঁদে বলছে, তাদেব এই সুখেব সংসাব আর থাকবে না। ভাঙন ধববে, ভাঙন ধববে, খুব শিগ্‌গীবি।

লালকুঁয়োব প্রভাতী সুবেলা বাতাসে বুনো ঝোবাব আলোড়ন। মানুষের কণ্ঠে বোবা যন্ত্রণাব যে স্বব বেবোয়, সকলেব গলায় এখন সেই স্বরেব ডাক। ভিড় কাচিয়ে এক সময় ডমরুকে কিছু বলতে আসছিল এক বুড়ো। মুরুব্বি তাকে এক ধমকে নিভিয়ে

দিল। মুখে বুনো পশুর প্রতিবিম্ব এঁকে দাবড়ে বললে, তোর যে সবেতে দেখি ওস্তাদি ফলানো। পাঞ্চেতেব (পঞ্চায়েতের) প্রধান লিকিন তু? রেণ্ডির বাচ্চা কাঁহিকা। বলে আদিম সৃষ্ট প্রাণীর ভাষায় আরো খানিক সময় ঘরঘর করল।

বুড়ো সর্দার থতিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল। স্বভাবটা একেবারে অজানা নয়। এ সময় বেশী ঘাঁটানো উচিত হবে না ডমরুকে। তখন তার অভ্যাস মতো যেমন লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছিল, দিতে থাকল।

এক্ষণে দিগন্তের পটে স্পষ্ট অবয়ব চক্রযানের। গাড়ির চাকায় লাল ধুলোর মেঘ আকাশ ছাইছে ভলকে ভলকে বেরুনো রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। নিস্পন্দ গ্রামবাসীর ক্ষুব্ধ অন্তরে সেই ছুটন্ত কল-জানোয়ারের যান্ত্রিক ধ্বনি বুঝি একই মতো লয়ে বেজে উঠল, তীক্ষ্ণ আওয়াজে। ভয়ংকর একটা কিছু ঘটার আতঙ্ক। করুণ প্রার্থনায় তারা বার বার মিনতি জানাতে থাকল দেবতার উদ্দেশ্যে, ই বারটা মোদির কসুর মাফি কর‍্যা দাও, হে ঠাকুর। মোদিব ই বাংবেশাটো (বিপদ) দূর করো।

পরে ঘনিভূত বিস্ময়ে ভিড়ের সবাই কেমন হতচকিত হল। শঙ্কায় ভয়ে যে সম্ভাবনাকে তারা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল অনিবার্য ফলতে চলেছে, পরিণতির মুখে সহসা আরেক ঠিকানায় তার দৌড় গড়াল। তাইতে হিসেবটাও গেল গুঁসিয়ে।

গাড়ি গাঁয়ে ঢুকল না। অল্প কিছু দূরে থাকতে, নদীর ঢালু পাড় ধরে সোজা নেমে গেল জল-কিনারে। শীতের 'নাই' এখন মজা-মজা, বিয়োনো গাইয়ের মতো নিঃসাড়—শরীরের সব ঢল সে নামিয়ে দিয়েছে বর্ষায়। গাড়ি গিয়ে একেবারে স্রোত-তটে থামল।

এবার আরেক জিজ্ঞাসার ঝাপটা সবার মনে। দ্বন্দ্বায়িত চিন্তায় ভেবে কুল হয় না এর হদিস। ফলে, জমে উঠল ভিন্ন এক ছবি। সকলেই কথা বলতে চায়, যেন স-ই বাত্‌লে দিতে পারবে রহস্যের

আসল মর্মার্থখানা। বুড়োরা চেঁচাতে থাকল, নানা মন্তব্যে। মেয়েরা হল্লা বাধালো, নিজেদের দোষ খণ্ডনের চেষ্টায়। ঠারে বাঠারে অনেক হীন কথা কওয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে। কেবল চুপ রইল কিছু জোয়ান ছেলে। পাখির ডাকটা এখনো বুঝি তাদের মরমে ধিকিধিকি বাজছে, এদিন পালটাবে। তাই রাগে থমথমে হয়ে উঠেছে তাদের মুখভাব। এবং স্বভাবতই বাক্যহারা হয়েছে। মাঝে মধ্যে নিজেদের গণ্ডির ভিতর নিম্নস্বরে কি বুঝি বলাবলি করছে, আবার খামোসি হয়ে যাচ্ছে। বুরন তাদের গোপনে জানিয়েছে পুরো ব্যাপারখানা, যা সে শহরে গিয়ে আভাসে বুঝে এসেছে। লালকুঁয়োর গাঁয়ের কিছু নয়, আসলে যা ঘটবে, মারাং গাড়া গাহুযা তুহিনার বুকে বেড় পড়বে। লাওলী বেড়। আঙিয়ার বন্ধন।

তুহিনার প্রবাহে খাঁচা পড়বে। সেই সঙ্গে জলে কিছু বাড়্তি চাপ সৃষ্টি হবে। তখন গাড়ার লাল শালু পাড় কিনারে উঠবে বুনো ছলবলানি। বুরন বলেছে, ইখেনে বেড় বাঁধলি জায়গাটো শোহুর হয়্যা যাবেক, দেখো।

বুরনের কথার গূঢ়ার্থ প্রথমে বোঝে নি জোয়ানের দল। তারা মুচকি মুচকি হেসেছিল। তারাও তবে শহরবাসী মানুষ হবে, আঁ?

বুরন আরো যোগ করেছিল, হঁ, শোহুর হলি আর তুলকার অভাব থাকবেক লাই দেহাতী মানওয়ার। তখুন জলকাদায় আর চাষবাস লয় গ, হরেক নোকরীর পথ খুল্যে যাবেক বাবু মান্ষের অদ্দেষ্টের মতুন। আপন গতর খাটালেই পইসা। যত খাটো, ততো লোট।

নীলবান গাঁয়ের সাণ্ডি জোয়ান ছেলের বুকে আছে অনেক তুহিনার উৎস। সেখানে পাথর পড়ে ঘোলানি উঠেছে। দু'কুড়ি টাকা জমলেই মনের মানুষের সাথে সাঙায় বসবে। কেউ বাধা দিলে পালিয়ে যাবে দূর কোন খাদানে। যেখানে পঞ্চায়েতের রক্ত চক্ষু নেই। বাওয়া অনুশাসনের লৌহ-প্রহরাও শিথিল। বাওয়া জীবনে

পঞ্চায়েত আর মুরুব্বির স্থান সর্ব উচ্চে। প্রতিটা হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল হয়, প্রতিটা নির্দেশ।

হি-হি। বুরন হেসেছে। বলেছে, তবে, এট্টা তবে আছেক গ উয়ার পর।

শেষে যখন কিছুতেই খোলসা হয় নি তার ভাবসাব, গুণিন রেখে-রেখে থেমে থেমে বুঝিয়ে বলেছে, কথাটো কি, মেয়াদির তবে সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য হবেক বাওয়া জোয়ানের পক্ষে। বাহারের টান পেয়া বহু হারামজাদিই ঘর ছাড়বেক গ, হুঁ। যেমুন শহরে হামেশা হয়।

আই, আই! তাই লিকি?

অমনি হাসি হাসি মুখ সকলের চুমরে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। চোখ আকাশে তোলা। ওইসব ভাবনার আনন্দ নিশ্চয় তাদের পুলকিত করে। তবু সব ছাপিয়ে চির পুরাতন এক প্রশ্নাতীত তারা কোন সময়ে হতে পারে না। সেখানে সকল বাওয়া জীবন একসূত্রে গাঁথা। আদিবাসী জগতে তাদের ইজ্জত আলাদা। এ সংস্কার তারা মুছে ফেলবে কি করে?

বুরন একা মানুষ। বউ ছেলেপুলে কেউ নেই। তাই গাঁ-ঘরের প্রতি টানও কেমন যেন উড়ো উড়ো। সকলে একসাথে তার দিকে হিংস্র-কঠিন চোখে তাকাল।—ই কি বাত্ গ গুণিন। গাঁয়ের কোড়া-হোয়েন তু। আর ই সংবাদ এতদিন জানাস লাই, চেপ্যে যেছিস? সুন্দর খেল্ জানিস দেখি।

উলটো বিপত্তি। বুরন তাড়াতাড়ি ভিড়েব মধ্যে মিশে গিয়ে গায়ের চামড়া বাঁচিয়েছে।

আসলে শহর থেকে ঘুরে এসে এ তথ্য সে ঠিকই জানাত পঞ্চায়েতের আসরে। কিন্তু ভরসা হয় নি কেবল ডমরুর জন্যে। খুব ভাল করেই জানা, ডমরু তাহলে কি কীর্তি-কর্ম করত। যেন দোষটা বুরনেরই যত কিছু, এমনভাবে হামলে পড়ত তার ওপরে। খারোয়ার

বর্তমান মুরুব্বি, অথচ গুণিন বলে গাঁয়ের মধ্যে বুরনের হাঁকডাক অধিক—ইত্যাদি কারণে এমনিতেই বুরনকে খুব প্রীত নজরে দেখে না ডমরু। সেখানে জুত মতো কোন অছিলা পেলে আদৌ ছেড়ে কথা কইত না।

সেই থেকে অল্প বয়েসী জোয়ানের দলটা সমানে গোমরাচ্ছে। আর মুখে অস্পষ্ট বুলি, শালা লুটেরা কাঁহিকা। আরেক বাঁড়িয়ার জাইৎ।

সূর্য এখন আকাশের যথেষ্ট ওপরে দীপ্যমান। ছায়া এমনিতেই ছিল না। এখন আরো নেই। শীতের রোদেও ঘেমে শরীর তাদের দরিয়ার পানী। তাদের উদাস-শূন্য চাহনি লালকুঁয়োর কাতর বাতাসে ছাড়া পেয়ে শব্দহীনতার রাজত্বকে যেন আরেক ব্যঞ্জনায় তরঙ্গ-মুখর করে তুলল।

কথা যখন একবার উঠেছে, সহজে নিস্তাব নেই। বুরনকে আবার আসতে হয় পাদ-প্রদীপের নিচে। বুড়োবুড়ীরা ডাকলে সনির্বন্ধ মিনতিতে, আজব কাণ্ডকারখানা। বেপদেব দিনে তু মোদিব পাশে ববি লাই? জোয়ানরা খুঁটিয়ে জানতে চায় আবো বিস্তারিত সংবাদ।

বুরন তখন ঝাঁজি দিল, তা কি বুলেছি লিকিন মো? কিন্তুক তুয়ারা ত নিজিদির মধ্যি তখন থিক্যা কুত্তা-কুত্তীর তর্হা কাফাবিয়াও কর‍্যা মরছিস। ঝগড়া বাধিয়ে শেষ হচ্ছিস।

আর ঠিক এ সময় ডমরুব সবিক্রম হুংকার লালকুঁয়োর উন্মনা চিন্তাকে এক বিশেষ ভাষা যোগালে। ডমরু বিশেষ কোন নতুন প্রসঙ্গ বলে না, তবু তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে যেন ভেরী বেজে উঠল। সে বললে, মোদির ই নীলবান জাদান গাঁ। তুহিনা নাইটো হল গিয়ে আয়ু। মা। মায়ের ধরম যাবেক, লাওলী বেড় পরাতে গিয়ে তার বুকে হাত রাখবে ভিন্ জাইতের হেরেল, আর সাস্তান হয়্যা বস্তা বস্তা সি দেখব মোরা? বাহা-রে মরদ।

দল সমস্বরে চেঁচাল, কভিয়াৎ বাং। ঠিকই, কখনো নয়। গিদরা উমরে আয়ুবেটীর তোরা ইউমিউ? বছপনে মায়ের দুধ খাই নি, কাউরে ডর করব যি।

অতঃপর বুরনের পরামর্শ মতো সকলে টিলার মেঠো পথ পেরিয়ে, নিচের ঢালের দিকে ঝুকঝুকিয়ে এগিয়ে চলল। বুরন বলেছে, কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে আগে। রোদ পড়ে সকলের মুখ কুঞ্চিত। লম্বা ছায়া, দীঘল এলোমেলো কাশ-ছায়ার মতন দেখাচ্ছে। অবশেষে দৃষ্টি সীমার মধ্যে পৌঁছে সকলের সঙ্গে বুরনও যেন কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ে। ভিন্ পারসী মানওয়ারা ঘুরে ঘুরে কি দেখছে। উজ্জ্বল সফেদ চামড়া তাদের শরীরের। ঝকমকে পরিষ্কার পোষাক। তারা বন্দেশী (জঙ্গলময়) গাঁয়ের দেহাতী জনতা নয়। যদিও বাওয়ারাও ফর্সা, তবু ওই রঙ, সুন্দর বড-সড় চেহারা, কোনদিন দেখে নি। কেবল একজন আছে দলের মধ্যে, যার কিছুটা প্রত্যয় তারা করতে পারে। আদিবাসী মুণ্ডারা এর চাইতে কিছু বেশী কালো হয় গায়েব বঙে।

দেকো। বাওয়ারা যাকে হিন্দু, শহুরে মানুষ জানে, তারা নয়। বাঁড়িয়ারাও নয়, মুসলমান ব্যবসাদার নয়। তুসবা জাইৎ। সকলে শুধোলে, বুরন জানাল, তবে জেটে হবেক বুঝিন। সাহেব যার নাম।

জেটে! শহর-ঘরেরও ঠিক নিজেব মানুষ নয়। অনাত্মীয়ই বরং। স্বভাবতই গ্রামীণ মানওয়া ভয়ে আরো সিঁটিয়ে যাবে। ডমরুর মুখ এই সময় দেখাল যেন জ্বরে বিকারগ্রস্ত রোগী। অন্যদিন বুরনকে তার মোটে সহ্য হয় না। সবেতেই একটা চালিয়াতি ভাব গুণিনের। আজ সে বিশেষ করেই তার পাশে পাশে চলতে থাকল, আব জিজ্ঞাসা কবে জেনে নিতে থাকল সিদ্ধান্তগুলো। যদি সত্যি হয় তার আনা সংবাদ, এবং আজকের এই ঘটনা যদি তারই পরিণাম হয়ে থাকে—তবে শেষবেশ এই দেশ-গাঁয়ের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? এবং ওই আগন্তুক মানুষেরা বাঁড়িয়াদের চেয়েও ডাকাবুকো কিনা?

লালকুঁয়োর আকাশে বনবিহঙ্গ পাখা ভাসায় সকাল-সন্ধ্যা। সেইক্ষণে বনবাসী জীবনের সকল স্থৈর্য ছিঁড়ে-কুটে যায়। এখন সন্ধ্যালগ্ন ঘনাতে অনেক সময় বাকি, চতুর্দিক আলোক প্লাবিত। তবু এরই মধ্যে, মধ্যাহ্নের নিঝুমতা সমগ্র গ্রামের ছায়ায় নিশুতি এনে দিল। যারপর মনে হলো, রঙ্গিণী নদী তুহিনায় কোন উত্তরোল ছলবলানি নেই। বনের বাতাস মৌন মূক। বাওয়া চাষীর ঘরে গম চূর্ণ হয় জাঁতাকলে। শব্দ ওঠে, হুররা, ছারে-রা-র‍্যে—। সেই কিম্ভূত ধ্বনিটা কেবল বাজতে থাকল সবার বুকে।

বুরনের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিল বিধবা ঝুমনি। বিধবা হলেও বছর বছর বাচ্চা হয় ঝুমনির। বর্তমানে কোলে চারখানা ছানা-পোনা। গুণিনের সঙ্গে নাকি বরাবরই একটা রীতিবিরুদ্ধ গোপন সম্পর্কের সেতু আছে তার। একটু আলুথালু, অগুছালো স্বভাবের মেয়ে সে। ভাসা ভাসা অবুঝ চোখ, আর জট-বাঁধা রুক্ষ চুলের গোছায় এক ধরনের পাগলী চেহারা দেখায়। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ফাটা ফাটা দাগভরা মস্ত স্তন দুটো ঝুলে পড়েছে বাইরে। আঁকাবাঁকা শিরাগুলো তাদের ফুটে উঠেছে পরিষ্কার। কতদিন হারাম বুড়ীরা বলেছে, কসবী মাগী ধাসাটো ঢেক্যে রাখ। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। অত রাখঢাক তার সয় না। এখন তো সেদিকে তার আরো লক্ষ্য নেই। শীত করছে না। বুরনকে দেখছে না। একটুও টনটনানি অনুভব করছে না বুকের। সেই কোন্ অন্ধকারে কোলের শেষ বাচ্চা দুটো কিছুক্ষণ ফুটি (স্তনের বোঁটা) চুষেছিল, তারপর এতখানি বেলা হল, বোঝা খালাস হওয়ার মতো আর কোন টান পড়ে নি। ঝুমনি এক্ষণে হেঁচকি তুলে কেঁদে উঠল।

ডমরু তক্কে তক্কে ছিল। আগন্তুকদের নিকটস্থ হয়ে বুরন কিছু বলার আগেই সে আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল। দাবড়ে জানতে চাইল, তুয়ারা কে বটিস? মাহাজন? কিসের লেগে মোদির ই জাদান ঘরকে আসছুস?

সেই চেনা-চামড়ার মানুষ খলখল করে হেসে উঠল তার কথায়।
—মহাজন, ট্রেডার্স? আরে না, না। তা হব কেন? পরে বুঝিয়ে বললেন সব। বুরন জোয়ানের দলটাকে যা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এই ভিন্-পারসী মানুষদলে তিনিই হলেন একমাত্র জানবুঝ লোক। জানবুঝ হল, জাদান মাটির খবর বিষয়ে।

ডমরু আর্তনাদ করে উঠল। শেষে সে আর একলা নয়। কথাটা যখন সকলের মরমে গিয়ে আঘাত করল, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরো অনেকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবং ডমরু-ভক্ত কিছু লোক আগন্তুকদের উদ্দেশে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার বন্দতায় তৈরী হল। দাঁতে দাঁত ঘষল তারা। আঃ তে (ধনুকে) শর পরালে।

বিকট ভয়ংকর ডাকে নদীর এপার ওপার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। আর তাইতে বুঝি কেমন ভড়কে গেল নবাগতরা। এ যেন তাদের বোঝাবুঝি ছিল না। তারা পায়ে পায়ে পিছোলো গাড়ির দিকে, এদিকে ক্ষব্ধ-ক্রুদ্ধ বাওয়া জোয়ানরা তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাফ দিচ্ছে। নেচে নেচে কথা বলছে। যেন নেশামত্ত। কেউ কেউ আবার তীরধনুকে তাক্ করার ভঙ্গিমা নিচ্ছে। সঙ্গে গাঁক্-গাঁক্ চেঁচানো আছে।

এমন সময় আরেক নাটকীয় কাণ্ড বাধালো ডমরু। হঠাৎ ঝাঁ করে দৌড়ে গিয়ে সেই পরিচিত-চামড়ার আগন্তুকের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল সে। তারপর কান্নার দমক সমেত তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে আর্জি জানাল, ইটো কি তুমাদির ভালাই কাম হবে বাবু? কুনো ক্ষতি ত মোরা তুযাদির করি লাই। তবে কেনে মোদির সাথই দুশমনি করবি? শিরা টানা চাকাইাঁকিতে তার গলার রগ ফুলে উঠল মোটা কাছি দড়ির মতো। আর চোখ দুটো মনে হল, এখুনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে বাইরে।

আগন্তুক সেই লোক শশবাস্তে জিজ্ঞাসার সওয়াল জবাব করলেন, নদীর বুকে বেড় পড়বে য তোদের জন্যেই। বৃষ্টি তেমন না

হলেও, নদীর জল খাল কেটে নিয়ে যেতে পারবি জমিতে। চাষ করবি পরান ভরে। দুনো ফসল ফলবে।

আর তাই শুনে এবারে খ্যালখেলিয়ে হেসে অস্থির হল ডমরু। যেমন মস্ত একখানা মজার কথা কওয়া হয়েছে। তার এই আকস্মিক হাসিতে সকলেই হকচকিয়ে গেল। তবু তখনো ডমরু নিজের খেয়ালেই রইল। মুখ মাথা ঝুলিয়ে ঝেঁকে ঝেঁকে হেসে যেতে থাকল একই মতো।—আঁ, গাড়ায় বেড় বাঁধলে, ফসল ফলবে দুনো? ঢ্যামনামির আর জায়গা পাস লাই শালো।

ওই প্রস্তাবনায় যদি বা কিছু উড়ুক্কু হত কারোর মন, নগদ তুলকা কামাবার বিষযটা ভাবত—মুরুব্বির রকম-সকমে আর সেদিকে ইচ্ছা ছড়ালো না। বরং বেদনার যে পক্ষ-বিস্তারী রেশটা সেই কাকভোর হতে তাদের মনে হানা পেতেছে, তারই ঘন নিবিড় ছায়া ক্রমশ আরো নিরেট হয়ে উঠতে থাকল।

হাসতে হাসতেই ডমরু তারপরে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিল। সে যেমন আগন্তুকদের পাগল সন্দেহ করেছে, নাহলে ওই কথা কেউ বলতে পারে, 'নাই'-এর বুকে খাঁচা পরালে বাল ফলবে দ্বিগুণ, তার হাবভাবেও একই ক্রিয়াকলাপ ফুটে উঠতে লাগল। এই সে হাসছে, এই কাঁদছে। তার পরেই সলম্ফ হুংকার ছাড়ছে. শালো, কাট্যে দুয়ারে দু'টুকরা কর‍্যা ফেলাব, ফির উ-বাত্ মুখে আনবি যদি। দৃষ্টি তার অশ্রুভরা। গলা বসে গেছে। ডমরু যেন বিপর্যস্ত বিকারগ্রস্ত মানুষ একজন। একটা প্রকাণ্ড ভয়াল ঝড় পার করেছে সদ্য শরীরের ওপর দিয়ে। তাইতে নাড়াখাড়া। চোখ কোঠরাগত। চোয়ালের হাড় ওঠানো। লম্বা তিনকাঠ মুখ। সে বিকৃত ভাঙা উচ্চারণে বায়াস্তিতে পড়ার মতো বলে যেতে থাকল, এল্লা বঙ্গার কসম, দেখি কে, কিভাবে, বেড় বাঁধে ইখেনে। মো দেখব হুঁ। কসম, কসম।

ডমরু নাচতে থাকল, যেন সঙ্ সেজেছে 'করম' উৎসবের।

কুঁদেকুঁদে ঘাড়-মাথা ঝুলিয়ে ফের বললে, সব শালোরে খতম করব। বাইরী, শত্রু। মোদির ইজ্জত ছিন্‌তে এসেছিস দুশমনের দল।

এই কথা, এই বক্তব্য, এই মুহূর্তে যেন আর ডমরুর গলার একার নয়। সমগ্র জাদান মাটির বাতাস আজ ওই ভাষায় কথা বলছে। তুহিনার জলের কলরঙ্গেও একই লেখা। যে বুরন চিরদিনই একটু ছাড়া-ছাড়া স্বভাবের, ঘর-টান মন তার কোন সময়েই অনুভব হয় না---এক্ষণে তার অন্তররাজ্যেও অনুচ্চার এক কিসের আলোড়ন যেন গুনগুনিয়ে উঠল। ক্রমে অশ্রুরেখায় গণ্ড প্লাবিত হয়ে গেল তারও।

ভীত আগন্তুকরা আর অপেক্ষা করা বুঝি সমীচীন মনে করলে না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল। ধুলোর মেঘ তুলে কল্‌-জানোয়ার জমালে তার উল্‌টো পথে পাড়ি। বাওয়া আকাশ-মৃত্তিকা চিরন্তনী সংগীতে তখন আবার কিছুটা সহজ হল।

এই অরণ্য তুনিয়ার বাতাসের এমনি ছলনা-সিঞ্চিত গাওনা, নিত্যকালের।

ক্রমে দিনের গতির সঙ্গে মানুষ আবার সহজ হয়ে উঠল। কেবল বুঝি ভুলতে পারে না ডমরু। পাড়া ঘরে বঙ্গার পরেই মুরুব্বির স্থান। তার বুঝি কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে, গাঁওইয়া জন দেবতাকে অমান্য করতে শিখলে, মুরুব্বিকেও আ মানবে না। সর্বক্ষণ সেই শঙ্কায় সে কাঁটা হয়ে আছে। আর ফিকিরে ঘুরছে, কি করে জাদান মানুষের বুকে একটা স্থায়ী আঁচড় দেগে দেওয়া যায়। যারপর আর হাজার প্রলোভনেও তাদের মন চঞ্চল হবে না।

সহসা সুযোগ একটা হাতে এসে গেল।

বাওয়ানী মেয়ের সময় কাটে নানান খেলায়।

জাদান ভাষায়, নাহালচে রিমিলে গতু আকানা! অর্থাৎ নাহালের শিষ শুনলেই রূপবুনিয়ার বুঁড়ি ইল্‌কার মন উচাটন হবে।

ঝড় শুরু হয়েছিল সন্ধ্যা রাত্রি থেকে। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে এল বাতাস, তীব্র রণহুংকারে গাছ-গাছালির মাথা ধরে হুটোপুটি করে লণ্ডভণ্ড করেছে দিক্‌ভূমি। শেষ চৈত্রের বাতাস, খাঁ-খাঁ রুক্ষ। মাঠবন সব একাকার হয়ে গেল সেই দাপটে। পরে সেই ঝড়ের সঙ্গে সমান তালে অঝোর ধারায় বর্ষণ নামল এবং তাইতে বনস্থলী আরো রুদ্র চেহারা ধরেছে।

প্রায় বছরই এইদিনে এমনি ঝড় ওঠে এ অঞ্চলে। তবে প্রকোপটা এবার যেন কিছু বেশী মনে হচ্ছে। সমস্ত অরণ্য-প্রান্তর জুড়ে ঝড়ো বাতাসের ডাকানি আর বৃক্ষশাখার ডাল ভাঙার মর্‌মর্‌ ধ্বনি ব্যতিরেকে আর কোন শব্দ নেই। এর ফাঁকে কখন রাত ফুরিয়ে দিন এসেছিল, বোঝা যায় নি। বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির কষান একটু কমে এলে, ঝড়ের ডাকানিতেও ঢিলেমী পড়ল। তখন পাড়াঘরের মানুষ ঘরের ঝাঁপ তুলে বাইরে তাকাতেই, চক্ষু স্থির হয়ে যায়। পায়ের গোছ ডুবে যায়, দাওয়ার নিচে এমনি প্লাবন। দূরের মাঠ-সীমানা জলে থৈ-থৈ, আকাশ-রেখার সঙ্গে একাকার। ধূসর আকাশ যেন প্রকাণ্ড একটা জন্তু, থাবা বিছিয়ে বসে আছে বিষণ্ণ কোন ভাবনায় মুখ গোমড়া করে। অর্থাৎ আরো কয়েক প্রস্থ ঢালাঢালির খেলা চলতে পারে আকাশে-বনরাজ্যে।

নির্জন ঘরে মন বসে না। স্বামীটা সেই কবে বিবাগী হয়ে চলে গেছে ঘর ছেড়ে। অথচ এখন শরীর বলতে, যুবতী বাওয়ানী বক্ষ। বাওয়ানী মেয়ে পায়ে রুপোর মল পরে না, তবু যেন সেই মলের ঝংকার বাজে তাদের চকিত লঘু পদক্ষেপে। গলায় অকারণেই গুনগুনানির তরল সুর দোলে।

প্রকাণ্ড খেয়ালী জোয়ান সাকমল সারাদিন এখানে ওখানে টো-টো করে ঘুরত। সুন্দর তিরিও (বাঁশী) বাজাতে পারত। সর্বক্ষণ মশগুল হয়ে থাকত [illegible]। সন্ধ্যায় সেই ছেলেই ঘরে ফিরে আরেক [illegible] চুটিয়া হয়ে যেত। কাঠবিড়ালীর মতো দৌড়-ঝাঁপ
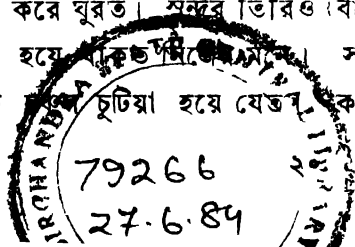
আরম্ভ করে দিত। কিশোরী স্ত্রী সরমে অধোবদন করে লজ্জা-রক্তিম মুখ লুকোত ওই সবল পুরুষ-বক্ষেই। মাতাল সাকমল তখন বুঝি আরো খ্যাপা হয়ে পড়ত। আদরে আদরে বারো বছরের রূপছাঁদা জরু নাজলী বেআব্রু। বিব্রত বউ যত নিষেধের বাধা তুলতে চাইত, ততোই উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়ে আরো নিবিড় বেষ্টনে তাকে নিকটে টানতে চাইত সাণ্ডি জোয়ান স্বামী।

সেই সাকমল একদিন মহাজনের নৌকায় চড়ে বসে শহরে পাড়ি জমিয়েছে। এবং অদ্যাবধি আর কোনদিনও মাওসী জাদান ঘরে ফিরে আসে নি।

বাওয়া ভাষায়, দেটিহার চোড়ার! ঢেউয়ের ভাঙন। কুঁড়ি মেয়ের মনের রঙ। বয়েসের হাতছান।

গাছ-কোমর করে কাপড় জড়িয়ে তৈরী হয়ে নিয়ে, বার কয়েক দা... বেরিয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে গেছে লাছলী। নিষ্কর্মা প্রহর আর কাটে না। পিছনের দাওয়ায় বাউলী নিত্যকার জাবর কাটার মতো খামাকু'র পিসাই চিবুচ্ছে, আর ঢুলছে ঝিমুনি দোলায়। পাড়ার নানা ঘরে বাচ্চারা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, রিমিল হেদে অকয় চেৎ-আ-আ দিশমরে । বৃষ্টি নাবলেই বাওয়া বাচ্চারা এই গান ধরবে। বড়দের মুখে শুনে শুনে গোটা গানটা মুখস্থ হয়ে গেছে বুঝি ওদের। বড়রাও কখনো কখনো ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলোয়।—হে কালো মেঘ, উড়ে গিয়ে আমাদের এই দেশকে দুভাবনা মুক্ত কর। এখন অনেক বয়স্ক-গলা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু লাছলীর এই মুহূর্তে ওই সেডিং-যে মন আকৃষ্ট হল না যে বঙ্গিনী নাচন জাগে বর্ষার দুহিনায়, একই গহিন ডাক আছে বাওয়ানা মেয়ের অন্তর-বনে। হাসনা সেখানে ঘাই দেগে দিয়েছে। সেই থেকে বিকাল পড়লেই গাড়ার পানিতে ছেলাক বেজে মন টেনে নিয়ে যায় দূর নিরালয়। আঠারো বর্ষার ছাপাছাপি টান সর্বাঙ্গে। পুরুষ্ট ভরা দেহ। স্বভাবতই মন উন্মনা হবে ওই আহ্বানে। হাসনা এই পাড়াঘরে সবচেয়ে

খুবসুরত সাণ্ডি জোয়ান ছেলে। যে কারণে অনেক মেয়েরই দুর্বলতা আছে তার প্রতি, লাছলী সে-সব বিলক্ষণ জানে। তবে হাসনাও আবার কিছুটা অন্য ধাঁচের ছেলে। কথা বলে কম। কিন্তু যখন বলে তাইতে মেঘাড়ম্বরের হেঁচানি বাজে যেন। আর, কি আরেক বিচিত্র সৌরভ ওঠে, মন ছেয়ে যায় মধুর এক আমেজে। গতকালও, ঝড় ওঠবার আগে, নদী থেকে ফেরবার পথে, গতিরোধ করে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। ঘাটলা-পাড় তখন প্রায় নির্জনই ছিল। হাসনা টিপে টিপে হেসেছে আর বলেছে, বাওয়ানী মেয়া সাঁঝালের আগেই ঘরে ফিরে দেখি। হাই গ!

লাছলী ভ্রূভঙ্গে হেসেছিল তার জবাবে, জঙ্গলে বড় তারুপের উৎপাত হছে, বাঘের অত্যাচার—সন্ধ্যা লাগলেই সিগুলো মানুষ ধরতে বেরোয়, হাঁদে।

হাসনা সেবারে কপট আক্ষেপে জিব দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করেছে, আহা, তবে ত ভয়ের কথাই। বলেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়েছিল। পরে বলেছিল, কিন্তুন বাওয়ানী মেয়ারও ত জানা আছিক লিশ্চয়, কি করয়া তারুপের সঙ্গে লড়তে হয়।

—আছিকই ত। লাছলীও ছদ্ম ক্রোধে তখন মুখ ঝামটে দিয়েছিল।

তারপরে তারা হাঁটতে হাঁটতে একত্রে বনান্তরের এক ছায়ায় গিয়ে বসেছিল। বন তখন আঁধার রঙে সন্ধ্যায়োজনে মত্ত। ধূসর আকাশ নীল-সবুজে বর্ণময় তরল চেহারা-ধরা। ব'সে, প্রত্যহ-কার ভাবনাটা কখন একসময় পায়ে পায়ে এসে চেপে ধরেছে তাদের বুকের সঙ্গোপনে। প্রাগৈতিহাসিক দুই সত্তা যেন ক্রমে ভাষা হারিয়েছে। নিবিড় ঘন সান্নিধ্যে একে অপরের বাহু-লগ্ন হয়েছে তারা। অবশেষে দু'জনের চক্ষুই অশ্রু ম্লান, গণ্ড প্লাবিত হয়। পরে বিনবিন করে আরো প্রগাঢ় টান যখন উঠেছে বাওয়ানী মেয়ের হাতে, হাসনা তার বক্ষে মুখ পেতেছিল। লাছলীর সুপুষ্ট শরীরের

ওঠা-নামা স্পষ্ট অনুভব হচ্ছিল নানান প্রত্যঙ্গে। নিচের নদীতে অশান্ত হাজার ঢেউয়ের হ্লাদিনা বিভঙ্গ লাস্য। সেদিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে হাসনা হঠাৎ শুধিয়ে উঠেছিল, আর তিস্ মাহা? কতোদিন আর?

এই প্রশ্নে তো লাছলী চিরদিনই সংযম ছেঁড়া হয়। তখনো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। ওই জিজ্ঞাসা যে তার অন্তরেও সর্বদা গুমরে ফিরছে। একই সামুদ্রিক ডাকের উচ্ছল কান্না ছরছর করে নিত্যদিন ভাবনার আকাশ আলোড়িত করে রাখে।—বাস্তবিক, আর কতদিন এভাবে অপেক্ষা করতে হবে? সে শুনবে কি হাসনার কথা, চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিল, পারল না। উলটে বরং নিজের দৃষ্টিসামাই পূর্বাপর অদমিত অশ্রুভারে ঝাপসা হয়ে পড়ে।

বাওয়া জোয়ান কান্না-ভাঙা গলাতে তখন অস্পষ্ট স্বর তুলেছিল, ন রো। কাঁদিস নে। যার কাছে সে সান্ত্বনা চেয়েছিল, এবার তাকেই যেন তার সান্ত্বনা যোগানোর পালা।

বৃষ্টি-স্নাত নিষ্কর্মা দুপুরে এই সব কথা মনে পড়ে আরো উন্মনা হচ্ছিল লাছলী। বার বার ঝাঁপের দরজা তুলে বাইরের আকাশ প্রত্যক্ষ করছিল। পাণ্ডুর বেলা মেঘের রঙে রঙে অস্বচ্ছ, তাম্র বর্ণের ঘোলা জলের বিস্তারে মাঠঘাট একাকার শেষে আর বুঝি কিছুতেই মনকে ধরে রাখতে পারলে না, একসময় কাঁখে কলসী নিয়ে নেমে পড়ল নিচের দাওয়ায়। জলকে চলার ডাক, বাওয়া মেঘের অন্তরের নিত্যকালের ঝুমঝুমি বাজনা। তাইতে বোল উঠেছে, এনেপড়ে সিরি থা-থা-থা আঁদুরে ছেলাক।

লাছলীদের পাশের ঘর টিক্রু কিরাণের। টিক্রুর বউ লয়লাও বুঝি সে সময় বাইরে বেরিয়েছিল বৃষ্টির পরিমাপ দেখতে। লাছলীকে দেখে, দরজার ফাঁকে মাথা গলিয়ে নিষেধ করে, আজ আর বেরুস লাই মিঁরু, পাঝাড় ধরবেক কিস্তন। টিয়াপাখি যাস না, বাজ ধরবে।

লাছলীও রঙ্গ কিছু কম জানে না। উত্তর করেছিল, তা যদি ধরে, বুঝব, পাঝাড় লয় উটো, গিধ। তার চেয়েও বড় কিছু। বাজ নয়, শকুন।

লাছলী তারপরে গিয়ে রঙলাকে ডেকেছিল, ফুল।

রঙলা আরেক বাওয়ানী সুন্দরী। বুড়ো রাখুয়া সর্দারের মেয়ে। সে যেন ওই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল। জাদান মাটির শ্যামলা আহ্বান তারও শরীরের সর্বস্তরে নিত্যক্ষণ পাখা ঝাপটাচ্ছে। স্বতঃই এতক্ষণ বন্ধ ঘরে সময় কাটিয়ে বুঝি হাঁপিয়ে উঠেছিল প্রাণ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দৌড়ে নেমে এসেছে নিচে। এবং বাওয়ানী মেয়ের চিরকালীন যে ডুলকি সুর গলায় খেলে, তার জাদু স্পর্শ উঠেছে কণ্ঠে।

--নাহালের শিস্ শুনে মন উচাটন হল নিকিস? হি-হি।

রঙলা কথা বলে তার নাকের পাটা বিস্ফারিত হয়। এখনো হল। আয়ত চঞ্চল চক্ষু একবার বিঘূর্ণিত করলে। তখন লাছলীও তার হাসির সঙ্গে হেসে উঠল কলকণ্ঠে।

অবশেষে তারা এসে দাঁড়াল নদী কিনারায়। সেখানে জলের কোন আলাদা রেখা নেই। দূরে র আকাশ ঝুলে নেমে এসেছে অদূরের জলের চড়ায়। গেরুয়া জলের রঙ, কিছুটা বা ঘন এখানে। নিকটের বনে বাতাস বইছে পাতা ভাঙার আওয়াজ তুলে। গাছ-গাছালির মাথা দুলছে, যেন বুড়ো মাতব্বররা কোন সভায় বসেছে--সম্মতিসূচক ঘাড় নড়ছে সবার। আর সর্বোপরি তুহিনার চেহারা, সে যেন নদী নয়, ঝুমরী বাস্তর রঙ্গিণী চপলা তরুণী কোন। একই ছলাকলা সমগ্র অঙ্গগাত্রে। তারা কালবিলম্ব না করে নেমে পড়ল নদীর মধ্যে। প্রায়দিনই তারা এসময় গাড়ার জলে বুক ভাসিয়ে স্নান করে।

লাছলী জল ছিটিয়ে দিল রঙলার চোখে-মুখে। রঙলাও দিল। তারপর একসঙ্গে দু'জনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

পায়ের নিচে বালি সরছে সর্‌-সর্‌। পিচ্ছিল গতিতে ঘূর্ণিপাক্‌ উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মুহুর্মুহু ঢেউ ভাঙছে জলে জলে ধাক্কা লেগে। তুহিনা এখন ঠিক মার মূর্তিতে নেই, তবু তার ছন্দে যেন গহিন কোন বার্তার সংকেত চলেছে। নদীর সেই উজ্জ্বল ডাকিনী-মন্ত্র অবশেষে স্নানরতা মিকদের গায়েও বুঝি পাখ্‌না ছড়ায়। প্রায় গলা-জল পর্যন্ত চলে গেছে তারা, হুঁশ নেই কাপড় খুলে গিয়ে জলে ভাসছে। ভোঙার মতন ফুলে উঠেছে নিচের খোল। তবু হাসি যেমন বন্ধ হয় না, অন্য কোন দিকেও নজর পড়ে না।

শেষে সহসা বুঝি চমক ফিরেছে বঙলার, তাড়াতাড়ি পারের দিকে গা ভাসিয়েছে। পিছনে লাছলীকে সতর্ক করে ডেকেছে, আর দূরে যাস নাই, ফুল। ইবার উঠ্যে আয় কেনে।

লাছলী তখনো হেসে যায়। জল ছিটিয়ে দেয় বাংবীর উদ্দেশে। নিরাবরণা আদুল দেহ, তবু সংকোচ বোধ করে না কিছুর তরে। নদীর পাড় জন মানব শূন্য। সুতরাং ত্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। আজই তো সবচেয়ে বেশী [illegible]-ছিপিয়ে উপভোগ করবার দিন।

ঠিক এমনসময়ই ঘটনা বিপত্তি।

সহসা বঙলার নজরে পড়ল, জলে ভেসে আসছে প্রকাণ্ড চেহারার এক পাহাড়ী সাপ।

ডাঙা পাচ্ছে না, কোন একটা অবলম্বনের আশায় ছটপটাচ্ছে সেই কালমরণ। তুহিনার পাড়বাসী জাদান মানুষেরা জানে, কত ভয়ংকর, বিষধর এই সাপ। জলে থাই না পেয়ে ওলোট-পালোট হবে, কোন অবলম্বন পাওয়া মাত্র তাকে জড়িয়ে ধরে তুরন্ত গতি স্রোতের মুখ থেকে। বাঁচাতে চেষ্টা করবে শেষে, তাকেই আবার খাবে। ঘর হারিয়ে দূর পথ পরিক্রমায় অসহনীয় কষ্টের নির্যাতনে সে তখন চরম নিষ্ঠুর। বঙলা আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে চিৎকার করে উঠল, হেই সামাল। বিইং, বিইং।

ঘুরে দেখেই লাছলীর মুখ মরা মানুষের মতো সিঁটিয়ে সাদা

হয়ে গেছে। ত্রস্তে ছুটে উঠতে যাবে পারের ওপরে, শেষ ধাপিতে পা দিয়েছে—বাঁশের ধাপি, গত চব্বিশ ঘণ্টার নাগাড় বৃষ্টিতে এমনিতেই পিচ্ছিল হয়েছিল, তারপর খানিক আগে রঙলা ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপড় পালটিয়েছে—পা পাত্‌তেই হড়কে গেল। পরমুহূর্তে টাল-সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে জলের মধ্যে।

নদী এখন ওপরে যত ছুটন্ত, তলায় চোরা টানে তার চেয়েও অধিক গতিমান। ঘুর্ণি উঠছে এখানে-সেখানে। ক্রমাগত ঢেউ এসে আছড়াচ্ছে খাড়ি পাড়ের তটভূমি জুড়ে। ফলে, পড়া মাত্র দুর্বার জলের টানে কোথায় যেন পলকে অদৃশ্য হল লাছলী। দুহিনার নিচে স্তূপ স্তূপ পাথরের ঢিবি আছে। তাইতে জলের তরঙ্গে ঝাপটা নাচে। অর্থাৎ তোড়ের মুখে পড়লে জলের আঘাতে পাথরে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রঙলা তখন ভয়-শঙ্কায় ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল। ডাকল, লাছলীর নাম ধরে।—হাই ফুল মোর।

কিন্তু না, কোন উত্তর এল না। কেবল ঢেউ ভাঙার যে শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই তাদের অনুভূতি রাজ্যে আলোড়ন ডাকিয়েছিল, সেই একহারা শব্দটাই যা কিছু নৈঃশব্দ্যকে চিরে দিয়ে গেল। আর ঠিক এমনি সময়ে, পারের আফিং ও বাঘা ভেরেণ্ডার ঝুপসি ঝাড়-জঙ্গল থেকে কে একজন মানুষ বুঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রঙলা তাকে টপ্‌ করেই চিনল না। কিন্তু সেই মানুষ জল হতে চিৎকার করে তাকে সাহস যোগালে।—মো আছি রঙলা দোয়ী, ডর লাই কুছ। লাছলী মিসেরারে বাঁচাবই। দোয়ী ও মিসেরা দুই-ই বাওয়া ভাষায় বোন বোঝায়।

রঙলা তখন বিস্মিত হল। গলার আওয়াজে মানুষটাকে সনাক্ত করতে এবার আর তার তিলার্ধ বিলম্ব হয় না। মানুষটা, সুধ্‌না। যাকে তারা পট্টির লুকরান মরদ বলে রহস্য করে। ঘরে তার মাওসী জরু অসুস্থ। সে-কারণে লোকটা সর্বদা ছোঁক্ ছোঁক্ করে ঘুরে

বেড়ায় পাড়া-ঘরের অপরাপর মেয়েদের পিছনে। রঙলার পিছনেও ঘোরে। রঙলা জানে, সুযোগ পেলে নিশ্চয় লাছলীর পিছনেও ঘুরে থাকবে। আর আরেকটা বাতিক আছে, অনেকদিন ধরে-ফেলেছে রঙলা, নদীতে কোন মেয়েকে স্নান করতে দেখলেই, অমনি জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ওত্ পেতে বসে পড়ে। এবং তারপর অপলকে সেই মনোহর দৃশ্যরাজি দেখে যায়। আদুল গায়ের বাওয়ানী মেয়েকে দু' চোখ ভরে দেখার মতোই সামগ্রী বটে। ভারী নিতম্ব, সুপুষ্ট বক্ষভারে মজবুত চেহারা। যেন প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া মূর্তি। রঙলা কয়েক মুহূর্ত ভেবে পেল না, এই দণ্ডে সুধ্না এখানে উপস্থিত হল কি করে? এবং এই ঝড়জলে ওই বাঘা ভেরেণ্ডার জঙ্গলেই বা কি করছিল? তবে কি তার সন্দেহ মতো, এতক্ষণ সে তাদের স্নান করা প্রত্যক্ষ করছিল? কিন্তু এখন এত সব প্রসঙ্গ তলিয়ে ভাববার সময় নয়। রঙলা প্রথমে তাকে প্রতি-চিৎকারে উৎসাহিত করতে চাইলে, ভাল কর‍্যা খুঁজ্যে দেখো সুধ্না বৈহা। সুধনা ভাই। বলেই আর মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে পাড়ার দিকে মুখ করে চেঁচাতে থাকল, হেই, কে আছ গ, ছুট্যে আস জলদি জলদি। মেয়া এট্টা ভেসে গেল।

জল-মুখে গোঙানির মতো শব্দ করে পিছনের দাওয়া হতে সুধ্না উত্তর পাঠালে, চিন্তা লাই দোয়ী, কছি যি।

রঙলা কাঁদল, হঁ, বঙ্গা ভরসা।

ইতিমধ্যে হাঁক-ডাক পড়ে যায় পট্টি জুড়ে। ছুটতে ছুটতে সকলে এসে পৌঁছোয় সেখানে। বদমাইস স্বামীটা ছেড়ে চলে গেছে শহরের প্রলোভনে, এ কারণে সকলেই তার প্রতি বিশেষ এক প্রকার মমতা পোষণ করে। তারপর এই বন-রাজত্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েও আবার লাছলী। সে-কারণেও তার প্রতি অনেকেরই বাড়তি আরেক প্রকার স্নেহ আছে। তুহিনার এখন যে চেহারা, ভয় পাওয়া তাই তাদের এত বেশি। তাদের বুক বিচিত্র এক

পিরানের বাদল বাজনায় কেঁপে উঠল তুরতুরিয়ে। অনেকেই হুতোশে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

ক্রমে তুহিনার পাড় এক আশ্চর্য নিথরতায় বুঁদ হয়ে ওঠে। লালকুঁয়োয় তখন যেন আর বাতাস বইছে না। মেঘ-জমাট আকাশ নেমে এসেছে স্রোতের বুকে। গাছগাছালিও রহস্যময় নীরবতা পালন করছে। কেবল চোরা পাথরে বাড়ি খেয়ে রঙ্গিণী নদীর লক্ষ ফণার নাচনটা অব্যাহত রইল।

ওদিকে একপাল মানুষ বোবা আতঙ্কে যেন একেবারে পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। মুখে রা কাটছে না কারো। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার অবস্থায়। হাত পা থরো থরো কম্পমান। অপলকে চেয়ে আছে দূর অন্ধকার জলের পানে।

এখন সন্ধ্যা বেশ ঘোর হয়ে এসেছে। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। অর্থাৎ আবার ঝরণ নামল বলে। লালকুঁয়োর পশ্চাৎপটে চুনা পাথরের পাহাড় আছে একটা। জাদান মানুষেরা যাকে খড়ি ডুংরী বলে। সেদিক থেকে বুনো বাতাসের হেঁচানি উঠেছে পুনরায়।

এমনিক্ষণে হাসনা সেখানে এল। সে ভিড়ের মধ্যে ছিল না। সংবাদ পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে সামনে যাকে পেল, উৎকণ্ঠা ভরা আবেগে জানতে চাইলে, খবরটা সত্য কি না? এবং জবাব দিতে গিয়ে মাথা নেড়েছে কি নাড়ে নি উত্তরদাতা, হাসনা ঝট্‌পট্ তৈরী হয়ে নিল জলে ঝাপাবে বলে। জবাবকারী তাড়াতাড়ি হাত ধরে থামাতে গেল তাকে, যতই সাঁতারে ওস্তাদ হোক, বিপদ কখন কার কিভাবে আসে কোন ঠিক নেই। নদীর যা ভয়ংকরী ছিরি এখন। হাসনা এক ঝটকায় তাকে ছিটকে দিয়ে লাফ কষাল। কেবল লাফাবার আগে মুখ তুলে একবার যেন বললে, মোর জিন্দগীর দাবকান ঠেল। অর্থাৎ আমার জীবনের বিনিময়েও ও ফিরবে। ইতিমধ্যে পারঘাটার জলে নেমে পড়েছে আরো অনেকে। সকলে আঁতিপাঁতি করে

খুঁজতে থাকে, যদি পাথরের খানা-খন্দে কোথাও আটকে গিয়ে থাকে কোমল তনু।

থলো নৈঃশব্দ্যটা আবার দানা বেঁধে আসে। যারা গোড়ালি জলে ছিল, কোমর জলে নেমে যায় হাওয়ার টানে টানে। ওপরের পাড়ে কাঁদা-কাটা অব্যাহত আছে। কানিবুড় ঝউ-া কাঁদছে. মোর বহু। আমার বউ। পেটের ছেলেটা বেবাসী খাখাড়া হয়ে গেছে। লম্পট। সব স্মৃতি নিয়ে এখন লাছলার বেচে থাকা। রঙলা কাঁদছিল, আছাড়-পিছাড়ি কান্না। তার সঙ্গেই লাছলী ঘাটলা পারে জল নিতে এসেছিল, শেযে এই অঘটন। এখন আবেক হারাম-বুড়ী গামু হাতম (পিসী) এমন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, যারপর এই বনের বাতাস সত্যি সত্যি যেন গুং-ছেড়া হল। তার ভয় বেশী হাসনাকে নিয়ে। বুড়ীর বুকের তোলা চোট মানুষ হয়েছে ছেলেটা। মা-বাপ মারা গেছে কোন্ শিশুকালে। সেই থেকে ছোড়া তার ন্যাওটা। বুড়ী খ্যানখ্যানে গলায় ঝুঁকে পড়ে দম-ফাটা চেঁচাতে থাকল, আর অজস্র গাল মন্দ করতে থাকল অনুপস্থিত হাসনাব উদ্দেশে, তার বেহিসেবী কাজের জন্য- হাড়লের বাচ্চা। ডাংরা কাঁহকা। নিজে মরে, মোকেও মারবে গ। যে মানুষটা ধরতে গিয়েছিল হাসনাকে, বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, জলে না ঝাঁপাবার জন্য- সে কেবল খামোস থেকে বার বার নফুের গালে-মুখে হাত বুলোতে থাকে আব বিরক্তিসূচক স্বরে কি যেন বিড়-বিড় করে বকে যায়। ঝটকা দেওয়াব সময হাসনার দঢ় শক্ত মুঠিটা তার চোয়ালে গিয়ে এমন আকস্মিক আঘাত হেনেছিল, সে জায়গাটা ফুলে উঠেছে পেযাবার মতন হয়ে।

এই সময় মাঝদরিয়া হতে জল-বুদবুদ ভরা সুধ নাব চাকত গলা ভেসে এল। তখন আবার লালকুঁয়োব বৃষ্টিধৌত নিথর বাতাস, মেঘলা সন্ধ্যার ফাগ মেখে চঞ্চল হল। পাড়ের বনরাজো গাছের পাতা দুলল লঝর-লঝর।

সুধ্না আর্ত উল্লাসে সংবাদ পাঠালো বুঝি।—হেই, পেছি গ পেছি। মিলছিক মোদির আঝনার্রে। আঝনার হল বউয়ের বোন, শালী।

*দোদুল বক্ষে সকলে ভরা নদীর দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। অন্ধকারে ম্লান চতুর্দিক। ঝুরি বৃষ্টির ছাঁটে দিগন্ত ধূসর চিত্রপট, ফলে দৃষ্টি ভাল চলে না। এই শুভ খবরের আশাতেই তো তারা এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। তখন নিচের নদীর মতোই চল্কা তরঙ্গ দোলায় খুশিয়ান হয়ে উঠল। অবশেষে সেই পীতাভ অন্ধকারেই যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, নদীর দোলনের তালে তালে দূর হতে কি একটা বস্তু এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে।

সমস্বরে জয়ধ্বনি উঠল সুধ্নার। নিস্তব্ধ বনভূমি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল অনেকক্ষণ ধরে।

ক্রমে বস্তুটা একটা ছায়ায় রূপ নিল। যুগল-বন্দী ছায়া। ছায়াটা হাঁপিয়ে পড়ে থামছে। খানিক দম নিয়ে বুঝি আবার এগুতে থাকল সামনে। এইভাবে যখন তারা একেবারেই সামনে এসে পড়ল, দেখে পলকে চিনতে দেরি হল না কারোর, অচৈতন্য লাছলী আলুথালু বসনে এলিয়ে আছে সুধ্নার পিঠে।

স্খলিত পায়ে ডাঙায় উঠে পাড়ের মাটিতে লাছলীর শিথিল শরীর আস্তে নামিয়ে রাখল সুধ্না। আজ এই মুহূর্তে তাকে যেন মনে হচ্ছে, সে কখনোই লুকরান নয়। পট্টির বহুজন ভয় কাটিয়ে নাবতে পারে নি ভরা স্রোতরঙ্গে। সেখানে প্রাণের সমস্ত মায়া ভুলে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। এবং তুলে এনেছে এক ভেসে যাওয়া বাওয়ানী দেহ। বাওয়া জীবনে মুড়িয়া-মাড়িয়াদের মতো গোলঘরের স্থান নেই। থাকলে রূপবুনিয়ার সেরা সুন্দরী হিসেবে সেখানকার রানী-পদ পাবার সে-ই যোগ্য বলে বিবেচিত হত। এখন লাছলীর মুখ রক্তাক্ত, ডুবন্ত পাথরে বুঝি ঘা লেগেছে। সেদিকে তাকিয়ে কারো চোখের পলক পড়ে না। খোলা চুল,

ছেঁড়াখোঁড়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ডে তাকে একটা পাগলিনীর মতো দেখাচ্ছে। ঝউলী প্লাবিত গণ্ডে দৌড়ে এসে তার ওপর আছড়ে পড়ল।—মেরী বাছু। বলে তার ওষ্ঠ-নেত্র টানতে থাকল। অশ্রুলাঞ্ছিত আঁকি-বুঁকি কাটা মুখ বুড়ীর, অদ্ভুত দেখাল। রঙলা কম্পিত গলায় ডাকলে, ফুল, ফুল। লাছলী তারপরও চোখ মেলে না। তখন কয়েকজন সাণ্ডি জোয়ান নানা কসরতে তার পেট থেকে জল বের করতে আরম্ভ করল। চুল ধরে ঝাঁকাল খানিক। ডিগবাজি খাইয়ে দোলালে। এবারে হুড়হুড়িয়ে জল নাবল নানা ধারায়। এবং কিছুটা সুস্থ হল যেন সে।

সকলে ব্যস্ত এইদিকে। অন্য কোন দিকে কোন প্রকার মন দেওয়ার অবকাশ নেই যেন কারো। শতেক রকম প্রশ্ন করছে সবাই সুধ্‌নাকে, তার জলে হাতড়ে ফেরার খবর। সে জবাবে যা বলছে, মন দিয়ে শুনছে শ্রোতারা। ওদিকে লাছলীকে খুঁজতে আরেকজন যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এবং এখনো সে উঠে আসে নি—সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ হয় না। তারপরেও কেউ লক্ষ্য করে না, সেই মানুষ বিনা ডাকাডাকিতে নিজেই কখন এক সময় জল ছেড়ে ওপরে উঠে এসেছে। মুখ তার শুকনো। নিশ্চিত পরাজিত হওয়ার লজ্জা চোখের দৃষ্টিতে। চুলের ডগায় ঝুল খেয়ে জল চুঁয়ে চুঁয়ে ঝরছে। সুঠাম শরীর ভাঙা। এসে সুধ্‌নার পাশে দাঁড়িয়েছে। হাত রেখেছে তার স্কন্ধে। কম্পিত গলায় বলেছে, হুঁ, মবদ বটিস তু বৈহা। সনৎহড়। পুণ্যবান।

আর তখন পায়ে পায়ে ডমরুর নিকটে যেন একটা মস্ত সুযোগ এসে দাঁড়ায়। সে হঠাৎ অট্টরবে হেঁকে উঠল, হেই, দেখ্‌লি মোদির বঙ্গারে। খেলো নি, পাড়বাসী মেয়াটোরে। জাদান ঘরের কুঁড়ি ইলকাকে মা-তুহিনা রাক্ষুসীর মতো গিলে বসে নি।

উন্মত্ত উছল জলধারা তীব্র স্রোতের হানাহানি নিয়ে দূর অন্ধকারে মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কম কথা নয়, সেই অন্ধ

গভীর মুঠি হতে লাছলী ফিরে এসেছে। আর এনেছে যে, সে বাওয়া পট্টির কোন সাগুি জোয়ান নয়, বরং লুকরান মানুষ একজন। বঙ্গার ইচ্ছা ভিন্ন রকম কিছু থাকলে, এমন নিশ্চয় কখনো সম্ভব হত না।

—লিচ্চয় গ।

তারা এমনিতেই খুব বেশী কথা বলছিল না। এখন ডমরুর আকস্মিক চিৎকারে কেমন ভড়কে গেল। তাদের সহসা বুঝি আরেক দুর্যোগময় দিনের কথা মনে পড়ল। এবং ডমরুও কি রহস্যময় কারণে কে জানে সেই প্রসঙ্গেই যেন বলে উঠল, আর সি বঙ্গার বুকি বেড় বাঁধতে চায় গ হাড়োলরা। শালো মোর। তখন তারা বাস্তবপক্ষে একেবারেই নিরুত্তর হয়ে রইল। এবং বুঝি কিছু পরিমাণে সন্ত্রস্তও হল।

ডমরুর গলায় বিশেষ সুর আছে। তারপর, সে এক আজব ভঙ্গিমায় কথা কয়। মধ্যরাত্রের বৃষ্টিস্নাত বিবর্ণ দিক্‌পটে তাকে দেখালও উদ্ভট রকমের। ডমরুর এই মূর্তি সকলেই সমীহ করে। এখুনি হয়ত কোন অজুহাতে নাচন-কোঁদন আরম্ভ করে দেবে। কিংবা কারো কোন ত্রুটি ধরে তার ওপর চড়াও হবে। ফলত ভিড় আস্তে আস্তে পাতলা হতে শুরু করল তখন মুরুব্বিও কি ভেবে আর বচসা না বাড়িয়ে তার ঘরমুখো পা ফেরায়। তবে চলতে চলতেও শাসানো ছাড়ে না। মো বলি, আয়ু আজ চাক্ষুস প্রমাণে ফির কয়্যা দিলেন গ, উ কাম বাওয়া সাগুানের লয়। মোরা ছুহিনার বালবাচ্চা। মায়ের বুকি বেড় পরাতে পারি? হাই লজ্জা। বঙ্গার লাদানিও লাগবেক লাই তবে। অভিশাপ পড়বে না!

রাত চেপে আসে। এতক্ষণ বৃষ্টি বন্ধ থেকে, আবার আকাশ ভাসিয়ে ঝরণ নামল। তাইতে অন্ধকার আরো ঝাপসা, পিঙ্গল হয়ে উঠল। পশ্চিমা হেঁগা বাতাস পত্রাবলীর দোলায় দোলায় সর্বমতো চাপা ধমকাতে আরম্ভ করল। যারা তখনও অপেক্ষা

করছিল, এবার উঠে পড়ল অনেকেই। লাছলীকেও ধরাধরি করে তুলে নিল। ভেজা অনেকেরই যথেষ্ট হয়েছে। পায়ের গোছ ডুবে যায় জল আজ সর্বখানেই। সুতরাং আলাদাভাবে জলে না নামলেও, যা কিছু করেছে সবই জলে দাঁড়িয়ে। এখন নতুন করে বৃষ্টি নামাতে, তাদের শীত লাগাটাও চড়ে গেল।

শীতের শুকনো মজা নদীতেই বর্ষারম্ভে গেরুয়া জলের ঢল নামে। বাওয়া মানুষেরা বলে, কুমারী নদী আখুন মা হয়্যাছেন, পোয়াতী বাবোস বাওয়ানীর মতুন। শরীল তাই অত ভরা-ভরা। অমুন টান তাই।

বুঝবাঝ মানুষের ভাষায় কিন্তু, জলেঙ্গা জল। অর্থাৎ ওপরে নদী এখন মারমূর্তি। ধস নামিয়েছে, পাড় ভাঙছে। জলে তাই লাল ছোপ।

লালকুঁয়োর গা-ছোঁয়া 'নাই', ব্রীড়াবনতা গাছুয়া ছুহিনা। জল তার গৈরিণী রঙের। আর সে কি উতরোল অট্টহাসি তার চলনে। ফেনিল গর্জনে ছুটছে দুরন্ত ধারায়। এখানের বনের অন্ধকারে বহু প্রকার বিষধর সাপ আছে। ঢেউয়ের ফণায় ফণায় সেইমতো হাজার সাপের কিলিবিলি। রাক্ষুসে ক্ষুধায় নদী পাড় ভাঙছে ঝুপুস-ঝাঁই। আর এ যেন নদীর পাড়বাসী সন্তানদের শিরা-হাড় .র ধরে একেক ধাক্কায় বুকের অস্থি-পাঁজর খসিয়ে নেওয়া! যাতে করে একটা শিহরণ অনুভূত হয় সমগ্র শরীরে। জল নিচ থেকে ফুলছে, ফাঁপছে। তীব্র স্রোত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে কোথাও। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতে কৃত্রিম ঘূর্ণি।

কথাটা ভুলে গিয়েছিল সকলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকতে দিল না বুরন গুণিন।

নাগরা গাঁয়ের পাচন বস্তি মধ্যে বুঝি আবার শহরে গিয়েছিল। সে-ই পাকাপোক্তভাবে দুঃসংবাদখানা বয়ে এনেছে। তার কাছ থেকে শুনে বুরন ক্রমে আবার সকলকে জানালে। বাঁধের কাজ নাকি এবার যথাসম্ভব দ্রুত আরম্ভ হবে। এবং সেইটেই চূড়ান্ত কথা নয়, জল জমিয়ে রাখার বিরাট একটা পুক্রী (পুকুর) হবে ওই সঙ্গে। সেখান থেকেই খাল কেটে জল যাবে এদিক-ওদিক। এবং সে-কারণে আশেপাশের সীমানা জুড়ে প্রায় দু'কুড়ি গ্রাম ডুবে যাবে জলের তলায়। লালকুঁয়ো থেকে কালকুড়ার দ' পর্যন্ত।

পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতে বিষয়খানা পরিবেশন করছিল বুরন। সব শুনে মাথায় বাড়ি পড়ার মতন অবস্থা হয়েছে খারোয়ার মাতব্বরদের।

বুরন বলেছে, হঁ, মোদির সব যাবেক গ। উয়ার লেগে রাঃ করা ছাড়া, আর কিছু করার নি।

এমনিতে বুরন প্রায় বাউরা আদমি। জমি-জেরাত তেমন কিছু নেই। অথচ উপার্জন ভাল। তাই অবাধে সে গ্রাম ছেড়ে মন-মতো অন্য কোনখানে চলে যেতে পারত। তা যে যায় নি, ওই এক বিশেষ দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই। ব্যাপারটা ভাবলেই পরিষ্কার হয়।

শ্রোতারা উচ্চকিত নিনাদে বলে উঠল, হাই, তবে আখুন কি হবেক গ?

বুরন মাথা নাড়ল, মো ভি ত তাই শেচাউড়ে। ভাবছি।

পঞ্চায়েতের আসর বসেছে পট্টির মাঝে। স্বভাবতই মুরুব্বি এই পরিবেশে অনেকখানি সহজ ছিল। বুরনের কথার মায়ায় আসরের সমগ্র পরিমণ্ডল জুড়ে সহসা বিচিত্র এক প্রকার শব্দহীনতা ঘনিয়ে উঠল। যাতে ডমরু আরো ভালো করে প্রত্যহকার স্বভাবের জোগান পেল। দূরের কোন সাঁওতাল পাড়া হতে ধংসা, মাদলের আওয়াজ ভেসে এল। এ দুঃসম্বাদ বুঝি তাদের কানে এখনো

পৌঁছোয় নি। তাই এত হল্লা-নাচ-গান চলেছে। এই মাতামাতি হুল্লোড়ের শব্দ শ্রবণে যেতেই, ডমরু ঝট্‌তি কেমন হয়ে গেল। এবং কোথাও কিছু নেই, এদেরকে নিয়েই প্রথম পড়ল। বনের বাঘের হুংকার ছেড়ে চেঁচিয়ে ডাকলে, ই শালোদির পহেলা ধরে পিটাতে হয়। যেন অপরাধ যাকিছু ওদেরই। দাপাদাপি, উন্মত্ত উছল আচরণে অশ্রাব্য খিস্তি কাটতে লাগল ওই সঙ্গে। পরে চিরদিনের রেওয়াজে অভিশাপ আউড়োনোর ভাষায় সে তখন ক্ষিপ্তের মতো নব নব এমন সব আজব ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করল, যাতে মনে হল, সত্যি সে বুঝি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে।

একজন বেফাঁস বলার মতো বোধহয় বাঁধ রেকার উপকারিতা সম্পর্কে কিছু প্রশস্তি করেছে, সে কথা কানাকানি হয়ে কিভাবে মুরুব্বির কানে পৌঁছোয়, শুনে একবাক্যে ডমরু ফুটন্ত আগুন হয়ে ওঠে। আসরের মাঝমধ্যে দাঁড়িয়েই যেন দুর্বার তাড়সে নেচে উঠল।—কে, কে ক'লি রে কথাটো, আণ্ডিয়ার বাচ্চা। একবার মুখ দেখা, দেখি। চিনে নি।

ডমরুকে যারা চেনে, স্বভাবতই তার ওই মধুর সম্ভাষণে লেশমাত্র উৎসাহিত হবার কথা নয়। সুতরাং আসর নিশ্চুপ রইল। তবে, বাস্তবিকই কথাটা চট্ করে উড়িয়ে দেবার নয়, রাত ফুরতেই ঘরের মেয়ে-মরদ সংসার-গৃহ ফেলে রেখে টুক্‌রি হাতে ছুটবে বেড়-পাড়। বাওয়ানা মেয়ের স্বাতন্ত্র্য, মাওসী নালবান গাঁয়ের যাবতীয় সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে।

তুলকার শব্দ বড় সাংঘাতিক জিনস। তার নমুনা তো তারা ইতিমধ্যেই দেখতে শুরু করেছে। আগে যেসব অরণ্যচারী সুখ-ভাবনা ছিল, এখন তার অনেক কিছুই বিলীন হওয়ার পথে। জীবন সম্পর্কে পুরোনো মূল্যবোধও প্রতিনিয়ত একটু একটু করে পাল্‌টে যাচ্ছে। তার স্থানে নতুন চাহিদা বাড়ছে, নতুনতর আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন। বাওয়া পুরুষ খোয়াব দেখে, নানান বর্ণালী

দিনের। জরু-গরুর স্বপ্ন তো আছেই, তা বাদেও কত সুখচিন্তা। বাওয়ানী মেয়ের দোদুল মনে নাচে, বহুপ্রকার নিষিদ্ধ গাওনার ছড়। কাঁচপোকার টিপ, ডুরে রঙীন শাড়ীর স্বপ্ন।

বিবিধ ভাবনায় সকলে যখন বিক্ষত-অন্তর, এবং ডমরুর নাচানাচিও অব্যাহত আছে, বুরন হঠাৎ মুখ ফসকে বলেছে বুঝি কথাটা, তবে হুঁ, দিনকাল কি আর চিরকাল একরকম যায়? কত কিছুই পালটালো। কত কিছুই হয়ত আরো পালটাবেক্ গ।

বুরন বলেছে কথাটা অনেকটা আপ্তবাক্যের মতো। কাউকে বড় একটা শোনাবার মতো করে নয়, তবু ডমরু কিভাবে যেন শুনতে পেয়ে যায়। এবং শোনামাত্র তড়াক্ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে পিছন ফিরে। তারপর খানিকক্ষণ রোষ কষায়িত দেখেছে বুরনকে। শেষে ধাঁ করে লাফ দিয়ে ওঠে গুণিনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়েই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গলা টিপে ধরল। যেন ওই কথা বলেই প্রকাণ্ড একখানা অপরাধ ঘটিয়ে বসেছে গুণিন।—শালো বাইরী হড়। শত্রুর বুলি আউড়োনো হছে? প্রথমেই তবে তোরে শেষ করয়্যা নি। এট্টা শয়তান অন্তত কমুক।

দমবন্ধ হয়ে বুরনের অবস্থা প্রায় সঙ্গীন হয়ে উঠল। সে গোঁ-গোঁ করে ছটফটাতে থাকল। তখন সবাই মিলিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, হেই মুরুব্বি, করো কি? মানওয়াটো শেষে খতম হয়্যা যাবেক যি গ। বলে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনতে চাইল তাকে। কিন্তু সে কি তীব্র ফোঁসানি ডমরুর। সুযোগ পেলে সে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে তাকে।

ছাড়া পেয়ে বুরন সরে গিয়ে দাঁড়াল। তার আনত মুখ রঞ্জিত দেখাল। অপমানটা গায়ে বিঁধেছে। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। সকলে এসে বোঝাতে থাকল তাকে, এ-যাত্রায় মাফি করয়্যা দাও। আমরা মুরুব্বির হয়্যা ক্ষমা চেছি। তুমি

দিশমবাবা। গাঁও-বুড়ো। তোমরা একটু বুঝ-বাঝ নাহলে, কম বয়েসীদের কি কব ?

দেখলে শুনলে মনে হবে, কোন বচসার ফয়সলার জন্যই যেন আজ এখানে এসে মিলিত হয়েছিল সকলে। পঞ্চায়েত ডেকেছিল।

স্বভাবতই শিবিরের সকলকে মনে হতে থাকল গভীর ডমরু-পন্থী। মুরুব্বি অতঃপর সেই ঠেকনো পাওয়ার আনন্দে আরো লাগাম ছাড়া হল। নেচে নেচে বলতে লাগল, মারলম কি শালো, তুয়ারে কাট্যে দু'টুকরা কর‍্যা উ গাড়ার পানিতে ভাসায়ে দিব। তবে মোর নাম ডমরু।

ইতিমধ্যে ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। মুরুব্বি ও গুণিনের বিবাদে অনেকে বিরক্ত বোধ করে চলে গেছে। বিশেষ করে মেয়েরা। কারণ এইসব তর্ক-বিতর্কের মুহূর্তে মুরুব্বির কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোথা থেকে মাথামুণ্ডুহীন সূত্র ধরে হয়তো তাদেরকেই নাস্তানাবুদ করতে লেগে যাবে।

কল-জানোয়ার আগমনের প্রথম দিনে, যে জোয়ানের দলটা প্রচণ্ড বিক্ষোভে গজরাচ্ছিল, এক্ষণে সেই দলটাতেই যেন প্রথম ভাঙন ধরল। তাদের অনেকেই বুরনের ভাষ্যে নড়ে-চড়ে বসল। যখন দিন ছিল, কেউই সজাগ-সাবধান হল না, আর যখন একান্ত করেই হাতের ঢিল ছুটে বেরিয়ে গেছে, তখন আর অযথা সতর্ক হওয়ার কোন্ অর্থ হয় ? কি ফলই বা তাইতে দর্শাবে ? বুলকানার মতো কথা বলা ভালো লাগে না। বরং তা যদি আজ নিতান্তই অপ্রতিরোধ্য মনে হয়ে থাকে, জীবনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নেওয়াই উচিত। অযথা শক্তিক্ষয়ের কোন মানে হয় না।

অতঃপর টিক্রু ও তার সঙ্গী আরো ক'জন সেইমতো প্রস্তাবনা গাইলে, গুণিন ত কুনো বুরা বাত্ কয় লাই। ঠিক কথাই ত, ঘায়যুগ একরকুম যায় লিকিন ? জোখা বেড়া পালটাবেই। চিরকাল

এরকম যায় নাকি? সময় বদলাবেই। ক্রমে শিবির দু'ভাগ হয়ে একটা মারপিট বাধার যোগাড় হল। প্রত্যেকের মুখে কথা। কেউ বোঝাতে চায় বুরনের কথার সারৎসার। আবার কেউ ডমরুর নিষেধাজ্ঞাই বড় বলে মনে করে।

তখন টিক্রু ও তার সঙ্গীসাথীরা খচেমচে বাকি সিদ্ধান্তগুলোও জানিয়ে দিল, মোরা ভাবি, ই ত ভালাই তবে। কাম করব গতর খাটাব, নগদা পইসা মিলবিক। মাহাজন চুয়াদির পিছিন ঘুরতে হবেক লাই আর রাল বিচবার লেগে? কোম্‌ড়োদির আর ঢুকতেই দিব লাই মোদির ই নীলবান গাঁয়ে। নদীর দোনো পাড় জুড়ে বেড় পড়লে, শোহুর যেতেও কোন দিক্ পোহাতে হবেক লাই কারো। সোঝেহর্। সোজা রাস্তা।

জাদান-ঘরে এই ধরনের বিদ্রোহের উক্তি এই প্রথম। মনে যাই থাকুক, প্রকাশ্যে এবম্প্রকার বিবৃতি দেওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। বুরন পর্যন্ত হক্‌চকিয়ে যায়। অপরাপর সকলে অবাক্ চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের পানে। জিন্-টিন্ ভর করেছে নাকি তাদের ওপরও? অথবা গলা পর্যন্ত হাম্‌ডি টেনে বেহেড্ হয়ে এসেছে? ডমরু যেন সংজ্ঞাহীন মূক মানুষ। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে দ্বিধা হচ্ছে। অপলকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকে টিক্রু ও তার গাতেদের। টিক্রু হল এই অরণ্য হাতায় শক্তির দিক দিয়ে সর্বপ্রধান ব্যক্তি। বাঁড়িয়াদের ওপর তার একটা জাতক্রোধ আছে। ওর বউ লয়লাকে ধরবার জন্য একদা ফাঁদ বিছিয়েছিল মহাজন খোদাবক্স আলি। যদিও শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয় নি। সেকথা কোনদিন সে ভুলতে পারবে না। এই কারণে বহু সময় ডমরু তাকে পাশে পায়। এখন অবিকল বুরনেরই ভাবভঙ্গির প্রতিধ্বনি শুনে মুরুব্বি প্রথমে দিশহারা হল। পরে, হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।—হায় রে, ছিনাল জাদান ভুঁইয়ের নসীব! এই হপন্-হপন্-এরা (বেটা-বেটি) পয়দা কর্যা ছিলিস।

মরে যাই গ। বলে ভীষণ ম্রিয়মাণ হয়ে মাজা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আবিল ধারা ঝরতে থাকল চিবুক-গণ্ড প্লাবিত করে। পরে খকখকিয়ে কেশে উঠল। কিন্তু কাশির শব্দ ঠিক পরিষ্কার হল না। যেন গরুতে শুক্‌নো মরা পাতা চিবোচ্ছে, তারই একটা খ্যাস খ্যাস আওয়াজ বাজল কেবল। মুখে আর কোন কথা নেই।

অবশেষে আর্ত মানুষের পায়ে যেন বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল সে পিছনের চাতালের অন্ধকারে। সেখানে দাওয়ার খুঁটি-বাঁশের দীর্ঘছায়া। তাইতে অন্ধকার বেশ নিরেট, ঘন। ডমরু সেখানে গিয়ে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে হাত পা ভেঙে বসে পড়ল। এবং যেমন কাঁদছিল, ফোঁপাতে থাকল।

এখন টিক্রু আর তার সাঙাৎ ক'জনরাই একদলে নয়। আরো অনেকে গুড়গুড়িয়ে এসে তাদের পাশে দাঁড়ায়। একটু আগেও যারা ডমরুর হয়ে লড়াই কুঁদতে উঠেছিল, তাদের মধ্যেও জনা কয়েক দল খসিয়ে এদিকে এসে ভিড়লে। আর তখন যেন বুরনই এই বনের কিষাঁর। প্রভু। সে টান হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকালে। যে অভিমত সে পেশ করেছিল, গাঁ ঘরের অধিকাংশেরই এখন চুপচাপ্ সম্মতি তাইতে। অতএব পায়াভারী হবারই কথা। মুরুব্বির রণে ভঙ্গ দেওয়াও তো তার কাছে আত্মসমর্পণেরই সামিল। সুতরাং আরো বিজ্ঞ মানুষের ভাবে এবার কথা বললে গুণিন। বলে, রাগি লাই করা সব ব্যাপারটো খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দিখতে হবেক গ পহেলা, ক্ষতি মোদির কতখানি, কিসে হয়। নাফাও কিছু আছিক লিকিন?

ঠিক এই সময় প্রথম পক্ষের রাত্রি ঘোষণা করে দূরের বনে মিছু ডেকে উঠল। মিছু শুধু শিয়াল নয়, বুড়ো জটু সর্দার মহাদেও-এর বাহন। তাঁর সম্মতি থাকলে তবেই মিছু ডাকে। অতএব অমনি তারা উৎফুল্লিত হয়। শুভ বার্তা। বঙ্গার নির্দেশ।

ডমরু এইক্ষণে বুঝি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না। সঙ্ঘের

সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে সব কিছু। সে হঠাৎ সে-স্থান থেকেই আকাশ-ফাটা চিৎকার করে উঠল। তারপর আবিল আকুল কান্না মুছে এমন এক বীভৎস রূপ ধরল, অনেকেই ভয়ে শিউরে গেল। আসরের লম্ফের আলোয় সব স্পষ্ট নয়, রোশনাইও অপর্যাপ্ত—সে কারণেই আরো হয়তো ডমরুকে খুনে-খুনে দেখাল। ভিন্ জাতির সঙ্গে লড়াইয়ের সময় বাওয়া মরদের অনেকটা যেরকম চেহারা হয়। কেবল হাতে তার এখন তীরধনুক নেই, এই যা। কুঁদে হাঁকাড়ি ছেড়ে সে বললে, লেকিন্ মো ভি কছি, দেখি, কার কত হিম্মৎ, সহবৎ ছিনায়ে ল্যে আয়ুর। মার সম্ভ্রম নষ্ট করে কে, কিভাবে—দেখবে সে তাকে। বলেই আর থাকা নয়, ডমরু ছুটে বেরিয়ে যায় প্রাঙ্গণ ছেড়ে।

বুরন কি বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত আর বলল না। চুপ করে গেল। চারিপাশে তার বহুজনের ভিড়। কেউ হাসছে না। কথা বলছে না। থমকানো চেহারা সবার। বুরন তাইতে কেমন ভয় পেয়ে গেল। আর সেইমতো ঠকঠকিয়ে কেঁপে উঠল। বাওয়া পুরুষের এই তো মরণ, যতক্ষণ তর্ক আছে, রাগারাগি আছে, বেশ কুঁদবে। যেই মিটে গেল লড়ালড়ি, একপক্ষ হার স্বীকার করে নিলে, তখন আরেক ভাবনা মনের সমগ্র তটরেখা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। পরাজিত লোকটার ওপরেই হয়তো অচলা প্রেম-ভক্তি চড়ে গেল। এখন সকলের তাকানোয় বুরন যেন সেই স্বভাবের আঁচ পেল। কিন্তু সে তো বিশেষ কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে ডমরুর বিপক্ষে যায় নি। প্রথমে ছিল কথার কথা। তারপর কেমন রোখ্ উঠে গিয়েছিল। ডমরু যত চেয়েছে বিষয়টাকে নিয়ে ঘোলাতে, ততই সে বিরুদ্ধ মতবাদী হয়ে উঠছিল।

তুল্‌কা না থাকলে মানওয়ার পরান বাঁচে না। এই সত্য নীলবান দেশের মানুষ জেনেছে, বাঁড়িয়া মহাজনদের মুখ থেকে। আজ এই নিথর বনস্থলীর হৃৎপিণ্ডেও যেন সেই গানের সুর উঠতে

চায়, বুরন স্থিরচিত্তে তা-ই খানিক শুনল। তখন ডমরু যেমন ভয়ে কেঁদে উঠেছিল, বুরনেরও কাঁদতে ইচ্ছা করল। এবং কাঁপুনির মাত্রাটা বেড়ে গেল পূর্বাপেক্ষা।

শেষ পর্যন্ত কথাটা সত্যি হল।

সেদিন আর তুহিনায় কোন রঙ্গিণী তরল নাচন নেই। বুরন, ডমরু, খারোয়ার অন্যান্য মাতব্বরদের কারো ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়ও কিছু এসে যায় না। প্রত্যেকের চোখে জল ঘন হয়। কোন বাধাই আজ আর বাধা নয়। বুরনের ভাষ্যে জোয়ানের যে দলটাতে সেদিন মৃত্ সম্মতির আভাষ খেলেছিল, আজ তাদের মুখও যেন মেঘভারে থমথমে হয়ে ওঠে। শত হলেও তুহিনাকে মায়ের মতোই ভক্তি করে এসেছে এতকাল। তাদের বঙ্গা। দেওতা। মুরুব্বির ভাষায়, সেই মায়ের নরম বুক দলিত লাঞ্ছিত হবে অপর ভিন্-পারসী মানুষের ইচ্ছায় নির্দেশে।

আসছে কিষাঁরের (সরকারের) লোক। জমি দখল নিচ্ছে। শাল-শিরিষ-মহুয়া-আমলকী বন কাটা পড়ছে। টিলা-টিবি ফাটিয়ে নতুন পত্তনিতে বসত হচ্ছে মানুষজনের। রেজা কুলি-কামিনদের ধাওড়া উঠছে। মেঠো পথের রাঙা ধুলো উড়িয়ে কলের গাড়ির চকিত যাওয়া-আসা আছে সারাক্ষণ। মন-লোভনা সওদা সাজিয়ে দোকানঘর বসছে। হ্যাজাক লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় সন্ধ্যার পরই ঝিলিক জ্বলে সেখানে। অরণ্যচারী মেয়ে-মরদের চোখে তার ছায়া কাঁপে।

গাঁ লালকুঁয়ো বনবাসী জীবন ছেড়ে নাগরী-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তার নিথর অঙ্গনে আবহমানকাল ধরে যে বুনো ছন্দের সংগীত গীত হয়ে চলেছিল, এইবারে এতদিনে তা যেন যথার্থ ভাষা পায়।

ডমরু চেঁচাল, হাই গ, ই কি শালো, সব হারামিরই মন তা'লি উড়ু উড়ু ছিল দেখা যায়।

আজ ডমরুর গালমন্দ চেঁচামেচি, দাপাদাপিতে কেউ বিরুদ্ধ মত জানাবে না। তবু দল জমে ওঠে না। যদিও সবার অন্তরেই কান্নার স্রোতটা বহমান আছে—তাদের মাওসী নীলবান জেরাত-গাঁয়ের এই প্রশান্তি মণ্ডিত রূপটা আর থাকবে না, সকল ঠাঁই নিয়ে নেবে আগন্তুক মানুষেরা—তবু যেন পূর্বেকার সেই প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ রোষটা আর কেউ বোধ করে না। এবং সেই মতো ভীম-গর্জনে রুখে দাঁড়াতে। সেখানে তার বদলে কারচুপে একটা নেশা ছড়িয়েছে। সুখ ভোগের কিছু প্রগল্‌ভ বাসনা।

তাই ডমরু আবারো যখন একই কথা বলে হাঁকানি ছাড়লে, তার রুক্ষ-কর্কশ কণ্ঠ জারুল-দেবদারু বনের বাতাসকে যেন কষে ধমক লাগাল। সবকারী তরফের মানুষ পিল্লাই সাহেব। একদিন দেহাতী জাদান বাওয়া সন্তানরা জেটেদের মধ্যে যাকে চেনা-চামড়ার মানুষ বলে সনাক্ত করেছিল। মুরুব্বির আস্ফালন কর্ণ-গোচর হতে, বোঝাতে চেয়েছেন, ভাবনায় তোদের কাজ কি? সব ব্যবস্থা আমরাই করে দেব। জমি যায়, ঘর যায়, নতুন জমি পাবি, ঘর তোলার খরচও মিলবে। ফিকির করিস না কিছুর। তোরা শুধু মজা মেরে কাজ করে যা। কাজ খালি।

মজা! যেন তিনিই কিছু আজব মজার কথা কয়েছেন। এবং সে কথা নিজের কানে শোনার পরও মাথা ঠিক রাখতে হবে ডমরুকে। সে এক্ষণে প্রথম দফায় পাগলের মতো ঘটা করে হেসে উঠল। তারপর একদৃষ্টে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা সক্রোধ ধমকে বলল, বা আণ্ডিয়া (ষাঁড়), হেরেল বটেক তু। জবর কলিজা ধরিস।

অর্থাৎ পুরুষ মানুষ সে সত্যি।

এখনো মুরুব্বির মুখের ওপর এই লালধুলোর দেশে দাঁড়িয়ে কেউ

কোন তর্ক করতে সাহস করে না। একজন বলতে পেরেছে, সাহসী নয়? তা-ও এমন সব বিরক্তিকর কথা, যা শুনলেই মুরব্বির মাথায় ঝট্ করে খুন চড়ে যায়। সব যাবে বাওয়া মানুষের, আর তারা কিনা হেসে গড়িয়ে মজা মেরে কাজ করে যাবে। কাজ হল আবার, মায়ের কোমল বক্ষ লোহা-বেড়িতে বাঁধাবাঁধি করা। শোনো কথা!

কথা হচ্ছিল একটা টিলার ওপরে। ঢিবির নিচ থেকে ছাড়া ছাড়া জঙ্গলের বিস্তার। মাঝে মাঝে পাথুরে প্রান্তরের ঢল। পিল্লাই সাহেব তখনো বুঝি ডমরুকে পুরোপুরি চেনেন নি। আবারো হার্দ্য ইচ্ছায় বোঝাতে চেয়েছেন, ভালোমন্দ প্রসঙ্গ। ডমরু সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে যেন বুড়ো আঙুলে পৃথিবী হেলালো।—পিরীতের কথা কছিস চ্যামনা! মোদির বে-বাসী কর‍্যা, জাদান ঘর ডুব্যে দ্যে, ফির সোহাগ পাতানো হছে, হঁ। শালো, দুসরা জমি মিললে কি মোদির বাপ-পিতামোর আসল ভুঁইটো পেলম্? উয়ার কি আঝা আছিক মোদির পাশ?

বাওয়া মানুষের কাছে সম্পর্ক-শূন্য মাটির কোন মূল্য নেই।

পিল্লাই সাহেব তারপরও যখন বলেছেন, তোরা টাকাও নিতে পারিস ইচ্ছে করলে। মনমতো ঠাঁই যেখানে খুশি কিনে নিতে পারবি। তখন আর বুঝি মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্ভবপর হয় না ডমরুর পক্ষে। দাঁত খামচে ছুটে এল। তারপর মুখোমুখি কোমরে হাত রেখে বাগিয়ে দাঁড়াল। কষিতে বাঁধা চকচকে বগিদা। একমাথা চুলের জঙ্গলে ঢাকা পড়া খপিস রক্তাক্ত দুই চক্ষু। ভাবভঙ্গিতে এখন একটা সম্পূর্ণ আসুরিক চেতনা যেন গ্রাস করেছে। সে বুঝি সত্যি সত্যি ওই বগিদায়ের এক কোপ বসিয়ে দেবে ভিন্-পারসীটার গর্দানায়। তাড়াতাড়ি সকলে দৌড়ে এসে ধরে ফেলল তাকে।

—হেই, করছিলি কি?

কিন্তু মুরুব্বি এখন বাস্তব পক্ষেই একেবারে বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে

গেছে। হাড় ডিগডিগে লম্বা একহারা ক্ষীণবুক একটুখানি চেহারা। শিরা ওঠা-ওঠা কাঠি-কাঠি হাত-পা। তবু তাইতেই যেন এই মুহূর্তে লক্ষ জোয়ানের শক্তি রাখে। সে বিকট সদম্ভ হুংকারে টানা চেঁচিয়ে বলল, উঃ দুশমনটোর হয়্যা কিছু কবি ত শালো, তুয়াদির ভি খুন কর্যা ফেলাব। দু'টুকরা কর্যা কাট্যে উ গাড়ার পানিতে ভাসায়ে দিব। তুল্‌কা। শালো, তুল্‌কার লোভ দিখায় আণ্ডিয়ার বাচ্চা।

লালক্রুয়োর বন-মৃত্তিকায় এখন এই এক প্রশ্ন। কে থাকবে প্রতিবাদের শিবিরে, কে নেবে বেড় বাঁধের নোক্‌রী? সন্দেহের বিষয় সবটাই। যদিও মুখে সকলেই এক মতের কথা বলবে। বাওয়া কানুন-ইজ্জত সবার ওপরে। তথাপি দল ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। প্রতিবাদের ধ্বনিও অনেক ম্রিয়মাণ।

যারা আছে, কিছু না ভেবেই হয়তো এক সময় চকিত হতাশ জাগা গলায় বলেছে, উ হারামিরা যি ভাগবে, আগেই জানতাম।

অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মুরুব্বি। উৎকর্ণ কানে শোনে সেই কথা। তারপর কণ্ঠে তার চিরায়ত ঘড়ঘড় আওয়াজটা তুলে খিঁচিয়ে ওঠে, জান্‌তি যদি, আগে বুলিস লাই কেনে গাড়োর বাচ্চারা? ইঁদুরের'বাচ্চা।

নিতান্তই কথার কথা ছিল। বাওয়া তরুণ-তরুণী যেভাবে ছেলমা গানের কলি গায়। ছেল্‌মা গান, মানে প্রেমের গান। দুলাড়ের সেরিং। বিশেষ না-ভাবাভাবি অবস্থায় আনমনা কিছু কওয়া। তারা ডমরুর উল্টো চাপে বিব্রত হয়। তারপর মুরুব্বির নিয়মে একখণ্ড প্রলয়ের অনুষ্ঠান ঘটে যায় সেখানে।

এদের মধ্যে যাদের মন উড়ু-উড়ু, খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতন ছটফটাচ্ছে, মুরুব্বির আজকের ধমকের পরও তারা কিন্তু আর কোনমতেই পূর্বের সেই খপিস ভাবটা ধরে না। এ নিয়ে এখন আর কোন তর্ক-হুড়োহুড়ি ভালো লাগে না। অনেক কিছুই যখন

অনিবার্য নিয়মে একদিন তাদের হারাতে হবে, মুরুব্বির দু-একটা এগের (গালি), কটুকথায় আর কি এসে গেল! বরং মুরুব্বি এখন যেন বাস্তবিকই একজন করুণার পাত্র। পারুক, না-পারুক পুরোনো বাওয়া রীতিকে আজও যে সবল মুঠিতে ধরে রাখতে চায়। নিজেরা প্রলোভনকে জয় করতে পারল না বলেই ব্যাপারটা আরো এত মহান ঠেকে তাদের অন্তরে। ডমরু আজ আক্ষরিক অর্থেই মুরুব্বি এই জাদান দেশের। পেয়ে হারানোর ব্যথাটা এমন করে বুঝি আর কখনো কোনদিনও বোঝে নি বাওয়া সন্তান।

আজ বন-কান্তারের সর্বাঙ্গ জুড়ে রাত্রিদিন হৈ-হট্টগোল, চেল্লাচিল্লি চলেছে। সামান্য কোন বিষয় নিয়ে মেয়ে-পুরুষে তুলকালাম অবুঝ অসার তর্ক হয়। সঙ্গে ডমরুর ঘ্যাগা-গলার খিস্তি-খাবুদ অব্যাহত থাকে। হম্বি-তম্বি। লাফ-ঝাঁপ। তুহিনার জলো হাওয়ায় ঢেউ নাচে ললিত তরঙ্গ। লালকুঁয়োর এই রূপান্তর ঠিক কারো অভিপ্রেত নয়, তবু অপ্রতিরোধ্য বলেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আজ আর কোন লাভ নেই।

খাড়াই পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে খোলা চত্বর। ওপরে এলে শোনা যাবে, কুলি-কামিনদের উল্লাসভরা চিৎকার। ওই চত্বর পেরিয়ে দূর পাথুরে ভূমির বিস্তার। মাঠ শেষ হয়ে গিয়ে ধূসর পাহাড়িয়ার বাঁকে। তুহিনা ওখানে গাহুয়া 'নাই' নয়। কিংবা মারাং গাড়া। বুনো ঝোরা পাথরে পাথরে পা-ছোঁয়া হয়ে নৃত্য-চঞ্চলা ভঙ্গীতে ছুটে এসে সহসা ঝাঁপিয়ে গড়েছে নিচের সমতলে। এবং অখণ্ড একধারা হয়ে তারপর বয়ে গেছে বনজঙ্গল-উৎরাইয়ের পথে। পরে সেই বন-পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে প্রায় একই স্থানে বারকয়েক বাঁক ফিরিয়ে বাওয়া পট্টির উপান্তে পৌঁছে, সে গাড়া হয়েছে। সমতলের বাসিন্দা।

রেজা কুলিপাড়া গানের পদে উচ্চকিত হয়। বেসুরো কাঁপানো তার সুর। এবং সেই সঙ্গে ধাওড়ার মেয়েদের বেপরোয়া বেলাজ হাসি। গুমগুম শব্দে ডিনামাইটে পাহাড় ফাটে। লাল আলোর নিশানায় সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়। খোলা দিগন্তের গায়ে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাজে। তারপর আরো রাত গড়ালে, ডেরায় ডেরায় ডিবরি লণ্ঠনের ম্লান আলো স্তিমিত হয়ে আসে। মাতালের হাঁক-ডাক বন্ধ হয়। মেয়েদের হুল্লোড়-গানেও মন্থরতা নামে। ক্রমে অরণ্যভূমি আদিম নৈঃশব্দ্যে সহসা যেন সাবেক চরিত্রটা ফিরে পায়। নিশাচর কিছু বুনো পশু আর বাদুড় যা কেবল তখনো লালকুঁয়োর বনরাজ্যের গোপন বার্তা রাত্রির শব্দহীনতাকে উপেক্ষা করে কণ্ঠ ও পাখ্‌নার সঙ্কেতে বলে যায়।

জঙ্গল সাফ করার কাজ নয়। তবে ইজারায় এর উল্লেখ থাকে। এবং মুখ্যত বাঁধ গড়ার আগে এই কাজটাই প্রথম করতে হবে। চাই অপরিমিত ঠাঁই। কর্মী মানুষজন থাকবে। যন্ত্রাংশ সারাইয়ের জন্য কারখানা বসবে। শেড-ঘর হবে। তাছাড়া, মূল বাঁধের কাজই তো বহুদূর স্থান পরিব্যাপ্ত অঞ্চল নিয়ে ছড়িয়ে থাকবে। প্রকাণ্ড বিল-সদৃশ রিজার্ভয়ের ট্যাঙ্ক হবে। নদী মুখে এম্‌ব্যাঙ্ক-মেণ্টের প্রাচীর উঠে গতি রুদ্ধ হবে প্রমত্ত স্রোতধারার। কাটা-খালে জলের চাপ নিয়ন্ত্রাধীন রাখার জন্য স্পিলওয়ে গেট বসবে। সর্বোপরি, সেই সারিবন্দী গেটের ওপর দিয়ে তিরিশ ফুট চওড়া দীর্ঘ এক সড়ক নির্মিত হবে। লালকুঁয়ো থেকে কালকুড়ার দ' হয়ে টানা চলে যাবে শহরের দিকে। মোটর ছুটবে রাজিম পেরিয়ে রায়পুর।

শিশু-মহুয়া-রয়না-পলাশ-হরিতকী-খয়ের-চিরতা-পিয়াশালের বন। সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য বহুতর বহুমূল্য লতাগুল্ম আছে। দূর দিকভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এই বন-পাহাড়ের রাজ্যসীমায় কিছু উৎকৃষ্ট পাথরও পাওয়া যায়। তবে তা চট করে নজরে পড়বে না। বন কাটার পরে ফাঁকা পাথুরে আবাদে পাত্তা লাগাতে হবে তার। এবং নসীব তোমার

ভালো হলে হাত বদলের এক নির্বাহেই লাখোপতি। জাদান সন্তান সেই পাথরের কদর আগে বুঝত না। ঝকঝকে রৌদ্র বর্ণের পাথরের গা থেকে যেন হাজার লণ্ঠনের রোশনাই ঠিকরোয়। তারা নাম বলত, হীর পাথর। সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানের ওপর সেই পাথর বসিয়ে বিষ নামাত দেহাতী ওঝা। প্রাত্যহিক জীবনে সেই পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে আগুন জ্বালানো হত। বাঁড়িয়া মহাজনরা সেই পাথর দেখে প্রথম হতবিহ্বল হয়। এবং লোভে চোখ তাদের চিকচিকিয়ে ওঠে ওই পাথরের রঙেই। ক্রমে জাদান সন্তানকে নানান প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে সেই দুর্মূল্য সম্পদ হস্তগত করেছে। হীর পাথর বাদেও, নদী-মুখে খাদানের ঢালে রাশি রাশি স্তূপীকৃত যে লোহা-পাথরের চাঙড় পড়ে আছে—পাথর নয়, বুঝি সোনা– সেদিকে তাকিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফার স্বপ্ন দেখে ঠিকাদারকুল।

দেখছিল সম্ভবত লালজীয়র সিংও। এক সুন্দর মেঘলা ভাঙা প্রভাতে খোলা আকাশের নিচে উবু হয়ে বসে মুঠো মুঠো ধুলো সে তার পরিহিত বেনিয়ানের পকেটে পুরছিল। আর তাই দেখে পিছনে হেসে উঠেছিল আরেক নবাগত মানুষ, তারই ঠিকাদারী কোম্পানীর ম্যানেজার-ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। জানতে চেয়েছে, কি খবর সিংজী, এই কাকভোরে কি করা হচ্ছে এখানে? পরে নিকটে পৌঁছে বিস্ময়ে চক্ষু ওপরে তুলে আবার বলেছিল, আরে একি কাণ্ড! এভাবে ধুলো পুরছেন কেন পকেটে?

—ধূল্ কহা সাহাব? লালজীয়ুর আকর্ণ বিস্তৃত হেসেছিল জবাবে। হমারা সোনেচাঁদা।

জল-জঙ্গল-পাহাড়ের মাথায় তখন প্রথম সূর্যের রক্তিমাভায় হোলি মহোৎসবের আয়োজন চলেছে। সেই আলোতে প্লাবিত খাদানের ঢালও। কালো কষ্টি বর্ণের পাথর সবুজ-সোনায় মাখামাখি হয়ে সে এক বিচিত্র বর্ণ-ধরা। পাথরের স্তূপের পিছল

গাত্র চুঁইয়ে যেন তেল ঝরছে। চকচক করছে প্রতিটা গহ্বর-ফাটল।

লালজীয়ুর অতঃপর এক কাণ্ড করলে। একটা চাঁই পাথরকে সহসা পাঁজাকোলা করে জড়িয়ে তুলে ধরে খলখলিয়ে হেসে উঠল। তারপর শিশুকে যেভাবে আদর করে মানুষে, দু'হাতে অতি যত্নে চাবড়াতে থাকল।

ম্যানেজার-ইঞ্জিনীয়ার সাহেব এবারে আরো অবাক হয়ে গিয়েছিল তার রকম-সকমে।

দূর অঞ্চল থেকে তার টেনে বিজলী আনা হচ্ছে এই নিভৃত বন-কান্তারে। তাইতে ভুতুড়ে অন্ধকার তাড়িয়ে ইন্দা চাঁদোর রুপোলী আলো জ্বলে। পূর্ণিমা রাত্রির মায়া ছড়ায়। নদীর জল এখন অমাবস্যার রাত্রেও বহু বর্ণের আলোক প্লাবনে মুখর। আর বর্ষার দুহিনার কলরঙ্গে যে অশান্তধারায় জলস্রোত বয়, সেই ধারায় অগণিত, অসংখ্য বিভিন্ন জাতির রেজা-মজুরের আশা বন্ধ হয় না।

—হাই গ, ই কি সেমা গ? ই ছোলেকা জ্বল্যে কি ভাবে? এ কি কারবার? এই আলো জ্বলে কি করে? কৌতূহলী রেজা মজুর বিজলী আলো দেখে চোখ ওপরে তুলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছে।

কুলি-যোগানোর ঠিকাদারকে জানতে হয় বহু প্যাঁচ। প্রসন্ন হাসে, কেন, ওই যে টুনি দেখছিস না? যেমন, দেওহে রে। প্রদীপ।

—টুনি?

—হাঁ। ভালো নাম ওর, বল্ব্।

—তা সুনুমটো আসে কুথা দ্যে গ? তেল আসে কি ভাবে? বা-খেলা।

তখন উত্তরকারী দেখিয়ে দেয় তারের ধাঁধা। লোহার পোস্টের মাথায় নানান যন্ত্রাংশের জটলা। তাইতে বাঁধা হয়ে তার এসেছে

দূর-দূরান্তর হ'তে। মুখে বলে, কেন, ছুই তারে তারে তেল আসে।

বিস্মিত রেজা মজুর এবার আরো বিস্ময় মানে।—আজব কাণ্ড! পলতে লাগে না?

বাওয়া মানওয়াও অবাক হয়েছিল প্রথম দর্শনে! তারে তারে তেল যায়। কী রসের কথা রে বাবা!

লালটেন একটু কম বুঝ-বাঝ মানুষ। অথচ আগুরী কথা বলার অভ্যাস। সব দেখে-শুনে কিছু না ভেবে-চিন্তেই বলে উঠেছিল, মোরাও তবে মুলিয়ে লি লাই কেনে দু' চারটো। ঘরে গ্যে জ্বালব বেশ। কোন ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট লাই। খুটুস করে টিপ শুধু, ব্যস। সুবিধা ভারী।

এই জঙ্গল পেরিয়ে দূরের ডেরাতে-ডিহিতেও সমাচার গেছে। ডুগডুগি বাজিয়ে জানানো হয়েছে, উড়াংছত্রি, সাঁওতাল, হো, মুণ্ডারী প্রভৃতি সমুদয় আদিবাসী পাড়াতে—আরো রেজা চাই, আরো কুলি-মজুর। এবং কামছুট্ নোকরী নেহী। বাঁধা কাজের মুনিষ সব।

ভরাট মৃত্তিকার গর্ভে গর্ত করে বিষ পুরতে হবে। তারপর ঘাই সেখানে আপনি বাজবে। সহস্র সাণ্ডি জোয়ানের এক ঘাই। প্রকাণ্ড আর্তনাদে চুরচুর হয়ে বসুমতীর নিথর বুক বিদীর্ণ হবে। বাবু মানুষেরা তাকে ডিনামাইট বলবে। কিন্তু এই বনভূমির বাসিন্দা-জনেরা তাদের নিজেদের ভাষায় বুঝবে, মারাং .ইয়ের কামড়। অতঃপর শক্ত-রুক্ষ সেই ফাটলধরা পাহাড়ী ভুঁইকে গাঁইতির কোপে নাবাতে হবে সমতলের ধুলোয়। পরে, বড়ো বড়ো সেই ঢেলা পাথরের চাঙড় ট্রাক ভর্তি করে বাঁধের দুই পাড়ে সঞ্চিত করতে হবে। সুউচ্চ মাটির দেওয়াল উঠবে স্পিলওয়ে দরজার পিছন থেকে। দেওয়াল টানা চলে যাবে উত্তর-দক্ষিণে। সেই দেওয়ালই বাঁধ। বাঁধের খাড়াই ঢাল পশ্চিম তীর হতে দিগন্ত বিস্তৃত জলাশয়ের শুরু। সেদিকেও জলের চাপ খুবই প্রবল হবে। এই কারণে ঢালু

পাড় জুড়ে পাথর সাজানো থাকবে থরে থরে। আরও কারণ, বৃষ্টির তোড়ে একাধারে যেমন বাঁধের মাটি কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে না, পাশে ওজন চড়ানো থাকলে ভারী গাড়ির চাপে রাস্তা বসে যাবারও কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

মেয়ে-পুরুষের বাঁটোয়ারা কাজ। সেই গুনতি দরও বাঁধা। এক রোজ কাজের মজুরী আট আনা। আর পুরুষের বেলায় তা বাড়তি আরো এক সিকি। নানান দলে মজুর-মজুরান রাত্রিদিন খাটছে বিভিন্ন কাজে। তবু কাজের যেন ফুরান নেই। অব্যাহত ধারায় মানুষের আগমনকে, তাই ভাবলে, একটা রেখার মতন মনে হয়। লাল মাটির সান্ধ্য আকাশে নিত্যদিন বলাকা গমনের যে রশি আঁকা পড়ে।

মিশিরনাথের ধাওড়ায় ভিড় জমাট হয়। মিশির তাদের বুড়ো আঙুলের ডগায় কালি মাখিয়ে টিপ নেয় খাতায়। পরে, গোল একটা টিনের চাক্তি প্রত্যেকের হাতে দিয়ে বলে, যা তোর কাম হয়ে গেল। এই হাজিরা চাকী যত্ন করে রাখ্। কাজে আনবার সময় ফি-রোজ নিয়ে এসে জমা দিবি আমার কাছে। কাম শেষে সাম্-বেলায় ফির্ ইয়াদ করে নিয়ে যাবি। তবে বহাল।

মুখ হাসি-হাসি হয়েছে সবার। কত সব মজার মজার ব্যাপার দেখো, শোহুরে কিতুরায়ে যার নাম। শহুরে কেতা। এক টুকরো টিনের কী অপরিসীম মূল্য। তাদের হাজিরা জানাবে। এবং সপ্তাহ শেষে মিলিয়ে দেবে হিন্থচান তুল্কা। প্রাপ্য ন্যায্য টাকা। বিমূঢ় বিস্ময়ে তখন তারা বার বার সেই টিনের চাক্তিটা উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকে। পরে, সযত্ন প্রয়াসে সেই চাক্তিটাকে গেঁজের মধ্যে বেঁধে ফেলে। তারপর ওপর থেকে সন্তর্পণে টিপে টিপে দেখে, যথেষ্ট সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে কিনা।

লালটেন কেবল তার স্বভাবমতো কথা বলে উঠেছিল। মিশিরের কাজ কারবার দেখে কি বুঝি মনে পড়ে গেছে, বলেছে, হাই যি গ,

ই যে দেখি বাঁড়িয়াদের মতুনই সেমা। টিপ্‌ লিছিস! তা দাদনও দিবি লিকিন? খুব ভালাই হয় তবে।

সকলে হেসেছে। দূর গাধ্‌হা।

তখন সে-ও হেসেছিল বোকার মতো। কিছু বিশেষ বোঝাবুঝির মধ্যে থাকে না লালটেন, সকলকে হাসতে দেখলে তারও হাসি পায়।

এই সেই মানুষেরা, যাদের নিয়ে এতদিন বাঁধ গড়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যূহ রচনার পরিকল্পনা নিয়েছিল মুরুব্বি। দিনরাত্রি চেঁচিয়ে পাড়া-ঘর মাত করেছে।

রূপবুনিয়ার কুঁড়ি ইল্‌কার ঘাম-তেলে পদ্মপলাশ মুখে মদির হাসি। কপালে কাঁচপোকার টিপ জ্বলে ঝকমকিয়ে। হাতে জল-চুড়ি, গলায় রুপোর হাঁসুলী, পায়ে মল বাজে ঝমঝম। সাঙি জোয়ান মরদের ভাবনা অমনি দূর-দেশান্তরে ছড়িয়ে যায়।

ডমরুর হাঁকাহাঁকি থামে নি।

তার আকস্মিক ক্রুদ্ধ আস্ফালনে ঝুলন্ত আকাশ যেন চকিত পদক্ষেপে নেমে পড়ে শূন্য থেকে মাটিতে। ক্রমেই প্রতিবাদী দল ছোট থেকে ছোটতর হয়ে আসছে। ডমরুর পিছনে মদত্‌ দাতার সংখ্যাতেও ঘাটা লক্ষণীয়। মাথা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। আর দল যত ছোট হয়, গুনতিতে মাথা যত কম পড়ে— মুরুব্বির পাগলামিও ততোই বেড়ে চলে। ডুগডুগি বাজনা শুনলেই এখন খ্যাপা জানোয়ারের মতো সেদিক পানে ধেয়ে যায়। এবং এক প্রলয়ঙ্কর লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তোলে। ঢেঁড়া পিটোতে আসা মানুষটাকে আঁচড়ে-খাম্‌চে ক্ষত-বিক্ষত করে নাকানি-চোবানির এক শেষ করে ছাড়ে।

ডমরু চেঁচায়, শালো, ইটো রেণ্ডি-ঘর পেছিস? কসবী-খান্‌কি-

ছিনাল পাড়া? এসে ফুসলায়ে যাবি সবারে। লোভের আগ্ দিখাস।

নাজেহাল মানুষটা দারুণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড়ের পথ খোঁজে। কিন্তু মুরুব্বি তখন সহজে ছাড়বে না তাকে। সমানে গজরাবে আর তেড়ে-তেড়ে যাবে।—একরোজ তুয়ারে খতম করব, দেখি শালো, কোন্ আপুং (বাবা) সিদিন বাঁচায়। দু'টুকরা কর্যা কাট্যে যদি উ গাড়ার পানিতে ভাসায়ে দিতে না পারি, ত মো শালো এতদিন বাওয়া পা গুতের মুরুব্বিগিরি করি লাই। ডমরু লয় মোর নাম, সেতার বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা।

আবার কোন সময়ে সরোষে দৌড়ে আসে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কোন শাসানি, তড়পানি নেই। আরেক বিচিত্র চেহারা। এসেই হাঁটু দুমড়ে ভুঁইয়ের ওপর বসে পড়ে ছলছলে চোখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বাদকের হাত ধরে বলে ওঠে, হাঁ-রি হপন, তুয়ার ঘরে মা লাই? আয়ু কারে বলে জানিস লাই? বেটা হয়্যা মা-র উপর অত্যাচার করবি গ?

হপন্ হল ছেলে। ডমরু স্নেহভরে আরো নানা মিনতি করে যায়। যাতে এই কাজ সে অবিলম্বে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু তাইতে ফল কিছুই হয় না। রেজা মানুষের আগমনেও ভাটা পড়ে না এতটুকু। বন-জঙ্গল কাটাকাটি, রিভার বেডের কাজ, বাঁধের দেওয়াল গাঁথা—সবই চলতে থাকে পরিকল্পনা মতো। রাত্রি হলেই ডিনামাইটে পাথর ফাটানোর আওয়াজ ওঠে। গুমগুম শব্দে এপার-ওপার মন্দ্রিত হতে থাকে। সঙ্গে বেলাজ মেয়ের হাসি, মাতাল পুরুষের হাঁকডাক, রেজাকুলির সাবধান বাণী উচ্চারণ, সব আছে।

আর, জাদান মানুষ কাউকে যদি দেখে কাজে চলেছে, প্রথমে একইমতো ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ঘাড়ের ওপর।—শালো বাইরী পেড়া, ঘরের শত্রু, কামে যাওয়া হচ্ছে, আঁ? আর কাম মিলল

লাই গ হাঁদে? আয় কেনে বুছায়ে দিই, তুল্‌কা কামাইয়ের ফুর্তি কারে বলে?

প্রতিপক্ষ শক্ত হলে, তখন ডমরুর যা স্বভাব, ছুটে এসে ধুপ করে তার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে আবিল কান্নায় নাকমুখ ভাসায়। পরে মিনমিন করে আকুতি মাখা স্বরে শুরু করে, তুই লাই এল্লাবঙ্গার নামে কসম খেয়্যাছিলিস? ইয়াদ রাখিস কোড়া, ক্বাইইঃ-রে কুনদিন মাফি করে লাই বঙ্গা। পাপীকে কখনো ক্ষমা করে না। অন্যায় করলে দেবতার রাগি গিড়বেক তুয়ার উপর, তুয়ার রাখের গায়ে। বংশের ওপরে।

ডমরুর মুখের এইসব কথা অবশ্যই এখনো কিছু বয়স্ক দেহাতী জাদান সন্তানের মনে দাগ কাটবে। ডমরু গলায় যে বিশেষ ধারটা নাচে, সেটা শাশ্বত বাওয়া মুরুব্বির কণ্ঠের উত্তাপ। ডাকের এই আওয়াজের জন্যই হয়তো বাওয়া জীবনে মুরুব্বির প্রতিষ্ঠা অত উঁচুতে। তার মুখের প্রতিটা কথাকে মনে হয়, অমোঘ, চূড়ান্ত। তবে আজ যে আয়েক তুল্‌কি নাচন উঠেছে বন্দেশী গাঁয়ের মানওয়ার অন্তরে, যার কাছে পুরোনো বোধের বহু কিছুই ভেসে যাওয়ার কথা। এবং যেতে বসেছেও বুঝি।

এখন নীলবান গাঁয়ের হরঝুক ছোঁড়া-চিংড়ির মনে নানান রঙীন স্বপ্নের গুনগুনানি। দেহাতী মনের পরতে অনুক্ষণ অদৃশ্য ঝুমঝুমি বাজনা বাজছে টক্‌টক্‌ করে। এতদিনে যেন কাজের মতো কাজ জুটেছে সবার। মহাজনদের কাছে আর ইজ্জত-ধরম বেচতে হবে না পেটের জন্য। গুণিন একদা যে মন্ত্রগুপ্তির রহস্য বাতলে ছিল। শুনে অনেকের মনই সেদিন মৃতের চোখের মতো ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গিয়েছিল। আজ সে ভুল ভেঙে, সেখানে পাখপাখালির রঙ ছড়িয়ে গহিন গাঙের টান বেজেছে। চোখে খুশিয়ান চাউনি চলকে পড়ে। আর সেই নিয়মেই দলের ছোট হওয়া। জমায়েত পাত্‌লা হয়ে আসছে।

ওদিকে সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে ক্রমেই কেমন এক খ্যাপাটে চেহারা ধরতে থাকে মুরুব্বি। সর্বক্ষণ চক্ষু যেন তার ঘুরছেই বনবনিয়ে। হিংসায় কুটিল কুঞ্চিত সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। ভাবখানা, প্রতিজ্ঞা মতো একবার বাগে পেলে হয়। রাত্রিদিন কোম্পানী কুঠির আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরে। চেনা মুখের প্রত্যাশায়। কে কে নাম লেখালো, বাঁধ রেকার কাজে। এবং শেষে যদি সত্যি সত্যি কাউকে কব্জায় পেয়ে গেল, পিছন থেকে এসে ঝুপুত করে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। কিল-চড়-ঘুষি, যা হাতে ওঠে। তারপর শক্ত মুঠিতে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে গলা টিপে ধরে অপ্রস্তুত সেই লোকের। মুখে অশ্রাব্য খপিস গালাগালি চলে, শালো, লগ্‌দা তুল্‌কা কামাইয়ের শখ্‌? আজ শেষ গ তুয়ার। হেঁ-হেঁ।

কাছে-পিঠে মানুষজন থাকলে দৌড়ে এসে মুক্ত করে তাকে। নয়তো, সেই মানুষকেই বাওয়া কানুন ভুলে লড়তে হয় আপন প্রাণের তাগিদে। শেষে যখন তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় বাওয়া জোয়ান, এই ডমরুই হঠাৎ আরেক মানুষ হয়ে যায়। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে শিশুর মতো। একটু আগেও ঘরবাসী একজনের কাছে যে রীতি-বহির্ভূত আচরণ পেয়েছে, তা-ও যেন আর কিছু নয়। হাউহাউ করে কাঁদে আর বলে, তুয়াদির আর কুছ্‌ কব লাই রে কুকোস (ছোকরা)। ধরমের ডর লাই তুয়াদির। পাপের ডর লাই। বঙ্গার কসম খেয়ে তা পর্যন্ত ভুল্‌লি। হা-রে! তুল্‌কার লেল্‌হা, টাকার লোভ।

হাজার হোক, সে ছেলেও বাওয়া মরদই হবে। ফলে, রক্ত এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়। তবে এক্ষেত্রে শুধু মাত্র রেহাই দেয়, মুরুব্বি বলেই। পঙ্গু বাউরা মানুষ!

ডমরু আজ নিতান্তই করুণার পাত্র। পঙ্গু পাচ্‌গি। রুগ্ন মোড়ল।

মুরুব্বি এর পর সরে যায়। কিন্তু পূর্বাপর শাসাতে ছাড়ে না।

বিড়বিড় করে বলে, আর আঙুল নাচায়, সব রইল রে তোলা, ভুলব লাই কুছ্। দিন ফিরলে, সিদিন বুঝবি। হুঁ, দেখ্যা লিব এক কিস্তি।

সেদিন আর আসবে না জেনেই হয়তো হাসে বনরাজ্যের উঠতি বয়েসের সাণ্ডি জোয়ানরা। এবং সেই সঙ্গে চিংড়ি মেয়ের দল।

দিন পালটাচ্ছে। লালকুঁয়োর বসতি পাখির কণ্ঠে যে গান।— পিল্ক্ না, না-না-না, পিল্ক্ না-না। তা-ই সত্যি হবে।

বললে আরো যে কথা হয়, গুণিন নাকি গণনাতেও পেয়েছে এই সংবাদ। নাওয়া দিন আসছে ছুনিয়ায়। নতুন লগ্নক্ষণ। কাজেই এ-কালের সমুদয় হিসাব-নিকাশ পালটাবে। মারে রীত-নীত, পুরাতন যত কিছু রীতিনীতি। সুতরাং জাদান মানুষ আর ভয় পাবে কেন ওই কথায়? মুরুব্বির অকারণ আস্ফালনকে তোয়াক্কা করবে কেন?

কিছুদিন আগেও এই মানুষেরা 'বিজেৎ' হওয়ার নামে কাঁটা হয়ে থাকত। আদিবাসী সমাজে ওর চেয়ে ভয়ংকর আর কোন ব্যবস্থা নেই। দূরবর্তী অঞ্চলের দশ-বিশটা গাঁয়ের মানুষও সেই ফতোয়া শ্রবণে কম্পিত হত। তুড়ুক চাষীদের মতো গলার তকৃতি চেপে ধরে সুর করে বিলাপের ঢঙে বাওয়ারা বলবে, তক্দীরে দারকান্ ঠেল্। অর্থাৎ, হাটে-বাজারে কেউ তখন তাকে তেল-লবণ বেঁচবে না। আত্মীয়-কুটুম্ব এগিয়ে দেবে না এক সুনাঙ্গ হাড়িয়া। তার ফসল তরি-তরকারী পর্যন্ত কেউ কিনবে না। এমন কি, কপাল মন্দ হলে, মনের মানুষটাও অচিন হয়ে যাবে।

সেদিন পঞ্চায়েত শেষে ঘরে ফেরবার পথে অন্ধকারে অনেকে জোড়া-জোড়া হয়েছিল।

বাজে অজুহাতে দ্বৈরথ-সমর, তর্ক-বিতর্ক, হৈ-হুজ্জতিতে আসর

ভেস্তে গেছে। মূল কথা ছেড়ে, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা কেবল। সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড-কারখানা। বিরক্ত অনেক জোয়ান ছেলে পঞ্চায়েত চলাকালীনই উঠে পড়েছিল। বুড়োদের এইসব কথাবার্তা তাদের ভালো লাগে না। যেদিনে বাধা দিলে কাজ হত, বাঁড়িয়া মহাজনদের আগমনের প্রথম বেলায়—সেদিনই কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা হল না। উল্‌টে বরং মেহমানের দোহাই পেড়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল তাদের। আজ যখন আর কোন রাস্তা খোলা নেই জাদান সন্তানের সম্মুখে, অযথা বাক্যব্যয় করে কী লাভ? যা আসবেই, তাকে আটকানো যাবে কোন্ উপায়ে? যে কারণে লক্ষ্য হয়, মিশিরনাথের চবুতরায় নিত্যি ভিড় বেড়ে চলেছে। আগে আসছিল, বিহারী রেজা কুলির পাল। এখন প্রত্যহ দু'টি-চারটি করে আদিবাসী সকল সমাজের মানুষই ক্রমে ক্রমে গিয়ে নাম লিখিয়ে হাজিরা চাকী নিয়ে যাচ্ছে। এবং বাঁধ রেকার কাজে পরদিন থেকে জুতে পড়ছে। বাওয়ারাও অনেকে ভিড়ে গেছে ইতিমধ্যে। অর্থাৎ, ছপ্‌টি বাতাসের তাড়া একবার ঘুরেছে যে পথে, আর তার ফেরা নেই।

হাসনা হঠাৎ ফিসফিসিয়ে ডেকে বলেছিল তাকে, যেন কথাটা নিতান্তই গোপনে বলার মতো।—মোভি একরোজ ভিড়্যা যাবো, ভাবি। হঁ।

সামনে অসীম রাত্রি, মহাকাশ আর মাঠ-ঘর, সব একাকার হয়ে আছে মেটে জ্যোৎস্নায়। দূর-দুর্গম গাছ-গাছালির ডালপালা দুলছে বুনো হাওয়ার তাড়সে। ঝম ঝম শব্দ হচ্ছে।

যার উদ্দেশে কথাটা বলেছিল হাসনা, শোনা মাত্র তার চলন থেমে গেল। বিস্ফারিত চোখে একটুক্ষণ দেখল তার মুখের দিকে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল, কুথাকে ভিড়বি, অঁা?

হাসনা প্রথম কয়েক মুহূর্ত কোন উত্তর করলে না। পরে কেমন

যেন পলকা হেসে উঠল। মনের অবুঝ ভয়টাকে সে যেন গলা টিপে মারতে চাইল ওই হাসির তাড়ায়। অতঃপর নিষ্প্রভ উদাস গলায় বললে, কুথাকে আবার, জানিস লাই লিকিন?

সে বিরক্তি প্রকাশ করলে, বলবি ত জলদি-জলদি। কী তামাশা হছে, মো বঙ্গা লিকিন, মনের সব কিস্‌সা আগে-ভাগেই বুঝে যাব। হাই, মজা গ।

তখন অতি মন্থর লয়ে, অনেক সময় নিয়ে, হাসনা একসময় জানালে, ভিড়তে চায় অন্য কোথাও নয়, অন্য কিছুতে নয়, বেড় বাঁধের পাকা কাজের নোকরীতে। হাসনার গলা শেষ দিকে দুর্বোধ্য এক আবেগে বুজে আসে। স্বরেতেও লাগে ঝড়ো জলের স্পর্শ। মাথা ঝুলে পড়ে নিচের দিকে। তখন সঙ্গিনী বাওয়ানী মেয়ের মনও সহসা কেমন উদাস ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। 'আই আই' বলে ভীত কোন ডাক ছাড়া নয়, অথবা উৎকণ্ঠিত চিৎকারে কোন সোর-গোল তোলা। কিন্তু এমন একটা বিমূঢ় ভাব করলে—পাশের সাঙ্গি মরদ মানুষটা আরো কেমন মুষড়ে গেল। সে ওর হাত টেনে এনে খোঁচালে, আঙুল টানলে, গা ঘেঁষে বসে কনুই দিয়ে গুঁতোলে এখানে ওখানে, তারপরও অনেক সময় ধরে বাওয়া জোয়ান বাক্যস্ফুট করলে না। একদিন সে-ই ছিল টিক্রু মতের অন্যতম নায়ক। বরাবর বাঁড়িয়া মহাজনদের বিষ নজরে দেখে এসেছে। তারপর আজ ক'মাস হল ডমরু পন্থী হিসেবে চলছিল। যেটুকু অবশেষ আছে বাওয়া জাতের, তা যেন আর নতুন করে খোয়া না যায়। কিন্তু শেষ অবধি সে দৃঢ়তাটুকু বুঝি আর থাকে না। ক্রমেই বিশ্বাসের রাজ্যে কেমন একটা আলুথালু ডাকানি উঠছে, যে দোলায় কেবলই নানা বিরুদ্ধ ভাবনা মনে আসন পাতছে। মনে হচ্ছে, এ নোকরীর সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই। আর মুরুব্বির বহু সতর্ক করা বাণী, নিতান্তই কথার কথা। কোন ফল ওইতে আর দর্শাবে না। অথবা ফল দর্শানোর দিন পার হয়ে গেছে। হাসনা

দেখল, বর্ষা-শেষে দুহিনায় জলের যে রঙ হয়, বাওয়ানী ঝুমকোর মুখের রঙ এখন তাই। কাঁচ কাঁচ বর্ণের।

তারা এসে অতঃপর নদীর নির্জন ঢালে ঝুপসি জঙ্গল মতো একটা স্থানে বসেছিল। পিছনে পাঁইসার, পন্নন, গামহারের বন। কেঁদ গাছ আছে বুঝি নিকটে কোথাও, ফল পেকেছে—মিষ্টি সোঁদা গন্ধ আসছে তার।

শেষে গুটি গুটি হামায় রোজকার বিষণ্ণ ভাবনাটা যখন দু'জনের মনেই একত্রে গুঞ্জন তুলেছে, হুতোশে বাওয়ানী মেয়ে কঁকিয়ে শুধিয়েছে, জানতে চেয়েছে, এইভাবে আর কতদিন চলবে, তিস মাহা? বাওয়া জোয়ানের মনে দ্বন্দ্বমান নতুন সিদ্ধান্তটা তখন চকিতেই এক বিশেষ স্থিরতা পায়। সেইক্ষণে কেবলই মনে হতে থাকে, সংস্কারের এই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে, কোনদিনই বাসনা মতো তাদের মিলন সম্ভব হবে না। আর সংস্কার যদি ভাঙতে হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তা ভাঙতে হবে। মানুষ বৃদ্ধ হলে, মরেই। বাওয়া খারোয়াও (সমাজ) আজ বুঝি বয়েসের ভারে অতি ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। সুতরাং মৃত্যু তার রোধ হবার না কিছুতেই। বাইরের মানুষজন কম আসে নি বাঁধ রেকার কাজে। আর মানুষ যখন, ধর্মও সকলের কিছু একটা নিশ্চয় আছে। দেকোপুসী অথবা তুড়ুক-মুণ্ডা, যাই হোক। সকলেই যখন সহজ অন্তরে নিতে পারল এই কাজকে, এবং অদ্যাবধি কারো কোন অমঙ্গল ঘটল না, তখন অযথা তারা আর হট্টগোল সৃষ্টি করে নিজেদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে কেন? মধ্যে থেকে ঘাটা যা হচ্ছে তাদেরই। তাদের জেরাত-গাঁওয়ে বসে তুল্‌কা কামায় ভিন্‌-পারসী সবাই, আর তাদের অদৃষ্টে শূন্য ঠিলি (কলসী) তোলা থাকে।

এক্ষণে বাওয়ানী সঙ্গিনীর কি দুর্বুদ্ধি চাপল, হেসে উঠল কলকল ছন্দে। তারপর বললে, তবে যে এত্ত রোজ বুলছিলি, ই কাম লিতে লাই গ। পাপ হবেক। ধরম যাবেক।

হাসনা চুপ।

পাশের গলা আবারো ঠারলো, হাই মদ্দ, চুপো কেনে? জবাব ছে গ।

এবারে হাসনা ফস্ করে চটে উঠে এক ঝাটকায় মাথা নাড়ায়। —বেশ তবে লিব লাই উ কাম।

তখন সঙ্গিনী মেয়ে আরো তরল গলায় হেসে বললে, অল্পেতেই গোসা পাচ্গির (মাতব্বর)। বলে রসিকতা করলে। এবার হাসনাও ফিক্ করে হেসে ফেলে তার হাসিতে যোগ দিল।

—রাগালে রাগি হবেক লাই।

—হুঁ, হবে। কপট ঝামটালো সঙ্গিনী বাওয়ানী কুঁড়ি।

পাশের মুখর কণ্ঠ গলা নামিয়ে ছক্ ছক্ করে পরে এক অদ্ভুত প্রস্তাব গাইলে, চল্ কেনে, লিয়া লি উ নোকরী।

খানিক আগেই গাওয়া হাসনার প্রস্তাবনায় বাওয়ানী মেয়ে কিছুমাত্র শিহরিত হয় নি, যদিও কিছুটা বিমূঢ় হয়ে-বা হয়েছিল, এখন হাসনাও কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে না। এখন স্বভাবতই প্রথম বিস্ময়ের চমকটা অনেক কেটে গেছে জাদান মানওয়ার চোখে। আর সেই সঙ্গে নেপথ্য ইচ্ছাটা সকল অন্তরেই পাখনা মেলেছে—পুরুষ কিংবা মেয়ে। বাঁধ রেকায় কাজে লাগলে সপ্তাহ শেষে নগদ তুল্কা মিলবে হাতে। তারপর নির্জন নিরালায় দুই প্রাগৈতিহাসিক সত্তা ছুটবে, পিয়াস নিখারের জন্য। অর্থাৎ, যে তৃষ্ণা গলার নয়, মনের।

হাসনা চুপ। লাছলীও সম্ভবত কিছু ভাবল। সন্ধ্যারাত্রির আপাত নিঃশব্দতার লয়ে উভয়ের বুকেই বুঝি কিছুর ঢিপঢিপুনি আওয়াজ হল। দুজনের কণ্ঠই তখন সহসা আরো বন্ধবাক্ হয়ে পড়ে। চুপচাপ এ মিলন পাড়া ঘরের রীতি অনুযায়ী ঠিক আইনানুগ নয়। লাছলী সাকমলের বউ, বাওসী মাওকি। হাসনা ভিন্ন ঘরের জোয়ান ছেলে। হাসনা সঙ্গিনী বাওয়ানী মেয়েকে

মাথায় হাত পাতলে। সান্ত্বনা দিল, ন রো। কাঁদিস নে। তবু তার কান্না বন্ধ হল না।

তারপর যেদিন তারা প্রথম কুঠিমাঠে গিয়ে দাঁড়াল, হাসনা প্রায় উপস্থিত হওয়া মাত্র গণ্ডগোল বাধালে। কোম্পানীর চবুতরায় উঠেই মিশিরনাথকে ভরাট গলায় হুমকে বলেছে, কই, দে কাম। এসেছি।

মিশিরনাথ কি বুঝি লেখালেখি করছিল। ঠিক শুনতে পায় না। চোখ তুলেছে।

হাসনা আবার ঝাপটে বললে, বল্ পহেলা কি করতে হবে। করব কাম, বাঁধ রেকার।

কোম্পানীর হাজিরাবাবু। রেজা কুলি-কামিনদের কাছে সে সেরমা বঙ্গা। ঈশ্বর। রেয়াতী কান. সকলের সম্মান নিতে অভ্যস্ত। কণ্ঠস্বরটা বড়ো কঠিন হয়ে বিঁধল সেখানে। চক্ষু পাকিয়ে মিশিরনাথ তখন দাবড়ি দিল, কে রে, তুই হারামজাদা। এত চোটপাট করিস? উঠলে কিন্তু একটা কান ছিঁড়ে নেব।

দাওয়ায় অনেক লোকের ভিড়। জনতা উচ্চকিত স্বরে হাসল।

ওদিকে হাসনাও যেন তৈরী ছিল। অবজ্ঞার হাসি হেসে টপাস করে জবাব দিলে, হাই বাপ, চিনিস লাই মোরে। তুয়াদির যম।

মিশির কুঁদলো. তা এখানে কেন, তোর জায়গা তো তাহলে নরকে ঠিক আছে, সেই গর্দায় যা না।

সুত্রপাত হয়ে গেল।

তারপর দু'জন দু'জনার বাক্য কাটে উত্তপ্ত গলায়।

শেষে যখন হাসনার কথার পিঠে নিতান্ত অবহেলার ভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভরা হেসে উঠে মিশিরনাথ বলেছে, রম্‌তা যোগী, চাউলকা বোলতা হ্যায় প্রসাদ। তখন সত্যি যেন আর রাগ সামলাতে পারল না হাসনা। দাঁতে দাঁত পিষে কিড়কিড় শব্দ করল প্রথমে। বুনো পশুর জাত বাওয়া মরদকে খুঁচিয়ে বিঁধোনোর

চেষ্টা। তারপর তীব্র এক ফোঁসানিতে ফেটে পড়ে বললে, চিনে রাখ, বাওয়া বিইং মো। বলে হাত মুঠো পাকালো এবং ক্রূর হাসল সেই সঙ্গে।

মিশিরও অদমিত। বললে, হাঁ হাঁ। তোর গায়ের ডোরা দেখেই বুঝেছি। ঢ্যামন সাপ।

—দাঁড়াসের ল্যাজের ঝাপট ত খাস লাই? হাসনা আবারো তিক্ত হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে। বলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সামনে। তারপর ফের বললে, প্রথম দিনটোয় আর মাত্ করতে চেছি না। চোকাঁড়ে (তর্ক-বিতর্ক) ছাড়। তাড়াতাড়ি হাজিরা-চাকীটো দিয়্যা ছে বাপ্, চল্যে চাই।

তার হেক্কাইয়ে হপ্তা মেলে রেজা মজুরের। সুতরাং সে-ই বা এত সহজে ভড়কাবে কেন? খেঁকিয়ে বললে, যেন হাসনার তড়পানির উচিত জবাব দিচ্ছে।—আর যদি লাই মিলে? সঙ্গে হুমকি আস্ফালন দেখাল, লাটের বাট্ লিকিন তু? লট্‌কা চড়াবি? ফাঁসি দিবি?

এরপর নির্ঘাত রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাওয়ার কথা। হাসনা এমনিতেই টিক্রুর মতো কিছু অতিরিক্ত রগচটা। তারপর মিশির ও তার ম্যানেজার সাহেবের কুকীর্তি ইতিমধ্যেই চাউর হয়ে পড়েছে সর্বত্র। স্বতঃই সে বাবদে একটা ক্রুদ্ধ বিদ্বেষ থাকবে। বিশেষ, সাঁওতাল জোয়ান কুলে। যে ভয় তারা পেয়েছিল, সন্দেহ-আশঙ্কা সিঁটিয়ে ছিল—তাই বুঝি সত্য হতে চলেছে। নানাবিধ জিনিস, তুলকার প্রলোভন দেখিয়ে বাঁড়িয়া মহাজনদের মতোই ঘরবাসী মেয়ে-বউকে রাতের ফুর্তির বিছানায় বলি হবার জন্য আহ্বান জানায়।

লাছলী এতক্ষণ চবুতরার এক কোণে ধূসর আবছায়ায় আড়াল মতো একটা স্থানে দাঁড়িয়েছিল। এবার ধাঁ করে বেরিয়ে এসে হাসনার একটা হাত পিছন দিক থেকে খপাৎ করে চেপে ধরে। বাওয়া জোয়ানকে বিশ্বাস নেই। তারপর হাসনার মতো সাঁওতাল

ছেলে। ক্রোধে এরই মধ্যে আরক্ত হয়ে উঠেছে তার মুখ চোখ। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। গলায় ঘরঘরে একটা অদ্ভুত শব্দ। অর্থাৎ, যে কোন মুহূর্তে হাজিরাবাবুকে তাক্ করে লাফিয়ে পড়তে পারে সে।

মিশির কেমন যেন ঊর্ধ্ব-চক্ষু হল। থমকে থেমে রইল।

লাছলী হাত টানলো হাসনার।

এই সময় নতুন কিছু মানুষের আগমন ঘটল সেখানে।

যদিও তারা এসেছিল অন্য কারণে, তবু বুঝতে হবে মিশিরেরই লোক. মিশির তাদের পেয়ে হাসির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিল। আর ঘন ঘন তাকাতে থাকল লাছলীর দিকে। যেন হাসনা নামের মানুষটাই আর সামনে নেই। শেষে তার উদ্দেশেই একসময় বলে উঠল, কাম চাস তো তোরা? যা, কাম হয়ে গেল। কাল থেকেই লেগে যেতে পারবি। বলে রসে চটচটে ঠোঁটের পাতা বার কয়েক জিহ্বা বুলিয়ে চাটল।

হাসনা যদি এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, লাছলীর চরম অস্বস্তি। সে দেখলো, হাসনা ক্রমেই আরো বন্য হয়ে উঠছে। হাত-কব্জির শিরা পাক্ খেয়ে ফুলে উঠেছে মোটা দড়ির মতো। দাঁত কিড়মিড় করছে আর চোয়াল বাঁকাচ্ছে।

দাওয়ার টুনি আলোয় মুখ তার অতি স্পষ্ট। মেঘের রঙ দেখে ঝরণ কতখানি হবে, বুঝতে পারে জাদান সন্তান। হাসনার থমথমে মুখভাব দেখে বুঝতে দেরি হয় না লাছলীর, ঝড়ের ডাকানি তার শুরু হয়ে গেছে। অঘটনটা বুঝি এই মুহূর্তে ঘটেই যায়।

মিশির হঠাৎ কি ভেবে খ্যালখেলিয়ে নাকে হেসে হাসনাকে ডাকল এবারে, আরে, একেবারে সত্যি সত্যি খেপে গেলি দেখি মর্দ। চুপ করে বোস্। হুজ্জত পাকাস না। এখুনি তোদের নাম খাতায় তুলে নিচ্ছি। বলে লোভার্ত চোখে লাছলীর দিকে তাকালো।

বাঁড়িয়া মহাজনদের আমলেও এতদূর কখনো ধৈর্য ধরে নি বাওয়া পুরুষ। চকচকে কোপাই সর্বদাই সঙ্গে থাকে, আর মেয়ে হলে খুনিয়া, এতক্ষণে কবে ঝলসে উঠত সেই অস্ত্রের ফলা। তুল্‌কার ছায়া আজ এমনই সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় গিলে বসেছে তাদের সমগ্র সত্তা—বাওয়া জোয়ানরা তাই তো বলে, আর বুড়োদের দোষারোপ করে, সিদিন আসতে দিছিলি কেনে উয়াদির। উয়ারা হল, মহাজনরা। যার ফলে আজ তাদের কিদরাটাই আসলে জখম হয়ে গেছে। রুখে দাঁড়াবে, সে জোর আর নেই।

মিশির আবারো নাকে হাসল। তারপর একচোখ বুজে হাসনাকে রহস্য করলে, কে হয় রে তোর, ও? জরু নাকি, হাঁ? একটু থেমে পরে নিজের মন্তব্য রাখল, খাসা চীজ! বলে ঠোঁটটা আরেকবার চেটে কলে নিল।

শরীরের কাঁপুনিতে হাসনার গলা পুনরায় গরগর করে উঠল। সে ওই কথার কোন জবাব না দিয়ে শাসিয়ে কেবল বললে, মো বাওয়া হাসনা। তুয়াদির যম। ইয়াদ রাখিস।

মিশির একই মতো গলা চড়িয়ে হেসে ডাকলে, তা তোর ডোরা দেখেই চিনেছি। ঢ্যামন সাপ।

—দাঁড়াসের ল্যাজের ঝাপট ত খাস লাই কুনদিন।

—হাঁ, মরার লাথির মতন জোর তাইতে, জানি।

পাছে শেষ পর্যন্ত গণ্ডগোল একটা না বেধেই যায়, মাঝে পড়ে কিছু বিহারী রেজা-মজুর আর সেই আগন্তুকের দলটা তাড়াতাড়ি বিরোধ মিটিয়ে দিতে চাইল। তারা একদল মিশিরনাথকে চুপ করতে অনুরোধ করল। আরেক দল হাসনাকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরের পথে নিয়ে চলল।

হাসনা গজরালো, মোর হাজরা-চাকী? তারাই মিশিরনাথের হয়ে কথা দিলে, নোকরী তার হয়ে গেছে। আগামীকাল সকাল

থেকে এলেই হবে, কোন অসুবিধা নেই। আর ওই সময়েই যা কিছু প্রাপ্য, মিলবে তার।

সামান্য কারণেই বাওয়ানী মেয়ের অঙ্গে খুশিয়ান চলকা সাড়া নাচে। সে তখন হেসে হাসনার হাত ধরে টানল। আজ কতদিন ধরে রাত্রিদিন যা চলেছে সমগ্র বাওয়া পাড়া জুড়ে, আর ভালো লাগে না এই ঝগড়া-বিসম্বাদ। মুরুব্বি চেঁচাচ্ছে, সাণ্ডি জোয়ান ছোকরারা কুঁদছে, এ ওর দোষ ধরছে, এক অসহনীয় অবস্থা। সে তাড়াতাড়ি হাসনাকে নিয়ে বাইরের পথে হাঁটা ধরল। যাওয়ার পথে তার কোমর পাছা দুলল। পিঠের দুই পাশ, এবং চুড়ো করে বাঁধা চুল সমেত মাথা, বেঁকল এদিক-ওদিক।

আর সেই ভঙ্গিমা দর্শনে মিশিরের সে কি ফুর্তির চোট। হাসির ধুম ফেলে দেয় সমগ্র কুঠিবাড়ি কাঁপিয়ে। লাছলী হাসনাকে আর পিছন ফিরতে দিল না। তারা অদূরের একটা ঢালের বাঁকে নেমে পড়ল।

শুতে গিয়ে লক্ষ্য পড়েছে, দু'চোখে অমনি ধিকিধিকি আগুন জ্বলে ওঠে সুধনার। সহসা চাকত একটা গোমসানিব আবেগ জাগে মনে। নিঃশ্বাসটা চেপে আসে। ক্রমেই দিশাহারা ভাবের উদয় হয়। অতঃপর চোখ জ্বালা করে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠতে চায়। শত হলেও মাসুন তার মায়জু। বউ।

মাসুন নিঃসাড়ে শুয়ে আছে। চিকের বেড়ার ফাঁক গলে আসা সরু নরম জ্যোৎস্নার ফালিতে ঘরের অনেকখানি স্থানই পরিষ্কার দৃশ্যমান হয়। সেই আলোতে নজর চলে, বিস্রস্ত কাপড়ে-চোপড়ে মাসুন নিঝুম পড়ে আছে। মাসুন পাচ্চো (বুড়ী) মেয়েমানুষ নয়, ভরা বয়েসের বাওয়ানী বাওসী মাগিক। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার শরীরে কোন চটক নেই। বুক-পিঠ এক হয়ে লেপে-যাওয়া রসকষহীন

ছিবড়ে-সার একটুখানি চেহারা। হাত-পা-কপালে শিরাগুলো যেন বুড়ো বটের শিকড় নামিয়েছে।

স্বভাবতই সুধ্‌নার হৃদয় ভারাক্রান্ত হবে। অসুস্থ মায়জু সারা দিনমানই শুয়ে থাকে। হাঁ করে ঘুমোয় মাস্নুন। ঠোঁটের গালচে বেয়ে লালা গড়ায়। বাওয়ানী মেয়ে বর্ষার গহিন দরিয়া, সেখানে মাস্নুন যেন স্রোতহীন মজা পুখ্‌রী। সেদিকে যতবার নজর পড়ে, নতুন করে মন খারাপ হয়ে যায় সুধ্‌নার। মাস্নুনের শেষ হওয়া মানে, তারও ফুরিয়ে যাওয়া। বাওয়া কানুনে, মায়জু জীবিত থাকতে দ্বিতীয় শাদী করতে পারবে না। সুতরাং চতুর্দিক হতে তার হাত-পা বাঁধা। এদিকে তাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই পাড়াঘরে নানান কানাকানি হতে শুরু করেছে, সে শুনতে পায়। বহু সব আবোলতাবোল ভাবনার সূত্রে পরে এক সময়ে তার চোখ জলে ভরে যায়। সে তখন সহসা খ্যাপার মতো চিৎকার করে ওঠে, তু জলদি জলদি ভালো হয়্যা ওঠ্, মাস্নুন। বঙ্গার কিরা।

কত ঘটনা, কত কথা মনে পড়ে তখন। মাস্নুন যখন রোগাক্রান্ত হয় নি। এই রাত্রেই, কতদিন ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছে, তার গায়ের অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে স্খলিতবসনা মাস্নুন। তখন সুধ্‌নারই বেশ একটা ছমছমে লজ্জা করেছে। আস্তে আস্তে ডেকেছে বউয়ের নাম ধরে। মাথা নড়েছে সুধ্‌নার বুকের মধ্যেই। অর্থাৎ গভীর প্রশান্তিতে হারিয়ে আছে বাওয়া বউ। মন কানায় কানায় ভরে উঠত সাঁওতা পুরুষের। মাস্নুনের অঢেল শরীরে ডুব দিয়েও যেন কোন পারাপার মিলত না।

বাওয়া-জীবনে বিবাহের পূর্বে প্রেম একটা চালু রেওয়াজ। ভালোবাসা না হলে, শাদীও হয় না কোন বাওয়া তরুণ-তরুণীর। তাদের ভালোবাসা অবশেষে একদিন বিবেচিত হয় পঞ্চায়েতের খোলা আসরে। সেখানে যদি মেয়ের বাপের পক্ষে রায় হল, ইল্‌কাকে দণ্ড্ (বিয়ে) দিতে পারে ওই ছেলের সঙ্গে, তখন সেই ছেলেকে

একটা পাতার (ভোজ) সমুদয় খরচের 'দণ্ড' বহন করার কথা স্বীকৃত হতে হয়। শুরু হবে 'জমসিম' পরবের জন্য তোড়জোড়। তার আগে, বিচারের পর নিমন্ত্রিতদের ভাত খাওয়াতে হয়। সেই ব্যবস্থার নাম 'দাঁড়ন'। জমসিম হবে পাড়াঘর ছাড়িয়ে বাইরের কোন জঙ্গলে গিয়ে। পচাই আর হামডির স্রোত বইবে সেদিন। সঙ্গে শূকরের মাংস। মেয়েরা দল বেঁধে কোমর ধরাধরি করে নাচবে, মুখে গান। ছেলেরা ধংসা-তুড়িও-মাদল বাজাবে।

সেই প্রেমের দিনেও মাস্থন কি অপরূপ সুন্দরী ছিল। বাওয়া মেয়ের এ চ বাতিক, রহস্যের প্রায় কথাতেই 'কেঁদ পাকা' কথাটা বলবে। মাস্থন যখন ওই কথা বলত, চোখ নাচত তার। গালের রাঙ্‌চাকিতে অদ্ভুত দু'খানা টোল পড়ত। সুধ্‌না যদি বেভাবে থাকত কখনো, মাস্থনই গায়ের ওপর উঠে এমন আরম্ভ করে দিত, যার পর তার মন আর ভিন্ন ভাবনায় ছড়িয়ে থাকতে পারত না।

লাছলী যেদিন জলে পড়ে গিয়েছিল, সুধ্‌না বসেছিল পাড়ের ঝুপসি ঝাড় বনে। সেখানে বসে সে লক্ষ্য করছিল, তাদের স্নান করা। ডুব-বুক জলের গাড়ায় ভাসছিল দুই পূর্ণ শরীরের ডিঙি নৌকা। তাদের অনাবৃত পিঠে ক্রমাগত জলঝরি ফুটছিল, আবার পরক্ষণে সেই সব রজতখণ্ড টাপুর-টুপুর ঝরে পড়ছিল নিচে।

আঁচলা আঁচলা জল ছুঁড়ছিল তারা পরস্পরের মুখে। চোখে তাদের বিদ্যুৎ পাখার হিলিবিলি নাচছিল। লাছলী হাসছিল। একটু আগে রঙলা বড় জব্দ হয়েছে। খেলার ছলে ঝট্ করে ওর কাপড়ের আঁচল ধরে টান দিয়েছিল লাছলী, তাইতে একেবারে বেবাস হয়ে পড়েছিল সে। তাড়াতাড়ি কাপড় হাতিয়ে নিয়ে নিজেকে ঢাকতে গেছে, সেই অবসরে লাছলী সাণ্ডি জোয়ান ছোকরার মতো সাপটে পেঁচিয়ে ধরে পটপট করে ক'টা চুমো বসিয়ে দিলে তার বুকে-ঠোঁটে।

এই সব ভাবনার ছবি ক্রমেই সুধ্‌নার মনে বিচিত্র এক মৌ-

গন্ধের ডালি উজাড় করে ধরে। যার ফলে, সে বাউরা মানুষ হয়। এবং তখন ক্রমশ এক আজব নেশা তাকে পেয়ে বসে। গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তিক উঁচু টিলার ঢাল পেরিয়ে নাবাল জমি, দু পাশের নয়ানজুলিতে জল মরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নুড়ি-পাথরের ছড়াছড়ি। তারপরই গভীর বনের আরম্ভ। সেই জঙ্গল-মুখে সড়ক প্রান্তে এক খড়ো বাড়ির অঙ্গনে গিয়ে পায়ে পায়ে ওঠে। নিশুতি নির্জন তখন গ্রাম-মৌজা। কেউ তাকে লক্ষ্য করে না। বাড়ির পিছনে একটা ঝাঁকড়া মাথা গামহাব গাছ আছে, সে আরো নিঃশব্দে সেই গাছের নিচে নিরেট অন্ধকারে চুপটি কবে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে ঝিঁঝি ডাকে, তক্ষক ডাকে। অতঃপর গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে, বেড়ার ঘরের ছিদ্রপথে, সন্তর্পণে দৃষ্টি ভিতরে চালান করে দেয়। পরে, দৃষ্টি যখন অন্ধকার সওয়া হয়ে সহজ হয়, সে দেখতে পায় আকাঙ্ক্ষিত আলুলায়িত সেই সেয়ানা ভরা শরীর। শোয়ার ঝোঁকে অসংবৃত বেশবাসে কোন বক্ষাবরণ নেই। হাঁটুর ওপরে কাপড় তোলা। ঘাড় হেলে আছে একপাশে। সুধ্না তখন নড়ন-চড়ন ভুলে, দম বন্ধ করে মাটিব পুতুল হয়ে থাকে। এক সময় আঁধার বাত্রি কেটে, লালকুঁয়োর অরণ্য-প্রান্তর পাখির চিক্কুব হানায় মুখরিত হয়। দিক্‌ভ্রান্ত ঝড় খাওয়া মানুষের মতন তখন পায়ে পায়ে হেঁটে আপন আস্তানার দিকে ফিরে চলে সুধ্না। ছায়াটা কিন্তু তখনো মগজ ছাড়ে না। বাজহংসিনীর মতো দুধ-সাদা দেহ। বর্ষার দুহিনার ছাপাছাপি স্বাস্থ্য তাইতে। ভিজে কাপড়ের নিচে রক্ত-মাংসে ডেলা-ধরা যৌবন সরোবরের নিটোল দুই ডুব কলসী। হাত পা তার কাঁপতে থাকে। আর সে তখন রীতিমতো হাঁকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়।

নীরব নিরিবিলি রাত্রে অদূরে দাঁড়িয়ে সুধ্নার মনে হয়, নিশি-বেলার ছায়াান্ধকারের স্পর্শ লেগে মানুষের মুখের লালিত্য যা-কিছু কাটা পড়েছে, নাহলে ও অত কুৎসিত নয়। ছুটে এসে তখন

ওকে জড়িয়ে ধরে বসতে ইচ্ছা করে তার। তারপর উচ্চকণ্ঠে সকলকে শোনাতে, তু দাটা নহী মাস্থন। এখুনি একুবারে খারিজ হয়্যা যাস লাই। ফুরিয়ে যাস নি।

একটু পরেই চটকাটা ভেঙে যেতে, সুধ্‌না তখন ঘর্মাক্ত কপালে আরেক নজর তাকাল তার দিকে। রসকষহীন মাস্থন এবার আবার প্রকট হয়ে ওঠে। ছিবড়ে সার একটুখানি চেহারা। বুক-পিঠ এক হয়ে লেপে গেছে। সে যেন বাওয়ানী মেয়ে নয়। এই সময় প্রায়দিনই নিষিদ্ধ এক ভাবনা এসে সুধ্‌নার সমগ্র চৈতন্যকে গ্রাস করে। আজও করল। হঠাৎ সে ভাবতে আরম্ভ করল, দেবে নাকি মাস্থনের নামটা মুছে তার জীবন হতে চিরজনমের তরে? আর সে সইতে পারছে না ওই অপয়া অখুঙুলে মেয়ে মানুষটাকে। প্রতিনিয়ত অন্তরে মারণ সূঁচ ফোটাচ্ছে। সুধ্‌না এগিয়ে গেল প্রসারিত হাতে। আঙুলগুলো তার নাচতে থাকল লক্ষ সাপের ফণায়। শেষে, যখন অন্তিম টেপাটা দিতে যাবে, হঠাৎ হাত দুটো কেমন কেঁপে ওঠে। ক্রমে তীব্র এক মানসিক যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি রোগিণীকে ফেলে রেখে পালাল। পরে, ক্রন্দিত ওষ্ঠে হাওয়ার সঙ্গে অর্থহীন দাপাদাপি করল, আর পারি লাই। বেহদ্‌ জখম হয়্যা যেছি। আখুন ফয়স্‌লা মাঙ্‌তা।

কান্নার সূত্তিগুচ্ছকে খেলিয়ে খেলিয়ে যেন জলে ধুয়ে ওপরে তুলছে সুধ্‌না। কান্না-ভাঙা বিচিত্র গলায় অতঃপর সে হেঁচকি তুলতে থাকল।

এরই মধ্যে আরেক গণ্ডগোল বাধল নদী তুহিনাকে নিয়ে।

বিহান রাতের পর রোজ ঝপঝপ শব্দ ওঠে খাড়ি পারের কিনারে। যেন ধস ভাঙছে নদী। অথচ পরদিন সকালে দেখা

যায়, পাড় ভাঙার কোথাও কোন চিহ্নমাত্র নেই। স্বাভাবিক গতিতে বহমান গাড়া সম্পূর্ণ আগের মতোই আছে।

অচিরেই সর্বত্র একটা ত্রাসের ভাব ছড়িয়ে পড়ল। কিসের শব্দ তবে ওই? রেজা কুলিপাড়া থেকে বাওয়া-পট্টি ভয়ে সকলে একে-বারে কাঠ হয়ে উঠল।

সন্ধ্যা ঘন হলেই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়। থেকে থেকেই কি বুঝি গড়িয়ে গড়িয়ে ঝপাৎ করে গিয়ে জলে পড়ছে। এবং শুধু ওই পাড় ভাঙার ঝপঝপ শব্দ নয়, সঙ্গে আবার একটা নাকি-গলার কান্না শ্রুত হয়। তুহিনা ডাইন হয়ে চেঁচিয়ে যেন তার পাড়বাসী সকল মানুষকে সাবধান করে দিচ্ছে, খবরদার, কেউ যেন তার বুকে পরিকল্পিত লোহার খাঁচা পরাতে না অগ্রসর হয়। তা হলে, ভালো হবে না তার আদৌ।

নিতম্বী রেজা কুলিরা চেঁচাল, 'দানো সাহেব' বলে। আর বাওয়া পাড়ার মানুষেরা বললে, সাঁটিতে হয়্যাছিক গ। রাগি চড়ে গাতুয়া 'নাই' ডাইন হয্যা যেছে।

ওই সব আবো উল্লেখে, অন্যান্য শ্রেণীর রেজা মজুররাও বেদম ভয় পেয়ে গেল। আওযাজটা বেশী আসে, বাঁধের উত্তর-পশ্চিম কোণের ধাব থেকে। সন্ধ্যাব পর ওইদিকে হাজার তাগিদেও আর কেউ যেতে রাজী হয় না। মেয়েরা তো দিনের বেলাতেও আপত্তি তুলতে থাকল, ওঁয়াদের দৃষ্টি লাগবে নাকি! বিশেষ বাঁধের পাড় যে সময় নির্জন থাকে, কায়েমী পাট্টায় মৌরসী আমেজে চেপে বসার পক্ষে সেগুলোই নাকি খুব প্রশস্ত সময়।

ক্রমে কথাটা নানান বিন্যাসে যতো ঘোলাতে লাগল কুলিদের মুখে মুখে, ভীতিটা ততোই ঠাস-বুনট হয়ে চেপে বসতে থাকল সবাইকার মনে। কেউ আর উচ্চকিত হাসে না। পুরুষকণ্ঠের খিস্তি-খেউড় চুপ। এমন কি, সাঁঝবেলার পর কুলিপাড়ায় ধাওড়ায় ধাওড়ায় যে নাচ-গানের আসর বসত, তা-ও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

যেন ও ছাড়া আর কোন আলোচনার বিষয় নেই ছুনিয়ায়। কেবল পাড়াঘর জুড়ে যা কিছু ডমরুর লাফানি চলে। তার এখন আরো উদ্দাম চেহারা। তুমুল অট্টরবে অহর্নিশ একই কথার ভেরী বাজিয়ে সকলকে শাসাচ্ছে।—কেমুন, বলি লাই তখুন? বঙ্গার সাথ্ ছুশমনি। ইবার ছাখ কেনে গ, হঁাদে। বলে আবারো চারটি লাফ-ঝাঁপ হাঁকায়। তাকে এখন ধরে কে?

বাঁধের কাজ এক রকম বন্ধ হবার যোগাড়। কিছু রেজা কুলি বাঁধ রেকা ছেড়ে চলেই গেল কোথায়। এমনিতেই বাঁধের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রেজা মজুর এখনো অপ্রতুল। সব গাঁয়েই কিছু-না-কিছু প্রাচীন দিনের ও সেই পন্থীর মানুষ আছে। তারা একাধারে ঘরের মানুষকে বাইরের কাজে নামানোর ও এই প্রগতির বিপক্ষে। এদিকে সামনের বর্ষার আগে রিভার বেডের যাবতীয় কাজ সারতে হবে। বাড়তি জলের চাপ রুখতে একটা এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট উঠবে উত্তর-পশ্চিম দিক ঘিরে। এখন যদি ভয় পেয়ে বাকী কুলির দলও পালাতে থাকে, একটা মহাকেলেঙ্কারী কাণ্ড বেধে যাবে। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুণল।

কিন্তু বাস্তবিক ওটা কিসের শব্দ, আর ওই কান্না?

বুরন প্রস্তাব রাখলে, এল্লাবঙ্গার সেবা চড়াতে হবেক এখুনি। তবে যদি মারাং গাড়া গাহুয়া 'নাই'য়ের রাগি পড়ে। এই কীর্তি-কর্ম, কান্নাকাটি বন্ধ হয়।

বিহারী মহল্লা হতে রটনা পেল, দানো সাহেব সোয়াপন্ দেখিয়েছে বুড়ো বনোয়ারীলালকে, ভালো করে 'ওঁর' পূজা দিতে হবে আগেভাগে, তবে যা কিছু কাম-কাজ।

দিনক্ষণ ঠিক হয়ে সেইমতো ধাওড়ায় ধাওড়ায় একদিন ঢোল-কাশি বাজল, ধংসা-মাদলের ডিমডিম আওয়াজ উঠল। তারপর বিহিত-কর্ম সব যখন সমাধা হল, এবং সেই রাত্রেও কিছুমাত্র বন্ধ হল না পাড় ভাঙার আতঙ্ক-জাগানো ধ্বনিটা অথবা নাকে কান্না—সকলে

বিহ্বল হল। উদ্যোক্তাদের মুখ চুন। তবে কি কোন কিছুরই নিয়ন্ত্রাধীন নয় ওই অভিশপ্ত ডাকানি? অথবা মাটির মানুষের সকল শাসন-মিনতির ঊর্ধ্বে তার উপস্থিতি?

ডমরু খ্যালখেলিয়ে হেসে চেঁচাল, দেখিস, ইবার শালোদির কি হয় গ। কেউ কাথা রাখিস লাই। সান্তান হয়্যা অপকর্মে যুঝে ছিলিস, ইবার বুঝবি হঁ, কি হয়।

পাড়াঘরে এমন সমর্থ পুরুষ-মেয়ে বড় একটা কেউ নেই, যে এখনো বেড় বাঁধের নোকরী নেয় নি। তার ফলে, আগের ভয়-ভাবনাও তাদের মন হতে বহু পরিমাণ ঘুচে গেছে। গেঁজেতে তুল্কার প্রাচুর্য। মনের মানুষকে নিয়ে দূর খাদানে পালাবার আর প্রয়োজন অনুভব করে না দেহাতী পুরুষ। সমগ্র চত্বর জুড়ে লালকুঁয়োই এখন যেন খাদান মহল্লার নিশুতি ডেকে এনেছে। হাটে অঢেল সওদা-পসরা বিকিকিনি চলেছে সকাল-সন্ধ্যা। ঝুমরী মেয়েদের একটা পাড়াও বসেছে। যেখানে পয়সা ভিড়িয়ে শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় করতে পারে জাদান মানুষ। ইদানীং সন্ধ্যা শেষে নদীর পাড়ে মাঠের নিরিবিলিতে গেলেও স্পষ্ট নজরে পড়বে, অনেক বাহু, অনেক শরীর, নিবিড় মেশামিশিতে ঘন হয়ে আছে। লালকুঁয়োর বনভূমিতে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব নেই। মোড়ল-মুরুব্বির প্রয়োজনীয়তা মিটে গেছে। বরং সেখানে সারাক্ষণ মজলিসের তুফান বয়। জোয়ানীর মাদল-দামামা বাজে অহরাত্রি। যদিও ডমরুর চেঁচান আগের মতোই অব্যাহত আছে, কিন্তু পূর্বেকার সেই গর্জন আব যেন ধ্বনিত হয় না তার ডাকে।

এবারও হল না। কিন্তু তার জন্য কিছু নয়। সত্যি কথা, জাদান রাজ্যের অন্তঃস্থিত শিকড় ধরে যেন টান হাঁকিয়েছে এই চাপল্য। ডমরু তার ভাঙা দল আবার বুঝি গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখতে পায়। নীলবান দেশের হাটুরে সন্তান কষি শক্ত করে এই ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, এমন মানসিক স্থৈর্য আজ আর

অবশেষ নেই। অনেক ভাবনা-চিন্তার ঝড় তাদের ওপর দিয়ে পার হয়েছে। আসলে ওপরে যতোই ফুর্তি-আমোদে মশগুল দেখা যাক্ বাওয়া মানওয়াকে, অন্তরে পাপবোধের একটা জড়তা ভাব অদ্যাবধি থেকেই গেছে। দুহিনার জলে স্খলিত বসনে নাইতে নাবে বাওয়ানী সুন্দরী। সেই এলোঝেলো নাড়া এখন যেমন বিল-জঙ্গলের বাতাসে তেমনি বাসিন্দা জনেদের মনেও।

আবার দু'ভাগে পুজো সাজানো হল।

বিহারী রেজা বস্তির মানুষেরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দানো সাহেবের মনস্তুষ্টির আয়োজন করলে। সঙ্গে আর্জি-মিনতি মেলাই। দু'চারজন বয়েসের মেয়েছেলে এই উপলক্ষে উপোসও লাগালে ভজন গান হল; ওদিকে বাওয়া পাড়ায় আগের বারের মতো এল্লাবঙ্গার পুজো চড়ল। মা দুহিনার স্বামী বঙ্গাএল্লার ভালোভাবে পুজো হলে হয়ত এসব হুজ্জৎ-হামলা মিটে যাবে। দেওতা, বোঝাবে তাকে। সবই হল বিধিমাফিক, কিন্তু নতুন কোন ফল দৃষ্ট হল না। সন্ধ্যার পর হতেই সেই যতিহীন হৃৎকম্প যেমন আরম্ভ হয়েছে আজ কতদিন হল, অব্যাহত রইল। দু'পারের বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠল ঝুপুস-ঝাঁই। এবং সঙ্গে খোনাস্বরের আকুতি।

প্রথমকালের ভয়-চমকানি এবার আরো ছাপিয়ে গেল বিহারী রেজা মজুর ও জাদান সন্তানের বক্ষে। ইতিমধ্যে ভালো করেই টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। তারা সমানে প্রচার করতে থাকল, এতে ভয়ের কিছু নেই। এবং যা কিছু আওয়াজ-কান্নার উৎস অবিলম্বে হদিস করা যাবে। এটা ঠিকই, কোন ডাইন-দানো নয়। কে বা কারা ভারী ভারী পাথর গড়িয়ে দেয় মাত্র পাড়ের ওপর থেকে। আর তারই শব্দ হয়।

ম্যানেজার সাহেব নিজে নদীর চড়ায় প্রস্তাবিত বাঁধের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সকলকে হেঁকে বললেন, তোদের এত ভয় কি জন্যে, শুনি? আমরাও তো আছি। নাকি প্যান্ট-জামা খুলে দৌড় লাগিয়েছি?

তবু আতঙ্ক কমে না কারো। সন্দেহ যা ঘনিয়েছে, টলে না তার মূল। মানুষই যদি হবে, তবে শরীরী চেহারায় তাকে দেখা যায় না কেন? আর এইভাবে ভয় দেখানোয় কোন মানুষের স্বার্থই বা কি থাকতে পারে? ওদিকে দত্যি-দানো দেওতা-বঙ্গাও নিশ্চয় নয়। তাহলে পূজা অর্চনাতেই তো সন্তুষ্ট হত তারা।

লালকুঁয়োর কাশবন স্থির। তুহিনার আকাশ-জল বোবা নিষ্পেষণে ভরা। পাহাড়-মাটির বাসিন্দা মানুষেরা হাসি ভুলে, গান ভুলে, পিঙ্গল মুখ হল।

কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত থতিয়ে যায়। এতটা তাদেরও ভাবনায় ছিল না। অতঃপর তারা ঘোষণা করল, সেই মানুষকে, কিংবা সেই মানুষদের কাউকে যে ধরে এনে দিতে পারবে, পুরস্কৃত করা হবে তাকে। এইসঙ্গে সদর থেকে পুলিস আনানো হল। তারা সন্ধ্যার পরই পাহারায় বসে। স্বতন্ত্র সজাগ দৃষ্টি রাখে।

কিন্তু, কি ভৌতিক কথা। সেই শব্দ তবু থামে না, বন্ধ হয় না চিকে গলার কান্না। তবে, যেদিকে পুলিস থাকে না, শব্দটা আর কান্না আসে সেদিক থেকেই। পুলিস দিক লক্ষ্য করে পড়ি-মরি ছুটে যায়। কোথায় কি? লালকুঁয়োর ভারী রাতের চিরন্তন নৈঃশব্দ্যে-ভরা জনমানবহীন ফাঁকা মাঠঘাট ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

ভয় ক্রমেই আরো জবাট হতে উঠতে লাগল সবাইক, অন্তরে। পুলিস পর্যন্ত তার কিংবা তাদের দেখা পাচ্ছে না, ধরতে পারছে না কোন সুলুক-সন্ধান? সুতরাং অপদেবতা সম্পর্কীয় ভাবনাটা আবার তাদের হৃদয়ে গাঢ় বর্ণের ছায়া পাতে। এবং ভাবনাটা ক্রমশই সন্দেহাতীত রূপে সত্য বলে মনে হতে থাকে। অতএব তুলি ভাগা ফের আরম্ভ হল। কেউ ভয়ে, কেউ বা পাপ সম্ভাবনায় - নিত্য হরদার ভাগছে রেজা মজুরের দল। আর ওদিকে, ডমরুও সুযোগ বুঝে তার চরম নেশার খেলাটা এইবারে খেলে নিতে শুরু করে দেয়।

ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে ঘুরে সকলকে সে খেপিয়ে ফিরতে থাকল, হুঁ-হুঁ, ইবার কি কাথা ক'বি গ। বঙ্গা-দেওতার সাথ্ ছেনালী করতে চেয়াছিলিস সবাই। ইবার ইর নাকাই তোল্। অর্থাৎ প্রতিকার কর্।

অতঃপর ব্যাপারটাকে আর তেমন করে গতির মুখে ছেড়ে দেওয়া গেল না। এইভাবে কাজের ক্ষতি হলে, সকল দায়-দায়িত্ব প্রজেক্ট কর্ণধারদের ওপরই বর্তাবে। বর্ষা এসে পড়লে এমনিতেই কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আবার শুরু হবে, সেই শীতের মুখ থেকে। ফলে, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক বেশী লেগে যাবে কাজ সমাধা করতে। সুতরাং ঘন ঘন মিটিং-আলোচনা হল। বড়কর্তারা ঘড়ি ঘড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে দৌড়লেন শহরের দিকে। সলা-পরামর্শ, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা চলল। শেষে একদিন সদর থেকে আরো পুলিস এল। গায়ে গায়ে তাঁবু পড়ল তাদের। সমগ্র নদীপাড় জুড়ে দৃঢ় আবেষ্টনীর ঘেরাটোপ রচিত হল। আর এইবার, সত্যি সত্যি আশ্চর্য পন্থায় কান্না বন্ধ হয়ে গেল। এবং সেই ঝাঁই-ঝপাঝপ্ শব্দ!

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে সকলের।

লালকুঁয়োর উছল হাওয়া চিরকালীন খুশিয়ান তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে চনমনে শিস্ টানলো।

কিন্তু জাদান সন্তান যেন এতে বিহ্বলই হয় বেশী মাত্রায়। এখন উল্টো চিন্তা। তাদের বহু দিনকার লালিত বিশ্বাসের পাহাড়টা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ার দাখিল নেয়। তাহলে কি সত্যি, এই ক্রিয়াকাণ্ডের পশ্চাতে কোন বঙ্গা-ঈশ্বর নয়, মানুষেরই সুস্পষ্ট হাত ছিল। নাহলে মানুষ না হয়ে, বঙ্গা অথবা অপদেবতা যদি হত, সে কেন ভয় পাবে সদরের শহুরে কানুন ও পুলিসকে? ঝাপাং-এলে হয়্যা মানওয়ারে ডর? বিদেহী আত্মা হয়ে মানুষ ভীতি? অসম্ভব কথা!

তখন খোঁজা আরম্ভ হয়ে যায়। তবে কোথায় সেই ছায়ামানুষ

বা মানুষেরা, যে কিংবা যারা সকল বিশ্বাস শ্রদ্ধাকে ধূলিসাৎ করে, দেওতা হয় নি, দানো হয় নি। গভীর রাত পর্যন্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাথর গড়িয়ে দিত জলের দিকে। তবে যাই-কেন-না এতদিন ঘটে থাকুক, অপকীর্তিটা করে থাকুক যেই—বাঁধ রেকার মানুষ মোটামুটি আগের চেয়ে অনেক আশ্বস্ত হয়।

কিন্তু কোথায় কি! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সকল পালা সাঙ্গ করে দিন কয়েক পরেই একদিন সন্ধ্যার মুখে পশ্চিম দিক হতে আবার ভেসে এল সেই অলক্ষুনে আওয়াজ। সঙ্গে পরিচিত সানুনাসিক গোঙানিটা। যেন ক'দিন ঝিমিয়ে থাকার পর নেশাটা কেটে যেতেই ছায়াটা ফিরে নড়ে-চড়ে বসেছে। এবং বোধহয়, যেহেতু এ ক'দিন কোন প্রকার কাঁদা-কাটা হয় নি, সেটুকু আজ সুদে আসলে পুষিয়ে নেবার চেষ্টায় রত।

তড়িঘড়ি পুলিস দৌড়ল সেদিকে। কিন্তু এবারো সেই একই হাল। বহু পায়ের ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটায়, ঝড়ো শুকনো পাতাতে শুধু খসখস ধ্বনি উঠে চকিত একটা প্রাণের সাড়া বাজল। আসলে কোন সজীব প্রাণীর নাম-চিহ্ন দেখা গেল না দূর-নিকটের বনান্তরের কোথাও।

এরপর হতেই শুরু হল, পুরাতনী আজব লুকোচুরির খেলাটা। কিছুদিন বাদে বাদেই হঠাৎ একদিন শোনা যায় সেই শব্দ আর কান্না। পুলিস অমনি দৌড়য় শব্দ লক্ষ্য করে। কিন্তু সে পর্যন্ত পায় না কাউকেই। হাওয়ায় যেন মিশে গেছে সব কিছু।

নদীর পাড়ে গোক্ষুরের ধাঁচে ফালি একটা জমি আছে। সেখানে উল্লসিত জলধারা প্রবেশ করে খ্যাপা হাওয়ায় সারাক্ষণ ঘুরছে বনবনিয়ে। বুঝতে হবে, ওই জমি নদীর চড়া, বালির পলিতে সাময়িক ভরাট হয়েছে।

ম্যানেজারকে মেয়েছেলে যোগান দেওয়ার দায়িত্ব মিশিরনাথের।

মিশির টোপ দেয়।

জাদান সুন্দরী ঘর-বালবাচ্চা-মরদ ভুলে নেশায় উদ্দাম হয়।

বিহারী রেজা কুলি বস্তিতে নাচ হয়, গান হয়। ভারী পাছা দুলিয়ে হাঁটে বয়েসের মেয়েরা। উঠতি যৌবনের মেয়েরা বুকে বাঁধে নরম কাপড়ের বক্ষ-বন্ধনী। নাচের তালে তালে তা দোলে ফলবন্ত বৃক্ষশাখার মতো। কথায় কথায় হেসে চোখ মটকায় পুরুষ-দলকে। বুকের কাপড় সরিয়ে ধাসা খামচাতে দেয় টাকার বিনিময়ে। সেই পয়সায় আরো কত বাহারী সাজ ওঠে অঙ্গে। পাতা কেটে চুল আঁচড়ে, পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মিশির তাদের মধ্যে থেকে ডব্‌কা-ঠাসা শরীর দেখে বেছে বেছে সওদা কেনে। রঙ্গিণী নদীর পাড়বাসী মেয়েদের রূপের চটকে জ্যোৎস্না-রাত্রির আলোছায়াময় সৌন্দর্য। মিশির নগদ টাকার কথা বলে। বিলিতি দামী মদের প্রলোভন দেখায়। আজকাল আর হরেক রঙের ছিটের ব্লাউজ, লাল ডুরে শাড়ী, খোঁপার ফিতে, ঝুমঝুমি লাগানো রুপোর কাঁটা, কাঁচের জলচুড়ি ও মুদাম-নেকিতে মন ধরে না রূপবুনিয়ার কুঁড়ি ইলকাদের। রুপোর পৈছা-হাঁসুলির দিনও অতিক্রান্ত। চায়, বাবুমহল্লার মেয়েদের মতন রঙীন কাঁচুলি-শাড়িতে, মালা-গহনায় রকমারি করে সাজতে। নগদ টাকা হাতে পেলে মনোমতো সওগাত করে নেবে শনিচারীর হাটে।

এই ধরনের কারবার হয়ত পূর্বেও ছিল। মহাজনদের হাতে আদিবাসী জীবনের সম্ভ্রম-ইজ্জত, ইস্তক ধরম যাওয়া। কিন্তু তখন লালকুঁয়োর আকাশের বর্ণ ছিল ভিন্ন। সে বর্ণ-আবীর এখন চৌপাট হয়ে গেছে। ফলে, জাদান সন্তানের চাহিদারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ঠিকাদার 'সিং কোম্পানী'র ম্যানেজার সন্দীপ রায়।

ঘোরতর সাহেবী কায়দায় অভ্যস্ত মানুষ, সর্বদা স্যুট-বুট পরে আছে। মুখে তামাকভরা জ্বলন্ত পাইপ। অসম্ভব কড়া মেজাজ।

কথায় কথায় একে তাকে যা-ইচ্ছে-তাই বলে ধমকে ওঠে। রেয়াত-সম্মান করাকরি নেই কাউকে। কোন ওজর-আপত্তি-অজুহাত শুনবার পাত্র নয়। প্রয়োজনে নিজের জামার হাতা গুটোতেও তিলার্ধ দেরি-দ্বিধা হয় না। কাজের সময় সে মানুষ যন্ত্র। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। আবার কাজ অন্তে আরেক চেহারা। তখন পেয়ালা পেয়ালা মাল টানবে। বোতলের পর বোতল ফাঁক। আর নিজের মনে কি খালি বিড়বিড় করে বকবে। কবিতাও আবৃত্তি করে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। মিশির জানে, অবশেষে মেয়েমানুষ চাই, সেই মন হাল্কা করবার জন্য। তবে যে কোন মেয়েমানুষ হলেই কোন কাজ হবে না। ভরা বয়েসের মেয়ে হওয়া চাই। এবং দেহাতী সুন্দরীকে আগে 'শোধন' হয়ে নিতে হবে—ল্যাভেণ্ডার ওয়াটারে রুক্ষ ময়লা মাথা ধুয়ে, গায়ে সুগন্ধি শুভ্ররেণু ছড়িয়ে।

রেজা মেয়েরা সাধারণত পরে থাকে অপরিষ্কার জীর্ণ কিচ্ড়ি—সেই আবরণ খুলে শরীর-আঁটা উদাম-বক্ষ সিল্কের খাটো ঝুলের জামা আছে একটা আলনায়, তা-ই পরতে হয়।

বাঁধ রেকার রেজা মজুরেরা তাই আড়ালে ম্যানেজার সাহেবকে 'চুঙ্গিয়া কুক্কোস' বলে ডাকে। অর্থাৎ, যে পুরুষ কিছুটা ডাইনের খারাপ দৃষ্টি পাওয়া।

আর মিশির বলে, রম্তা যোগী।

এমন কু-কীর্তি নেই, জীবনে করে নি মিশিরনাথ। আগে কুলি-ঠিকাদারী করত। এবং সেই সঙ্গে মেয়েমানুষ সাপ্লাইয়ের ফলাও ব্যবসা ছিল। লালজীয়ুর সিংয়ের সঙ্গে গত কয়েক বছর আগে পুরীর মেলায় আলাপ হবার পর সে বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এই কোম্পানীতে বহালা-পরোয়ানা নেয়। লালজীয়ুর সিং মানুষ চেনে, ঘুঘু ব্যবসায়ী মানুষ। একদণ্ডেই চিনে ফেলেছিল মনিহারী চিজটিকে। আসলে, কুলি ঠেঙানোর জন্য তার একজন অতি ঘোড়েল লোকের প্রয়োজন ছিল সে সময়। সেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি

না করতে পারলে ঠিকাদারী করা যায় না। মিশিরকে পাওয়া মাত্র কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা নয়, একেবারে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিয়েছিল। সেই মানুষ পর্যন্ত বলে, বাস্তবিক ম্যানেজার সাহেবের মতন এমন মানুষ সে জনমে দেখে নি। গুরু লোক।

সাহেব কাঁচের পাত্র ভরা রঙিন তরল পদার্থে শয্যাসঙ্গিনীর প্রতিবিম্ব দেখে। ছোট চাপা জামায় রেজা মেয়েকে দেখায় ও বড় দারুণ। বাওয়া মেয়ে হলে তো চোখ ওপরে রাখাই মুশকিল। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের ডাক বাওয়ানী মেয়ের সমগ্র অঙ্গধারায়। সেই উত্তাপ তখন যেন আরো ফুঁসে আগুনের হল্‌কা ছিটোয়। সাহেব তাই দর্শনে তারিয়ে তারিয়ে হাসে। নিজে তখন যেমন দেদার মদ খেতে থাকে, সেই মেয়েকে এবং মিশিরকে ডেকেও সমানে খাওয়াতে থাকে ওই তরল সুধা। আর মুখে বলে যায়,—লেও, পিও। ড্রিঙ্ক, লাইফ টু দি লীজ।

যে বিচিত্র রঙের ফেলা-ছড়া নিয়ে তুহিনার আকাশ-মাটি-জল-বনস্থলি, সেই বর্ণ-বাহারের জাদুখেলা নিয়েই যেন ম্যানেজার সাহেবের সম্পূর্ণতা।

একটা টিলার ওপর ত্রিপল-টিন-কাঠে বাঁধা সাময়িক তাঁবু। ম্যানেজার সাহেবের কোয়ার্টার। সামনে খোলা দিগন্তবিস্তৃত সমতল ভূমি। ডানধারে নদী। তুহিনা ওখানে একটা আশ্চর্য সুন্দর বাঁক নিয়ে নেমে এসেছে অনেকটা ঢালু পথে। সেই পথের ওপরেই মূল বাঁধের দেওয়াল উঠবে।

যেদিন কাজের তেমন চাপ থাকে না, সন্ধ্যার মুখে, কোয়ার্টারের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা ডেক চেয়ারে এলিয়ে শুয়ে থেকে সাহেব অপলকে দূরের গাছ-গাছালি, বনের ছায়া লক্ষ্য করে। এই দেখতে দেখতে কিসের দংশন জ্বালায় শেষে এক সময় কেমন বিদ্ধ হয়ে ওঠে। বিহ্বল মিশিরনাথ হয়তো ছুটে এল। সাহেব কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করে দেয়। সেই সঙ্গে মদের বোতল খালি হতে থাকে। খেপে খেপে আবার অট্টহাসি হেসে ওঠে। গ্লাসের গাঢ় ঘন ফেনা

যত মজে আসে, রাত গভীর হয়। সেদিন সারা রাত্তির সাহেব আর ঘুমোবে না। মন দরিয়ায় ভাটির টানে কোন্ লগি পড়ে, কে জানে। কখনো চিৎকার করে প্রলাপ বকে যাবে, কখনো ওই কবিতা আবৃত্তি করে চলবে।

আরেক বিচিত্র বাতিক ম্যানেজার সাহেবের, ঘরের দেওয়ালে দেশী বিদেশী সব উলঙ্গ মেয়েদের ছবি টাঙাবে। মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো সযত্নে রক্ষিত ফটোগ্রাফ সে-সব। নিজের শয়নকক্ষের চার দেওয়ালে তো রাখবেই, এমন কি, অফিস ঘরের দেওয়াল জুড়েও ওই রকম ছবির মেলা সাজানো থাকা চাই। যাতে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই নারীর রূপ-সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করা যায়। এই নিয়ে লালজীয়ুরের আপত্তির জবাবে ম্যানেজার সাহেব অমনি ফড়াত্ করে রেজিগ্‌নেশন্ চিঠি লিখে বাড়িয়ে ধরেছিল মালিকের মুখের ওপর।—আমি কারো ডাইরেকশন নিয়ে জীবন চালাতে অভ্যস্ত নই, সিংজী। লিজিয়ে দরখাস্ত। আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।

মোটা লাভ আসছে প্রতি বিলের কাজে। সুতরাং লালজীয়ুর সিং অত মাথা-মোটা লোক নয়। বর্তমান ম্যানেজার সাহেবের মতন এমন কর্মপটু লোক কদাচিৎ চোখে পড়ে। ত্নিয়ায় দেখ-ভাল্ তারও কম হল না। খাঁটি কাজের লোক পাওয়া যে কী দারুণ শক্ত ব্যাপার, খুব ভালো করেই জানা আছে তার। সব শালার মুখে বাক্‌ফট্টাই, আসল কাজের ক্ষেত্রে অষ্টরম্ভা। সেখানে সন্দীপ রায় যেমন তুখড় ইঞ্জিনীয়ার, বিরাট বিরাট স্ট্র্যাপার-বুলডজারে টোকা দিয়েই বলে দেবে কোথায় গল্‌তি, কোন্ যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে গেছে বা কাজ করছে না তেমন করে। আবার হিসাবেও তেমনি ওস্তাদ। বড় বড় প্রকাণ্ড সব যোগ-বিয়োগ মুখে মুখেই করে ফেলে। এস্টিমেট যা দেবে, প্রতিদিন পূর্বদিকে সূর্য ওঠার মতো অভ্রান্ত ও যথার্থ। সর্বোপরি, যদিও আত্মগরিমার একটা ভাব সর্বদাই তার চলনে-বলনে প্রকটিত হয়ে থাকে, কিন্তু কাজের বেলায় খাটবে

একেবারে চাষার মতন। নিজে খাটবে, অপরকেও এতটুকু কাজে ফাঁকি দিতে দেবে না। ওই স্যুট-বুট-টাই পরেই হয়তো কোন গাড়ির বনেট তুলে বসে গেল মেরামতিতে। কিংবা কোন অপারেটর পারছে না সঠিক পরিমাপ মাটি কাটতে, সাহেব তাকে ধমকে নামিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরে নিজেই হয়তো বসে পড়ল।

বিজনেস করে টাকা কামাতে বসেছে লালজীয়ুর সিং। চরিত্র, শীলতা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে কখনো সে মাথা ঘামায় নি। মাথা ঘামানো আদৌ পছন্দও করে না। নষ্ট করার মতো অত বাজে সময় তার নেই। ব্যবসায় যখন কোন লোকসান হচ্ছে না, বরং দিনকে দিন লাভের অঙ্ক ফুলে ফেঁপে চলেছেই—অযথা বাজে ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার তার কী? যে যেভাবে পারে খুশী থাকুক। ওই নিয়ে তর্ক বাধিয়ে সন্দীপ রায়ের মতো লোককে হারানো তার তরফে মোটেই কাম্য নয়। অতএব তখন আবার খোসামোদের ধুম পড়ে যায়।

ম্যানেজার ধমকায়, আপনার কাছে চাকরি করি বলেই, আমায় নফর-বান্দা পান নি সিংজী।

সিংজী জিহ্বা কাটে।—হায় রাম! কৌন্ বোলা, উ বাত্?

ম্যানেজার বলে, মড়া দেখলেই শকুন নেমে আসে সত্যি, কিন্তু মনে রাখবেন তাদের দলেও রাজার জাত আছে।

শেষে অনেক কথাকথির পর তর্কের মীমাংসা হয়।

আরেকদিনের কথা মনে আছে মিশিরনাথের। কিছুদিন আগে একদল সাংবাদিক এসেছিল বাঁধের কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে তদন্ত করে যাবে বলে। যে ভদ্রলোক দলের মুখ্যনেতা হয়ে এসেছিলেন, সম্ভবত রাশভারী মানুষ তিনি। কম কথা বলছিলেন, আর চোখ ছোট করে এক অদ্ভুত নজরে দেখছিলেন সব কিছু। স্লুইস দরজা, রিভারবেড, এমব্যাঙ্কমেণ্টের প্রাচীর গাঁথা দেখে, চড়াই ভেঙে একসময় গোটা দল এসে উঠেছিল সিং কোম্পানীর

অফিসে। ঘরে পা দিয়েই বিষম খাবার অবস্থা সকলের। সমস্বরে আঁতকে বলে উঠেছে, ও গড্! এটা নরক, না আর কিছু?

ম্যানেজার সাহেব কোন জড়তা বোধ না করে নির্বিকারভাবে জানতে চাইল, আর কিছু মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন?

দলের সেই নেতা ভদ্রলোক এবারে মুখ খুললেন। পরিষ্কার বোঝাই গেল, যারপরনাই বিরক্ত হয়েছেন। সহজ কণ্ঠ তার ফুটন্ত হল, মানে আবার কি? বোঝেন না, এইভাবে কোন ভদ্রলোক কখনো থাকতে পারে না। বনের পশুর সঙ্গে মানুষের বিস্তর প্রভেদ আছে, সেটা মানেন তো?

ইঙ্গিত অপরিষ্কার নয়। তবু না-বোঝার ভাব করে, যেন হাসিরই কোন কথা কওয়া হয়েছে, ম্যানেজার সাহেব হো-হো করে ঝাঁপিয়ে হেসে উঠল।—তা বলেছেন বেশ কথা, বলে আরেক দমক হেসে নিয়েছে উচ্চকিত আওয়াজে। পরে বলল, একটু আগে নরকের কথা কী যেন বলছিলেন? আমার জিজ্ঞাসা, ভদ্রলোক যে কেবল স্বর্গেই যায়, এ সংবাদ কে জানালো আপনাদের? নাকি, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—তিন ভুবনের কোন গোপন সংবাদই অজানা থাকে না সাংবাদিক কুলের? ধন্য পেশা তাহলে একখানা!

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খুব রোষান্বিত গলা নয় ম্যানেজার সাহেবের, কিন্তু আত্মম্ভরিতা আকাশ-ছোঁয়া। চটাচটি না করে অদ্ভুত এক ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে কথাগুলো বলে গেল। বলে আবার হাসল গলা চড়িয়ে।

নেতা ভদ্রলোক এবার আর কিছুতেই বুঝি শালীনতা ধরে রাখতে পারলেন না। তর্ক বেধে গেল।

বিকশিত মুখে সন্দীপ রায় বললে, এ ব্যবস্থা তো বেশ ভালোই আমার মনে হয়। যারা থাকে, শুধু তারাই নয়, ক'দণ্ডের অতিথি হয়েও যে আসে এই আলয়ে, বিনা খরচায় ভাগ পেয়ে যায় অমৃত-ধারার।

—বলেন কী? ফুঁসে উঠলেন সেই ভদ্রলোক। বললেন, রীতিটা তো ঠিক এমন হওয়া উচিত নয়। অমৃত তো কেবল দেবতাদের জন্য। অসুররা কেন তার ভাগ পাবে? মহাভারত পড়েন নি, সুরাসুরের দ্বন্দ্ব। সে তো ওই অমৃতেরই জন্য। আশ্চর্য, যে জিনিস দেবতারা পর্যন্ত প্রাণে ধরে কাউকে দিতে পারে নি, আপনি দরাজ হাতে তা-ই ইতরজনে বিতরণ করছেন? বাস্তবিক, একজন মহান চরিত্রের মানুষ আপনি।

মধুর হেসে কৌতুককর ভ্রূভঙ্গিসহ সন্দীপ রায় তার জবাব করেছিল, স্বর্গরাজ্যের খবর ঠিক বলতে পারব না, তা তো আগেই বলেছি। তবে মর্ত্যের মানুষ হিসেবে আমরা বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের দেশের লোক কিনা। রবীন্দ্রনাথ জানেন না?—যা চেয়েছ, তার কিছু বেশী দেব, বেণীর সঙ্গে মাথা।

ভদ্রলোকেরা বুঝি আর কথা বাড়াতে চান নি। উঠে চলে গিয়েছিলেন তারপরে।

সেদিনটার কথা আজো পরিষ্কার মনে আছে মিশিরনাথের। মেঘ মেঘ দিন। কুয়াশায় ওপর আকাশ ঈষৎ তামাটে বর্ণধরা। কে যেন কালো পাথরের ঢেলায় দেগে দিয়েছে সমগ্র নীলাভ আকাশের গাত্র। ম্যানেজার সাহেব তারপর ঘরের নির্জনতায় এসে নিঝুম হয়ে বসেছিল। পরে, ক্ষিপ্ত নেশার টানে দেওয়ালে ঝোলানো একটা ছবির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ওষ্ঠে প্রগাঢ় চুম্বন করলে। এবং আশ্লেষ জড়িত হাসল। যেন মেয়েটা ছবি নয়, জীবন্ত রক্ত-মাংসের মানুষ। অতঃপর দু'হাতে তাকে কোলে তুলে ধরল। এবং চুমু খেতে থাকল। আর বলে চলল, আই প্রেইজ ইওর ইউথ্, ডার্লিং।

রাত ফর্সা হওয়ার সঙ্গে রেজা মেয়ে খেটো কাপড় সলজ্জ গায়ে তুলে নেয়। অথৈ শরীর তাদের দুর্বার উজানের ছন্দে উচ্ছ্রিত। ম্যানেজার তখনো সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে তাকে। আরেক প্রস্থ মদের স্রোত বয়।

মিশির পিছনে ডাকে, ফির্ কিস্তন আসিস লড়কি।

চলতে চলতেই ঘাড় কাত করে কুলি-দুহিতা। আসবে বৈ কি। বুকে এখনো ধরা আছে স্বপ্নময় রাতের ছবি। রেজা মর্দানা কি আর অমন করে ভরাতে পারবে কামিনা মেয়ের বক্ষ! পুরুষের পক্ষে যেটুকু লুটবার আছে কোন আওরতের কাছ থেকে, তারা তা-ই লুটতেই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে, প্রথম দর্শনের পর হতেই। সেখানে মান্জার সাহেব কত সোহাগের ভাষা বলে, কত মজা হয়। এবং ফেরবার সময় এক গুচ্ছ টাকা-পয়সা পাওয়া। সামনের শনিচারীর হাটে যা দিয়ে পছন্দসই সওদা কিনবে জীউতিয়া রেজানী।

মাটি কাটা খাদানে কাজ করে যতন। শহর সম্পর্কে তার প্রবল আগ্রহ: আর সেকথা সে প্রকাশ্যে স্বীকারও করে।

ইতিমধ্যে বারকয়েক শহরে ঘুরে এসেছে। শহরবাসের সুখ-সুবিধা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছে। আর তাইতেই নেশাটা আরো চড়ে গিয়েছে। বাস্তবিক গুণিন কিছু ঝুটা সংবাদ বলে নি। বুরনের কথা একটু উল্‌টে ধরলে অর্থ দাঁড়ায়: অনেক গেলেও, নতুন অনেক কিছু আবার পাবে জাদান সন্তান।

এখন শহরবাসের নানান স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাখ্যান প্রায়ই সে ফলাও করে তার পরিচিত জনসমাজে প্রচার করে। গুণিন যেন তাকেই যোগ্য সহকারী নির্বাচন করেছে। সে বলে, দূর শালা, শোহুর ছাড়্যে গাঁয়ে বাস করে কোই হেকা মানওয়া? কোন বুদ্ধিমান লোক?

বুরন যদি এক কাঠি হাঁটে, সে দশ পা যায়।

ডমরুর ভয় যতন করে না। অকুতোভয়ে সে তার কথা বলে যায়। টিক্রুর মতো অত বলশালী, ষণ্ডামার্কা চেহারাও তার নয়। কিন্তু মুখের বাক্‌ফাট্টাইয়ে তার ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না। এক কথায় সকলকে সে তুড়ে দেয়। কোন্ রহস্যময়

কারণে কে জানে ডমরু একমাত্র যতনকে কখনো ঘাঁটায় না। এখনো পাড়ায় ঘুরে ঘুরে তার শাসানোর অভ্যাস যায় নি, কিন্তু যেই যতনকে দেখে, চুপ করে যায়। যতন খলখলিয়ে হাসে। মুরুব্বি তাড়াতাড়ি পা চালায়।

ইত্যবসরে অনেক আদপ-কায়দাও সে শিখে ফেলেছে। শহুরে মানুষদের মতন দিব্যি টেরি কেটে চুল আঁচড়ায়। সিগারেট খায়। কেউ তা নিয়ে কোন মন্তব্য করলে, তাচ্ছিল্যভরা হাসে, দূর তেরি, চুটি আবার ানুষে খেতে পারে লিকিন?

রসিক লোক থাকলে টিপ্পনি দেয়, তুয়ার বাপ্ কিন্তুন খেত রি মদ্দ। বলে আদি রসাত্মক ছড়ায় বাকীটা শোনায়:

চেত্তাওলে সিইঃ বিআরি শিয়ার ওমো।

গুঠো ওমো।

পায়ুতে গাবের বিচি আটকালেই জানোয়ারের আসল চেহারা-খানা বেরিয়ে পড়ে, শিয়াল একটা।

যতন তখন সক্রোধে তড়িঘড়ি বিষয়টা এড়াতে চেয়ে বলে ওঠে, সি দিন কাল যি রকম ছ্যাল। নালি সারা জিন্দগী কেউ বেহুদা গাঁয়ে পচে মরে, ঘণ্টা! ইতেই ত সব পরিষ্কার।

সেই লোক যদি এবারে শুধোল, তা'লি তু চল্যা যেছিস লাই কেনে, হঁ গ?

যতন সাফ সটান তার আসল পরিকল্পনাখানা বলে দেয়। এট্টুস গুছ্যে সুছ্যে যেতে চায়।

গুছিয়ে-সুছিয়ে নেওয়া বলতে, কিছু মোটা পয়সা হাতে জমিয়ে নিয়ে তবে পাড়ি হাঁকাবে। শহরবাসে মেলা খরচ। আর পরান-ভরে খরচ করতে না পারলে, আনন্দও লাগে না, বাঁচাটাও মানুষের মতন হয় না। সুতরাং গেলে, মানুষের মতোই গিয়ে থাকা দরকার।

অনেক সময় খাদানের কাজ ছেড়ে, ওপরে হাওয়ায় উঠে গিয়ে দাঁড়ায় যতন।

তখন কোমরে হাত রেখে পা ফাঁক করে এমন কায়দায় বাগিয়ে দাঁড়ায়, মনে হবে, সে যেন একজন মস্ত কেউ। গতবার যখন শহরে গিয়েছিল, একটা সিনেমা দেখে এসেছে। সিনেমার নায়ক চরিত্রের লোকটার এইরকম ছিল দাঁড়াবার ঢঙ। অনেক চেষ্টায় কায়দাটা রপ্ত করেছে যতন। সেইভাবে দাঁড়িয়ে সে বার বার হাতিয়ে টেরি দেখে। ঘেমো মুখ মোছে রুমাল বের করে। তারপর বিরক্তি ভরা গলায় বলে ওঠে, ধ্যুস শালা, শেষ হলাম এই ভাগাড়ে। নিজের মনে মনে নয়, বেশ জোরে জোরেই কথাগুলো বলে, যাতে সকলে শুনতে পায়। বলে পরে আবার হা-হা করে হেসে ওঠে।

সেদিন এককেরী কাজের অবসরে, সকলে যখন বাড়ির পথে হাঁটছে, হাতে ঝোলানো বাঁধা পুঁটুলির মুখ ফাঁক করে জিনিসটা বের করে দেখাল যতন।—বল্‌ত, ইটোরে কি বলে ?

বুঝলেও, প্রথমে অনেকেই মুখ খুলল না। কি জানি, যদি ঠিক না হয়। যতনের মুখ যা আল্‌গা, অমনি হয়তো এমন ঠাট্টার কথা শুনিয়ে দেবে, মাথা উঁচু করে আর হাঁটাই দায় হয়ে যাবে।

যতন জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর হাসে। যেন কি একখানা জাদুময় বস্তু। অবশেষে শুধোয়, কি রে, কে বুলতে পারিস, কি ইটো ? বলে আবার সেই ভারিক্কি চালে ঠা-ঠা করে খানিক হেসে নেয়।

জিনিসটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখে যখন সকলেই ধরতে পারে কি ওটা, উৎফুল্ল হল, জ। জ একখান।

—আরে, ফল ত বটেই। কিন্তুন নামটো কি বল্ ? যতনের পা যেন এখন আর মাটিতে পড়ছে না। দম্ভভরে আঙুলে টিপে টিপে হাঁটতে থাকল।—হেঁ, হেঁ। জানি, জানি তুয়ারা কত বুলতে পারবি গ। ঘণ্টা পারবি। বলে আবার সেই হাসি দিল।

—তা' লি তু-হি বল্ লাই, কেনে ! অতঃপর সমস্বরে তারা অনুরোধ জানাল যতনকে।

যতন তখন দ্বিগুণ শব্দে গলা চড়িয়ে হাসল অনেক সময় ধরে। পরে রহস্যময় ভঙ্গিমায় দুলে দুলে বললে, হুঁ বলব। বলে চট্ করে না বলে, বড় বড় ঢোক গিলতে থাকল। শেষে যখন শ্রোতার দলের উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হল, সে আরম্ভ করল, শহরের হাটে গঞ্জে মেলাই পাওয়া যায় দেখেছি। কিন্তুন ইখেনে ত আর মিলেক লাই গ। তাই কিনলাম একখান বার্ মিচালি ত্থে।

—হাই, তুই সিকি ?

যতন ফের হাসল উচ্চকিত স্বরে।—তবে ? খেছিস কুনোদিনও ই চিজ ?

তারা একটুক্ষণ বাক্ বন্ধ হয়।

সেবারে যতন কোঁতানি দিল, শোহুরে কেত্তার তুয়ারা কি বুঝবি গ, হাঁদে ? গাঁওইয়া জন। শোহুর গেলে বুঝতিস, কিনলাম কেনে ? এইসঙ্গে বলে যায় আরো অনেক কথা। যার সারমর্ম, ওই শহুরে বাবু মানুষদের মতন যদি না-ই বাঁচতে পারল, তবে জীবনের সার্থকতা কোথায় ? বলে যতন একই মতো তারিয়ে তারিয়ে হাসতে থাকল সঙ্গীদের অজ্ঞতায়।

দলের মধ্যে ঝোলা ছিল কমবয়সী। সে হি-হি করে হেসে হঠাৎ জানতে চাইল, তা, তু ভি সি মারাং বাবু হছিস লিকিন, আঁ ?

-- হই লাই আখুনো। তবে হব, হাঁ। জরুর। যতন ঝাঁজ দিল।

যতনের ঝাঁজিতে তখন আর শুধু ঝোলা নয়, ঝোলার মতন আরো যারা তার কথায় বেশ একটা মজা অনুভব করছিল, কেমন থমকে গেল। যতন বলল, সেতার মতুন যারা থাকে, বাঁচা কারে বুলে, তারা আর কতখানি বুঝবে হুঁ! মো কারো তোয়াক্কা করি লাই। সাচ্ কবো। বাঁচতে চাই মো।

যতন তাদের প্রায় ব্যাপার নিয়েই টিকাটিপ্পনি দেয়, তাইতে কিছু মনে করে না তারা। যতই কেন না কারচুপি ব্যথাটা থাক্, অথবা মুরুব্বি পরিত্রাহি চেঁচাক, আরেক দিক দিয়ে কথাটা মিথ্যা নয়,

বাঁধ রেকার কারণে সভ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারল তারা। আরণ্যক অভিশাপ মুক্ত হয়ে এখন দিব্বি অনায়াস জীবন। সুতরাং এই বিচারে, বাঁধ রেকার বাবু মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা তাদের কিছু থাকতেই হয়। আর যতন এই প্রসঙ্গ ধরেই যা কিছু খিস্তিখাবুদ, রসের মন্তব্য করে। কিন্তু এখন, একনাগাড়ে ক'ঘণ্টা খাটা-খাটুনির পর ঝুপ করে কুকুরের বাচ্চা গালি শুনলে, যে কারোরই মাথায় চড়াৎ করে রক্ত চড়ে যেতে পারে। বাওয়া জোয়ান প্রত্যেকেই, বাপ তুলে গালি খাওয়া কে আর বিনা প্রতিবাদে হজম করবে? ঝোলা এবং আরো ক'জন মোচড় ফিরে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়ায় দেখে দলের মধ্যের একজন চট্ করে এগিয়ে এসে যতনের হাত ধরে ফেলল।—আঃ ছাড়ান্ দাও, বৈহা। যা ক'ছিলে কও। কাজিয়া-কাফারিয়াও আর ভালাই লাগেক ল'ই। জ-টোর নাম বলো পহেলা।

অবশেষে যতন বলল, একে আম বলে। উল।

শহরের হাটে-বাজারেই এতাবৎকাল যা কেবল পাওয়া যেত—এখন, এই সুদুর্গম পার্বত্য অরণ্যেও সেইসব দুর্লভ বস্তু সামগ্রীর অঢেল অফুরান চালান-আমদানী ঘটে। সেই সুবাদে, একাধারে শখের জিনিসের সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় বহুতর দ্রব্যাদির নাম-গোত্র যেমন তারা জেনেছে, নতুন ফল-পাকড়, তরিতরকারীও অনেক চিনেছে। আস্বাদন পেয়েছে সে-সবের। কুল, বেল, কলা, পেঁপে প্রভৃতি কয়েকটা ফলই কেবল জন্মায় এই রুক্ষ অনাবাদী বনচত্বরে। স্বতঃই সেই কয়েকটা ফলই শুধু চেনা ছিল। নতুন অনেক কিছু চেনার সঙ্গে, আজ যতন আরেকটা নয়া ফল চেনাল।

তারা পুনরায় কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসায় যতনের হাত থেকে ফলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখল। যতন তখন আগের মতোই হেসে উঠল হেঁ-হেঁ করে।—শোহুরে গেলে আরো কত দেখতে পাবি গ হঁ। ই-তো এট্টা রকুম।

—আরো ভেন্ন প্রকার জ ? লিকিন, ই বস্তুটোই মেলা ?

যতন নাকে হাসে, হু-ই, বুঝলি হু-ই। ভেন্ন ভেন্ন জ যেমুন, গুনতিতেও কত দেখবি। হিসাব হয় না তার।

—হয় লিকিন ?

—তবে ? কি ভাবিস গ তুয়ারা ?

বেশ, এবার আরো হু'এট্টার নাম ক'।

—বীহি, কান্ঠার, শ। অর্থাৎ, পেয়ারা, কাঁঠাল, জাম। যতন আঙুলের ক' গুণে গুণে বলে যায়। তারা অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে যতনের দিকে। বা-বা, যতন যে কবে থেকে হঠাৎ এমন বুঝ্‌বাঝ্‌ মানুষ হয়ে গেল, ভৌতিক ব্যাপার! মুরুব্বি, গুণিনের পরই দেহাতী জাদান মানওয়াকে এখন তার কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে হবে।

পট্টিতে ঢুকে যতন আলাদা হতে চাইল। তখন এক মজার কাণ্ড ঘটে।

দলের মধ্যে প্রৌঢ় মানুষ ছিল বোঁয়া। সে বুঝি এতক্ষণ তীক্ষ্ণ মনোনিবেশে সব শুনছিল আর দেখছিল। বিশেষ, যতনের কথা যে তার মনে একটা চোরা বান ডেকেছে, তার চলনেই সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল। সে হাঁটছিল আর বার বার মাথা দোলাচ্ছিল কথার তালে তালে।

ক'দিন আগে এই রকম দল বেঁধে পট্টির রাস্তায় পথ চলতে চলতে এই বোঁয়াই তাকে একসময় শুধিয়েছিল, হাঁরে, এত্ত শোহর শোহর ব্যাখ্যান গাস্, কিমন পারা জায়গা রি সিটো, আঁ ? এত্তখানি উমর হল, গেলাম লাই ত কুনোদিন।

অতি স্পষ্ট সাফ জবাবে যতন খ্যালখ্যাল করে হেসে উঠেছিল : —তুয়ার জিন্দগীই তয় ইস্তেমাল গ হুড়িং বাবা (কাকা)।

—লিকিন ? বুড়ো এদিক ওদিক চেয়ে খুটখুটিয়ে হেসে নিয়েছে কয়েক মুহূর্ত। ডমরুকে তার বড় ভয়। ক'দিন যে পাগলামি আরম্ভ

করেছে মুরুব্বি, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান যেন সব লোপাট হয়ে গেছে। দল ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে, একে একে সকলেই প্রায় গিয়ে নাম লেখাচ্ছে বেড় বাঁধ রেকার মজুর খাতায়। যদিও বর্তমানে ক্রোধের মুখ্য কারণ এইটাই। কিন্তু শহরের নাম কানে গেলেই অমনি খেপে এমন অগ্নিমূর্তি চেহারা ধরে, মনে হয় যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে সব একশা করে দেবে। বোঁয়া পরে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেনে রে, উ কাথা ক'ছিস কেনে? কি, আছিক কি সিখেনে? লতুন কি জিনিস?

যতন জবাব করেছিল, তার কি কবো? তার কি কুনো লিখাই হয়?

—কেনে, হয় না কেনে? অাঁ?

—বিরাট ব্যাপার-স্যাপার গ সি-সব। এতম-কঁয়ে রুমিলা বেত্তায়। চারিদিক আলো ঝলমল। বড় বড় ওড়া হাঁদে। শুনিনের মুখে শুনিস লাই কখুনো?

—শুন্‌ছি বটেক। কিন্তুন্ আরেকবার বল্। হয় লিকিন?

—হঁ, পেল্লায় কাণ্ড থাকে বুলে। তু দেখিস লাই, তু সি-সবের কি আর বুঝবি মুখের কাথাখ্যান্ মাত্র শুন্যা।

—তাহোক্। বল্। বুড়ো চক্ষু বিস্ফারিত করেছিল।

যতন তখন ফতোয়া পড়ার মতন বলেছিল, বুঝিস্ন্ গ হাঁদে, সোঝে কাথায়, সিটো একুখান্ জায়গা বটেক, হঁ।

বুড়ো সেবারে জানতে চেয়েছিল, শোহরে এমুন মাঠ-বন আছিক, এমুন 'নাই'? রাসুজ্‌নি চারা ফলে, এখেনে যেমুন হয়? কথাগুলো জিজ্ঞাসা করেই বুঝি তার কি খেয়াল হয়েছে, হেসে উঠেছিল, অ বুঝ্‌ছি, সিখেনে সবই বেশী বেশী। ইখেনে যত্ত পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশী। জঙ্গলে তুমুর রাসা (মধু) জাদা হয়, 'নাই'তে মেলা জল। ডাংরা তোরা দেয় বেশী। ইখেনকার চেয়ে মাঠ অনেক বড়। অনেক গাছ, অনেক পাখি। এই ত? হি-হি। হেসে বুড়ো

আবার বলেছে, বুঝ্‌ছি রি হপন। এক্কুবারে লেল্‌হা পাস্‌ লাই। বোকা পাস নি।

যতন হতভম্ব হয়েছে।—কছিস কি, আঁ? বলেই পূর্বাপক্ষা চতুর্গুণ জোরে খ্যাট্‌খেটিয়ে হেসে উঠেছিল।—যাঃ শালো, ই কি কাথা গ। গাছপালা, নদী, জঙ্গল—ই সব কুথা পেইলা গ হুড়িং বাবা। হাই বাপ্‌, শোহুর কি শালো তুয়ার বনবাদাড়ের মুলুক লিকিন, হঁ? ই আতোর মতুন? গ্রামের মতো?

এবার বুড়ো'র অবাক্‌ হবার পালা। ফুঁকরে উঠেছে, আঁ, তবে যি বুলিস, উতু-জ সব সিখেন থিক্যা আসে।

তখন যতন আবার গলা ফাটিয়ে না হেসে পারে নি।—হাই আয়ু গ। তাই কও! মরে যাই, মরে যাই! অবশেষে বুড়োর পেড়াপীড়িতে রহস্যের ঢাকনা পুরোপুরি আল্‌গা করে যতন যখন বুঝিয়েছে, চারিধার থেকে চালান আসে শহরে, তাই সেখানকার হাট-বাজার সারা বছর গমগম করে নামান পণ্য সামগ্রীতে। গ্রামে তো আর সে-সুবিধা নেই, স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির ওপরই যা কিছু নির্ভর। অতএব শহরবাসে বহু রকমারী খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যেমন পরিচয় হবার সম্ভাবনা থাকে, অনাহারেও কাউকে কখনো থাকতে হয় না। যতই কেন না, খরা অথবা প্লাবনে ফসল মারা যাক।

এতসব শুনে বোঁয়া তো একেবারে মরে যায় প্রায়। কফের ধাত আছে, গলায় সর্বদা সর্দি ঘড়ঘড় করে। এখন বুড়ো হেঁচ্‌কি তুলতে থাকল।

যতন আবার বলল, বুঝ্‌লি, সি সব মেলা-ই আয়োজন। কত মানুষ। কত বা লোতুন লোতুন ঢাঁই সামান!

বোঁয়া তারপর আর যতনের কাছাকাছি থাকে নি।

এখন সে সহসা যতনের নিকটস্থ হয়ে বিনবিনিয়ে বললে, এট্টা কাথা কবো হপন, শুঃ বি?

যতন এগিয়ে গিয়েছিল দল ছেড়ে, থামল।—কি কথা কও।

বোঁয়া আশেপাশে দেখল। ঠোঁট চাটল। তারপর যেমন ফস্ করে লোকে কোন শক্ত কথা উচ্চারণ করে, বলল, তুয়ার ও-হি জ-টো থিক্যা এট্টুস ভেঙ্গে দিবি, খেতে কেমুন লাগে, দেখতাম গ। বড্ড প্রাণ চেছে রি।

যতন তাকিয়ে দেখল বোঁয়ার মুখের দিকে। ক্লিষ্ট মুখ বুড়োর, অস্বাভাবিক রকম চকচকে লাগছে। উত্তেজনায় সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়েছে।

যতন ঠেল্ দেওয়া হাসল, খুউব ইচ্ছা করে ?

বুড়ো মাথা নাড়াল, হঁ রে।

কোপাই দিয়ে ফলটার এক প্রান্ত থেকে একটুখানি কেটে বুড়োর হাতে দিল যতন।—নে, দেখ তবে চেখে।

বুড়ো সাগ্রহে খোসা সমেত সেই ফালিটা মুখে পুরে দিল।

যতন হাই হাই ডাক ছাড়ল, আহা, খেড়াটো ফেল্না না ?

—উ আর ফেল্তি হবেক লাই। খেছি যখুন, সব খাব। কিছু বাদ-ছাদের কারবার দেখি লাই। খোসাসুদ্ধ ফলের টুকরোটা গিলে ফেলে বুড়ো মাখোমাখো হাসল।

যতন টিপে হেসে ফের যেন তার প্রত্যুত্তর দিল।- যাঃ শালো !

বুড়ো এবারে সাপ্টে যতনের হাত দু'খানা পেঁচিয়ে ধরল।—আরেট্টা কাথা কবো, বাপ্।

—কি কাথা ?

—উ সোময় আর কত্তগুলি ফলের কি নাম যিন্ কছিলি ?

—শ, বীহি, কান্ঠার ?

—হঁ, হঁ। উগুলিও আনচিস লিকিন গ, হাঁদে ?

—না, আজ আনি লাই।

—বেশ, তবে যি দিন আনবি, বোঁয়া আবার সহসা খপাৎ করে চেপে ধরল যতনের হাত। কথাটো হ্য না—বলে ঢোক্ গিলে সেই ফস্ করে বলে ওঠার মতন একসময় বলল, যিদিন আন্বি, এই

রকুম টুকুন কাট্যৈ হলেও দিস রি। দেখে রাখব, সিগুলোর কেমুন পারা নোনেই। স্বাদ।

যতন চুপ। আরেকবার দেখল বুড়োর দিকে। তারপর স্বীকার করল, আচ্ছা বেশ, যা দিব।

বুড়ো এক মুখ হেসে এগিয়ে গেল দলের সঙ্গে মিশতে।

গাঁ-লালকুঁয়োর ভোল পালটাচ্ছে। সদা ব্যস্ত বাঁধের পাড় অবিরাম যান্ত্রিক কোলাহলে মুখর। ধাবমান মোটর, ট্রাক, জিপ ছুটছে উল্কাবেগে। বনজঙ্গল সমূলে কাটা পড়ছে। রোপওয়ে ধরে পাথর ভর্তি বাকেট দুরন্ত গতিতে গড়ান নিয়ে ধেয়ে চলেছে নিচের সমতলে, নদীর পাড় যেখানে পাথরের দেওয়ালে মজবুত করে গড়া হচ্ছে। বুনোলতার-ঢঙে সাময়িক ঝুলন্ত সেতু টানার চেষ্টা চলেছে নদীর দু'পার জুড়ে।

সাঁঝবেলার স্নান সেরে ফিরছিল রঙলা।

ঘরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কানে এল, কম্পিত এক সুর-মূর্ছনা। সুর যেন বাতাসের মীড়ে মীড়ে ঢেউ এঁকে চলেছে। উথাল পরান তখনো নদীপারের রক্ত সন্ধ্যার আবিলতায় ছায়াচ্ছন্ন।

দু'ফেরী কাজ শেষে জংলা ডেরার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে লাছলীর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে সহসা রঙ্‌লা জানতে চেয়েছিল, আজও হাসনার সঙ্গে মিলিত হয়ে রোজকার মতো তারা নদী পাড়ের নির্জনতায় গিয়ে বসবে কিনা? কারণ, নয়ানজুলির রাস্তা ছেড়ে খাড়াই ঢিবি পথে শাল মহুয়ার জঙ্গল ধরে হাঁটবার জন্য লাছলী তাকে বার বার উৎসাহিত করছিল।

পড়ন্ত বেলার আলো লেগে বুঝি বর্ণ-রঙীন দেখাল লাছলীর মুখচ্ছবি। প্রথম দফায় বিনা বাক্যব্যয়ে হেসেছিল সেই প্রশ্নে।

চোখ নাচল কৌতুকে। পরে বলেছিল, হঁ, যাব বটেক। লাই ত, মরদটো সারা রাত পাগলের মতুন ছটফটায়ে শেষ হবেক যি। কিন্তুন, আজ দারা লিখ্‌রা উয়ার। অর্থাৎ ইচ্ছে করে আজ দেরিতে গিয়ে বাওয়ানী মেয়ে শাস্তি দেবে তার মনের মানুষকে। রগড় হবে।

কথাটা বড় মনঃপূত হয়েছিল রঙলার। পুরুষমানুষকে শাস্তি দেওয়া। ভোগানো। মুখ ঝুলিয়ে তখন সে-ও সামিল হয়েছিল সেই হাসির। এবং সেই বাবদে আরো ফুসলোতে চেয়েছিল লাছলীকে।—হেঁকালে দারা লিখ্‌রা কিন্তুন। শাস্তিটা অবশ্যই কিছু কঠিন হওয়া চাই।

এরপরই রঙলা হঠাৎ ছানা-কোকিলের মতো পিকপিক করে বলে উঠেছিল, আচ্ছা, হাসনা তুয়ারে খুব পেয়ার করে, লয় ?

এ আর নতুন কোন্ কথা ? নীলবান গাঁয়ের প্রায় সকল মানুষেরই জানা হয়ে গেছে এই সংবাদ। সামাজিক অবস্থা ও দিনকাল আগের মতো থাকলে এতদিনে কি কাণ্ড ঘটে যেত সমগ্র জাদান ঘর জুড়ে, কারোরই তা অজানা নয়। সময় পালটেছে বলেই, রীতিবিরুদ্ধ হলেও, এ ব্যাপার নিয়ে আজো তেমন কোন হৈচৈ ওঠে নি।

মেয়েলী পল্‌কা বক্ষে পুরুষ-ভালবাসার গুনগুনানি। তুলাড়।

দিনশেষের আলোতেও রোদ লাগা হাঁসুলির মতো যদি ঝকমকে দেখাল লাছলীর মুখমণ্ডল, রঙলাও ভিতরে ভিতরে রীতিমতো চাঞ্চল্য উপলব্ধি করে।

—সাঙা কর‍্যা আলখ্‌ ডেরা বাঁধবি লাই, তুয়ারা লিকিন ঠিগিয়া বসবি ? নিয়ম মতো বিবাহ করে ঘর বাঁধবে, নাকি, ঝুমরী মেয়েরা যেমন থাকে, বিয়ে নয়, তবু একই সঙ্গে থেকে ঘর-সংসার করে যাওয়া।

আজ যেন কিছুই বুঝবে না রঙলা, নিজেতে নিজে বিভোর।

লাছলীর দোদুল হৃদয় যে এতে বুনো পায়ের দলনের মতো পিষ্ট হয়, ভ্রূক্ষেপও করল না। লাছলী কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। পরে কি বুঝি বুঝেছে, সি ওগুালে তক্‌দীর? তেমন বরাত কি আর তার হবে? বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছিল রঙলার মুখের দিকে। বাওয়া বস্তির চিংড়ি। দেহ তারও জংলা নদীর দুহিনার সমতুল। শাওনের স্বাস্থ্যে ভরভরাট। মুখ চোখের রঙে জাদান দেশের সন্ধ্যার ঝিলি-মিলি বর্ণাভা। লাছলী অতঃপর আকস্মিকভাবেই তাকে সান্ত্বনা দিতে ডেকে বলেছিল, এট্টা কাথা কই, জিন্দগী ধরম। তু কারো সাথ্‌ মোহব্বতি কর্‌ রঙলা। এরাকে থিক্যা বাঁচ্যে যাবি। নিঃসঙ্গতা থেকে বেঁচে যাবি।

তার বক্ষে এ পীড়ন তো অহোরাত্রিই কঁকিয়ে চলেছে। জোয়ানীর কান্না। সেই কবে একবার বুঝি ঝোলার সঙ্গে কিছুটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, ঝোলা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে মুল্‌কিকে সাঙা করল। রঙলার তখন সবে বোধহয় যৌবন আসতে শুরু করেছিল দেহে। তারপর আর কোন পুরুষেব পদধ্বনি পড়ল না তার যৌবন আঙ্গিনায়। পড়ত হয়তো জাদানদেশের কোন বাওয়া মেয়েরই পুরুষ সান্‌কি-খোলের অভাব হয় না। কিন্তু রঙলা সেই থেকে বরাবর পুরুষসঙ্গ পরিহার করে এসেছে। রোখিয়ানায়লার নাচ অথবা পুবকন উৎসবেও অন্যান্য বাওয়া মেয়ের মতো কিছুতেই বেবল্লা হয় নি। ওই দুইদিন বাওয়া জীবনে অবাধ ছাড়পত্র ব্যভিচার করবার। কোন বাওয়া সাণ্ডি জোয়ান কিংবা কুঁড়ি ইল্‌কাই সে সুযোগ হাতছাড়া করে না, কিন্তু রঙলা তাইতেও কোন দিন গা ভাসায় নি। এখন বয়েসের আড়কাঠি তার জোয়ানীর ধংসায় সর্বক্ষণ রিনিরিনি পিটেন হাঁকাচ্ছে, সে ব্যর্থ হল, পেল না কিছুই। রঙলা অতঃপর সত্যি সত্যি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

আগে নদীর তটে ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হত যে স্থান, সে জায়গা এখন বাঁধের আওতায়। ঢাঁই ঢাঁই মাটি কাটা হচ্ছে

সেখানে। সঙ্গে পট্টিও ছড়িয়ে পড়েছে আরো অনেক বেশী স্থান জুড়ে। তেলেঙ্গানা বস্তির এক ফ্যাঁকড়া এবং নতুন পত্তনী মুণ্ডা রেজা পাড়া, বৃত্তাকারে ঘুরে একেবারে বাওয়া মহল্লার উপান্তে এসে পৌঁছয়। কাঁকর-ঢালা লাল মেটে রাস্তা বাঁধের সীমানা ঘুরে মূল সড়কের দিকে চলে গেছে। নতুন জঙ্গলকাটা জমি—জংলাকাটা, তার উত্তরে আকাশমণি, সুন্দরী, গরান গাছের জড়াজড়ি—ঈষৎ সমতল ক্ষেত্র। সমতল ঠাঁই শেষে সোজা নেমে গেছে ভিজা বালুকা বেলায়। নদীর পাড় থেকে জঙ্গল পর্যন্ত—মধ্যবর্তী সমতল ভূমিটুকুর নতুন নামকরণ হয়েছে, পলাশ মিলন। গাছুয়া তুহিনার উচ্ছল তরঙ্গ বিক্ষোভ এসে আছড়ায় লাল শালুপাড় খাড়ি কিনারে। পাশেই লাক্ষাক্ষেত। পলাশ আর কুলগাছ শুধু। এখান থেকেই স্পিলওয়ে দরজা বসা আরম্ভ হবে। ক্রমে তা নদীর বুক পেরিয়ে চলে যাবে ওপারে।

কথা বলতে বলতে তারা নদীর এই নির্জন স্থানের দিকে চলে এসেছিল। নদী-পাড়ে সন্ধ্যার পর থেকেই ঝুপস-ঝাঁই শব্দের ডাকানি আর খোনাস্বরের কান্নাতে যে আর্তভয়ের রোল ওঠে, তাইতে বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট্‌লা পাড় জনমানবশূন্য হয়ে যায়। এবারে রঙলা আপন ঘরের পথ ধরেছে। লাছলী এগিয়ে গিয়েছিল এক উৎরাইয়ের ঢালে। ওই পথে পাড় ঘুরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে দেরি করে। হাসনাকে জারা লিখ্‌রা দেবে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রঙলা। একটু বিচলিত হল। সুরটা বন্ধ হয় না। একইমতো গীত হতে থাকে। এধরনের গান সে আর ইতিপূর্বে কখনো শোনে নি। মন দরিয়ায় যেন ঠেল উজানের স্রোত লেগেছে। বৈঠা পড়েছে ছপছপিয়ে। সুতরাং গায়ক মানুষটা কে হতে পারে, আন্দাজ করা গেল না। তবে কমনীয় গলার সুরের মধ্যেও যেটুকু চমক-গমক আছে, সন্দেহ হয় পুরুষই হবে কোন। কিছুক্ষণ আগে জংলাকাটার সমতল ক্ষেত্র পেরিয়ে

টিবি বনের আঁধারে এবং পরে খাড়ি পারের দাম-ঝোপের আড়ালে জোড়ায় জোড়ায় মিশে থাকা কয়েকখানা শরীর দেখে এসেছে। যদিও বুঝতে হবে, এরা খুবই অসমসাহসী। নাহলে জাদান মানুষের পক্ষে ডাইন প্রেতের ভয় উপেক্ষা করা, সহজ কথা নয়।

পরে চটকা ভাঙলে নানা কথা ভাবতে ভাবতে রঙলা আবার হাঁটা ধরেছে। অবশেষে নিকট হলে প্রত্যক্ষ হল, দাওয়ার এক কোণে তার বুড়ো বাপ বসে আছে। আর সামনে কে একজন লোক তন্ময়ভাবে চোখ বন্ধ করে গান ধরেছে। হাতে কি একটা তারের বাজনা গুব্‌গুব্‌ শব্দ হচ্ছে। গায়ে তার হলদে রঙের অদ্ভুত-দর্শন এক ঝুলঝুলে বড় আলখাল্লা। মাথায় আবার ওই রঙেরই ছোপানো কাপড়ের পাগ্‌ড়ী বাঁধা। গলায় বুঝি এক গাদা কণ্ঠির মালা ঝুলিয়েছে, গানের দোলায় শরীর নড়ে উঠলে, সেই মালার রাজ্যেও লহর বাজে। এই গানই দূর হতে শুনতে পাচ্ছিল রঙলা। সরু মেয়েলী কণ্ঠে বিচিত্র এক প্রকার পুরুষালি ঢঙ। রঙলা কৌতূহলী হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মুদ্রিত-নেত্র গায়কের দিকে। চোখ বন্ধ থাকায় গায়ক সম্ভবত তাকে দেখতে পায় না। গানের সুর ঢেউয়ের ছন্দে উঠেছে নামছে। কিন্তু গায়ককে কোন-মতেই রঙলা চিনতে পারল না। কোনদিন দেখে নি। তাহলে হয়ত নবাগত এই অঞ্চলে।

সে তখন গাইছে :

মন, তুমি কি চিরজীবী—
ভেবেছ দিন এমনি যাবে
তোমার হৃদয়-পিঞ্জর করে শূন্য
প্রাণ বিহঙ্গম পলাইবে।......

অর্থ সব পরিষ্কার নয়। দেকো পুসির ভাষা। কিন্তু গানের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি জুড়ে একটা বেদনার স্পর্শ রয়েছে। যা রঙলার বুকের গুমোট মেদুরতার সঙ্গে একান্তভাবেই সাদৃশ্য পায়। ওদিকে

মেঘ জমে বেলা থাকতে দিন অকারণে গুম হবার যোগাড়। রঙলা আরেকবার নিবিষ্ট চিত্তে তাকাল গায়কের মুখের দিকে। গোলগাল সুডৌল চেহারায় ঢলঢলে মুখ। পাগড়ীর ফাঁক দিয়ে ঝুলন্ত লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত নামানো। বেলাশেষের চিক্রী আলোয় রঞ্জিত ললাট। এমন কান্তিময় সুদর্শন চেহারার পুরুষ সে খুব কমই দেখেছে জীবনে। রঙলা সহসা নিজ বুকের গহ্বর হতে উৎসারিত একটা ধ্বনি-কম্পন যেন শুনতে পেল। পরে স্খলিত পদক্ষেপে গুটি গুটি বাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বুড়ো রাখুয়া সর্দার হাত বাড়িয়ে মেয়ের হাত ধরল। সগু স্নানে শীতল শরীর রঙলার। টিপে টিপে হাসল সে মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে। কোন্ বেভুল তাড়সে কে জানে, বাওয়া সহবত ভুলে বাপের সামনেই মেয়ে চোখ তুলে স্পষ্ট তাকিয়ে আছে অচেনা ভিন্ জাতির পুরুষের দিকে। আবার দুর্বোধ্য এক আবেগে কেমন ঠোঁট কাঁপছে। বিহান রাতের পর গাড়ার পানিতে নাহালের শিস্ বাজে। তোপন করতে যা লাগেক লাই···। বলে তালুতে ঠেকানো জিহ্বায় টকাস টকাস শব্দ হয়। এ হল জাদানদেশের প্রায় সব মেয়েরই মুখের একটা লব্‌ঝি বাক্য। রঙলা এখন ঠিক বলে নি তোপন করার সেই ব্যাখ্যান। কিন্তু রাখুয়া সর্দারের না বোঝা থাকে না, রহস্যের হাঁকানি-ডাকানিটুকু। বাওয়ানী যুবতী মেয়ে, বাপও বাওয়া পুরুষ। মেয়ের মনের চঞ্চলতা বুড়ো পরিষ্কার বুঝল। হৃদয় রাজ্যে নিশ্চয় রোশনচৌকির প্লাবন উঠেছে, আর তাইতেই এই উদ্‌ভ্রান্ত বেভুল দশা তার। রঙলার গায়ের গন্ধ কখনো-সখনো তার নাকে কুন্তলার ঘ্রাণ আনে। কুন্তলা হল, রঙলার মৃতা মা। নীল চোখের ভাসমান চাউনি ছিল কুন্তলার। রঙলার আদল হয়েছে অনেকটা তার মায়ের মতো। সে মেয়েকে বাহু ধরে টেনে পাশে বসাল। চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে তখনো। রাখুয়া মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। অবশেষে

গায়কের পরিচয় দিতে আবার মুচকে হেসে জিজ্ঞাসা করল, এমন চেহারার কোন গায়েন সে আর কখনো দেখেছে কিনা?

এবার রঙলা এক পলক চক্ষু তুলেই মাথা নামিয়ে নিল। তারপর ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

রাখুয়া বুড়ো তখন খ্যালখেলিয়ে হেসে উঠেছে।—হাই গ, লাই। উয়াদির দেকো-পুসি ফুঙ্গি বলে। হিন্দু বাউল সন্ন্যাসী। তারপর মানুষটার নাম জানালে, পঞ্চানন।

মুদ্রিত নেত্রে বাউল তখন পদ ধরেছে:

ভাবো যে ত্রেতাকালে, দশাননের দশা কর স্মরণ,
যার দেবেন্দ্রিয় গাঁথিত মালা, যম বাঁধা যার অশ্বশালে।
ব্রহ্মা তারে দিল অভয়, করিল সে ত্রিলোক জয়,
রহিল না তার কোন অংশ, কালে ধ্বংস সবাই হবে।...

রঙলা চোখ তুলতেই আবার বাপের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বাপ তখনো টেপা হাসছে। বাপের হাসি দেখে মেয়ে ভীষণ লজ্জা পায়। ছি-ছি, গানের সুরে একেবারে ভুলে গিয়েছিল পরিস্থিতি। সহসা লাছলীর কথা মনে পড়ল। আজই সন্ধ্যাবেলায় লাছলী তাকে জংলাকাটার পাড়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি দিয়েছে, জিন্দগী ধরম, তুই কারো সাথ্ মোহব্বতি কর রঙলা। আরো নানা কথা একদণ্ডে মনে তোলপাড় করে নেয়। গায়েন তখন অন্তরার সুরে ঘুরে এসে কলি ধরেছে:

ভীম, অর্জুন, দুর্যোধন, যার হয় পঞ্চশত সহোদর,
কোথায় সে রাজা কংস, কোথায় বা সেই যোদ্ধবংশ
রহিল না তার কোন অংশ, কালে ধ্বংস সবাই হবে।...

রঙলা আরেকবার টুক্ করে বাপের দিকে দেখল। বাপ সেই মুচকি মুচকি হাসছে। এদিকে মরমে পাখা ঝাপটানিটা অব্যাহত আছে। অনুভবে নতুন একপ্রকার দগ্ধানির আনন্দ। এমন সময় চোখ মেলল বাউল। হাল্কা জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত সমগ্র অঙ্গন,

ধাপি। সেখানে খেটো কাপড়ের আবরণে-চলৎশক্তিহীন একখানি সুতনুপট। যদিও মুখের ডৌল খুব টানা-টানা নয়, তবু দেহের গড়নে, ছাপাছাপি স্বাস্থ্যে—এক টুকরো জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড মনে হয় যেন। আকস্মিকতায় আগন্তুক সাধু বুঝি ঈষৎ ভড়কে যায়। বেশ কিছু সময় ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে থাকে সেই বহ্নিমান শিখার দিকে।

রাখুয়া বুড়ো কাশল। পঞ্চানন চকিত হতেই, আবার হাসল বুড়ো। ওদিকে রঙলাও খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। দেখতে ভুল হয় নি, যখন তার চোখে চোখে তাকিয়েছিল ফুঙ্গি। অধরে শাওন নদীর কম্পন তুলছিল। শিরদাঁড়া জুড়ে হঠাৎ কেমন একটা শীতল অস্বস্তি অনুভব হল তার। এইভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি দাওয়া পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে গেল।

বুড়ো এবার স্মিত হেসে বাওয়ানী মেয়ের পরিচয় দিলে আগন্তুক মানুষটাকে।—মোর বেটী, রঙলা গ। বলে পিছনে ডাকল, মেয়েকে হাই গ, যাস লাই। শুন্যে যা কাথাটো। রঙলা ফিরলে, মেয়ের চুলে বিলি কেটে দিল রাখুয়া সর্দার। টিপে টিপে হাসল ফের কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ফুঙ্গিরে আজ ইখেনে থেকে যেতে কছি। জমা বানাতে হবেক জলদি-জলদি। খাবার করতে হবে। পারবি লাই? বলেই আবার সেই খ্যালখেলে হাসি।

বাওয়া ভাষায় এই রসিকতার নাম, জেমা মারা। বিয়ের আগে পাত্র ঠিক হয়ে গেলে, সব গুরুজনেরাই দেখা হ'লে প্রশ্ন শুধোবে, তাড়াতাড়ি রান্না করতে পারে তো মেয়ে? বাওয়া পুরুষ মাঠে-বনবাদাড়ে কাজ করে ঘরে ফিরেই খাদা ভর্তি আমানি ভাত খায়। নয়ত পাঁজা খানেক রুটি নিয়ে বসে যাবে নাস্তা করতে। তাই বাওয়ানী মেয়েকে চটপট রান্না শেষ করা জানতে হয়।

রঙলার ব্রীড়াবনত মুখে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমা হয়। আড়চোখে সে দেখতে পায়, বাউল তার পানে তখনো তেমনি মুগ্ধ

নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে। এমনিতেই লাবণ্যের দীপ্তিতে লোকটা অপরূপ সুন্দর, ভাসা ভাসা উদাস চোখের চাউনি ছড়িয়ে এখন তার মেয়েমনের সমগ্র অন্ধকার রাজ্যকে বিচিত্র এক প্রকার উথালপাথাল ডাকানিতে আমোদিত করে দিল। সে চোখ তুলল না। দাঁতে নখ্ খুঁটলো। কিচ্‌ড়ির প্রান্ত টানল, আঙুলে সুতো জড়াবার মতো ভঙ্গি করে। তারপর দৌড়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

চোখে খুব ভালো দেখে না, কানেও কিছুটা কম শোনে। কিন্তু আজ রাখুযা বুড়ো যেন দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। সব দেখছে, সব শুনছে। জলদে হেসে উঠল।

পঞ্চানন বোবা।

রাত্রে খেতে বসে পুনরায় তাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। ফুঙ্গি আর রূপবুনিয়ার কুঁড়ি ইল্‌কা।

বাওয়ানী ঝুমকোর, আর কখানা রুটি নেওয়ার পেড়াপীড়ির, জবাবে পঞ্চানন তরল গলায় হেসে প্রতি প্রশ্ন শুধিয়েছে, আমারে কি রাক্ষস পেইলা নিকিন গো তোমরা?

হাই! বাউলের কথায় বাপ মেয়ে দু'জনেই হেসে খুন হয়। ওকি কথা! মানওয়া কুংকারা, হবেক কেনে? নাকি, তা-ই কখনো কোনকালে ঘটেছে কোথাও?

রাখুয়া জিজ্ঞাসা করে, ইসিন্ কেমুন গ মোর হপন-এরার? রান্না কেমন আমার মেয়ের?

—অমর্ত। পঞ্চানন হাসে।

আবারো চল্‌কা হাসির ধুম পড়ে যায়। শহুরে আদপের বুলি। রান্না কিনা, হেবেল তোয়া!

এখন আর প্রথমক্ষণের সেই জড়তা সংকোচটা কারো নেই। উভয়ে উভয়ের দিকে সহজ চোখে তাকায়। হাসে, কথা বলে। পঞ্চানন মজার মজার কথা বলে। বাপ-মেয়ে দু'জনেই উৎফুল্ল হয়। শেষে পঞ্চানন যখন আমেজের প্রাচীরে গা ঠেকিয়ে উদ্গার তুলে

মন্তব্য করল, এমন খাওয়া বহুকাল খায় নি তখন রাখুয়া যদি চোখ পটকে হেসে রহস্য করেছে, রঙলা ছদ্ম বিরক্তিভরা চোখ ঠারল। ভ্রূ বাঁকালো। অকারণে বাসন নাড়ানাড়ির ঝংকার বাজাল একটু বেশী মাত্রায় আওয়াজ করে।

পঞ্চানন হাই হাই করে উঠেছে, আরে, বিশ্বাস করো। সত্যি কথাখান কয়েলাম গো। তারা আরো হাসে। আরো ছদ্ম উষ্মা প্রকাশ করে।

রাত্রির এই দ্বিতীয় প্রহরেও এতটুকু ঠাণ্ডার আমেজ অনুভব হয় না। ভ্যাপসা গরমে বরং অচিরে গা হাত-পা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে ওঠে। খাওয়া-দাওয়ার পাট সাঙ্গ হলে, রাখুয়া প্রস্তাবটা শোনাল। আর শুনে একবাক্যেই খারিজ করে দিল পঞ্চানন। তাই কখনো হওয়া উচিত? সে জিদ প্রকাশ করল, হলেই বা অতিথি, কথাটা তো বিবেচনা করে বলতে হবে? তারা রোজ যেমন শোয়, বাপ ও মেয়ে—আজো তেমনি, ঘরেই শোবে। পঞ্চাননের বিছানা বাইরের দাওয়ায় পড়বে।

রাখুয়া আপত্তি করল, সি হয় লাই গ, গায়েন। মোরা বাওয়া বটিস, জংলি মানওয়া। তুয়াদের মতুন শোহুরে লয়। কিন্তুন মোদির এট্টা রীতিনীত আছিক গ।

পঞ্চানন তখন রুখে বললে, তার চেয়ে এই রেতের কেলে আমারে তাড়িয়ে দাও, সর্দার। চলে যাই। না দিলে, অবশ্য আমাকেই শেষতক্ যেতে হবেন দেখছি।

অগত্যা পঞ্চাননের কথাই থাকে। এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা-পত্তর হয়। রাখুয়া ঘন ঘন জিব কাটে, আর ঠোঁটে চুক্‌চুক্ শব্দ তোলে। ওদিকে বাইরে অন্ধকারের শিকড় ধরে রাত ঘনাচ্ছে। বাপ মেয়েতে নিভৃতে চোখে চোখে সপ্রশংস ইশারা হয়। বাউলের কথা বলার ভাষাই যেন আলাদা। এত বিনয়, এমন সম্ভ্রমবোধ কোনদিনও কারো কথায় প্রকাশ পেয়েছে, এ তারা শোনে নি।

পরে গভীর রাত্রে দরজা খুলে একলা আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। রঙলা তিরিও-ধ্বংসার বোলপরণ যদি একবার ওঠে বাওয়ানী প্রশস্ত হৃদয়ে, সহজে থামে না তার গমক-মূর্ছনা। বাওয়া ভাষায় যার নাম, পিয়াস নিখার। অর্থাৎ, যে তৃষ্ণা গলার নয়, মনের।

পূর্ণিমা পক্ষের সময় চলেছে। আকাশ জ্যোৎস্নাধারায় অভিষিক্ত। রাত বাড়ায় বনপাহাড় নিঝুম নিস্তরঙ্গ। শুধু রাত-জাগা কিছু পাখপাখালির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আর কিচকিচ ডাকের শব্দ মাঝে মধ্যে শ্রুত হয়।

রঙলা দেখল, দাওয়ার নিচে অদূরে বাঁধা-বাঁশের মাচাঙের ওপর ঝুপসি কালকাশুন্দের ছায়ায় কে একজন অস্পষ্ট অশরীরী ছায়ায় বসে আছে। বাউল? কিন্তু এত রাত অবধি ঘুমোয় নি কেন সে? মগ্ন চৈতন্যে পিছন ফিরে নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে আছে দূর ধূসরাভা দিগন্তের পানে। কি বুঝি ভাবছে! কাছাকাছি পৌঁছে সে ডাকল, ফুঙ্গি!

পঞ্চানন তাকে আসতে দেখে নি। চমকে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরল। বাওয়া বস্তির মাঝ রাত্তিরের চিংড়ি মেয়ে। এমনিতেই স্বল্প বসন পরার রেওয়াজ, এখন একটা আলুথালু ভাবের ফলে, আরো অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অবিন্যস্ত চুল মুখ-চোখে ঝাঁপানো। —টুপাছে লাই কেনে গ, হঁ? ঘুমাস নি কেন? তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে ধরা-ধরা গলায় প্রশ্ন করল রঙলা।

—ঘুম আসছে না যে।

—কেনে গ। হাই, হছে কি? আঁচল খসে সুপুষ্ট শরীর তার দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চানন চোখ নামালো। কোন কথা বলতে পারছে না। ভিতরে জিহ্বা শুকিয়ে আসছে। রঙলা আবার জিজ্ঞাসা করলে, হছে কি, হাঁ?

বাউলের হাতে তখনো গুপীযন্ত্রখানা ধরা আছে। আনমনা তার দড়ি টানল। টুংটাং শব্দ হয়। রঙলার উদ্দাম শরীরের উত্তাপ মুখমণ্ডলে, স্নায়ুতে ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। সে প্রথম কয়েক মুহূর্ত দিশাহারার মতো থম্ ধরে মাথা নিচু করে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে, রঙলার চোখে চোখ পেতে, উদাস প্রশান্তভাবে তাকিয়ে থাকল।

পঞ্চাননের ওই দেখায় যেন কিছু আছে। রঙলা এবার ফিস-ফিসয়ে শুধোলো, কি, দেখিস কি মোর দিকি? হঁ গ?

—কিছু না। তার গলার স্বর কাঁপল, ঠোঁট ফুলল। বোঝা যায়, অনেক কথা একসঙ্গে বলতে চায় ফুঙ্গি, কিন্তু কোন্ এক দুর্বোধ্য আবেগে বার বার বেসামাল হয়ে পড়ছে।

রঙলা এখন পুরোপুরি রূপবুনিয়ার কুঁড়ি ইল্‌কা। বিচিত্র ভঙ্গিতে কথা কওয়ার সঙ্গে বাতাসে গায়ের কাপড় উড়ছে সরসর করে। সঙ্গে চোখ-ভুরু নাচানি আছে। প্রথম দিনের আলাপেই যে রঙলা এতখানি মুখরা হবে, তার নিজেরও কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন তার বুকে, সন্ধ্যাবেলায় জংলাকাটার পারে লাছলী তাকে যে নেশার মন্ত্রটা শুনিয়েছিল, সেই সুরভিত ভাবনার অদৃশ্য-পায়ের হামাগুড়ি শুরু হয়েছে, টের পেল। তবু যেহেতু পঞ্চাননের কথায়, চাউনিতে একটা বিষন্নতার স্পর্শ লাগে, রঙলা ততো উতরোল হয় না। সে ধীরে ধীরে পঞ্চাননের গা-ঘেঁষে উঠে বসল মাচার ওপরে। একটা হাত ধরল তার। তারপর-নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তুয়ার ঘর কুথাকে ফুঙ্গি? কে কে আছে আর তুয়ার?

—কেউ নাই গো আমার মেয়া। ঘর বলেও কিছু নাই। পথে পথে ঘুরে বেড়াই, তাইতেই আমার আনন্দ।

—হয় লিকিন? সি কি খেয়াল গ?

—কেন, এমন আর কাওরে দেখ নাই?

—দূর পাগল। এমুন আর কেউ হয় লিকিন ?

হা-হা।—হয় না ? যাক্, আমার কথা বলি। কেউ নাই গো আমার। তাই তো আমি বাউল। বাউরা।

পঞ্চাননের গলার ব্যঞ্জনা, এখন আরো গাঢ় দাগের। সেই স্বর-চেতনায় রঙলার চকিত হাসি থেমে যায়। তখন পঞ্চাননের ঠোঁট যে লয়ে কাঁপল, রঙলারও সেই মাত্রাতেই ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

পঞ্চানন হাত তুলে নদীর দূর অপর পারের দিকে নির্দেশ করলে।– হুই, ওখেনে গেছ কখনো ?

—শোহুর ?

—হুঁ শহর। ওই শহরে থাকতাম আমি। তা, সে ঘরটো একদিন ভাঙে গেল গো।

—হাই! কেনে গ, ভাঙল কি কর‍্যা ? বানে লিকিন ?

—হুঁ। এক রকম তাই বলতে পারো। পঞ্চাননের গলা খাদের শেষতম ধাপে বাজে।

হাসি তার আগেই থেমেছিল, রঙলা এবার আরো নিভে গেল। চিকচিকিয়ে উঠল দু' চোখের কোল। বড়দের মুখে বাওয়া জাতের অনেক বিপর্যয়ের কথা শুনে থাকে অপেক্ষাকৃত নবীনরা। নদীর পাড় ভাঙা, সেই দুঃখজনক ঘটনার একটি। স্বতঃই, রঙলার চক্ষু এ সংবাদে অশ্রুম্লান হয়ে যাবে।

স্থির অচঞ্চল রাত্রি। ঝিঁঝি ডাকছে। বাইরে বনপ্রদেশে-প্রত্যহকার মাতামাতি চলেছে। গাছগাছালির ডালপালা দুলছে, যেন ভূতের হাতের খটখটি বাজনা বাজছে।

রঙলা পঞ্চাননের আরো ঘনিষ্ঠ হল। তার উদ্ধত বক্ষে পঞ্চাননের কনুই লাগল, বাহু ছুঁয়ে গেল। রোমাঞ্চ শিহরণে উভয়েরই চমকিত হবার কথা, কিন্তু এখন কেউই সেদিকে হুঁশ করল না। সে ফুঙ্গির একটা হাত নিজ মুঠোয় তুলে নেয়। নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে সেই হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এক সময়

বললে, এট্টা এনাই গ, ফুঙ্গি। একটা মিনতি চুবুল কর্, রাখ্‌বি। শপথ কর্।

—ওয়াদা। বঙ্গা কসম।

—ইখেন ছেড়ে যাবি লাই কোথাও। বলেই কি মনে হয়, তাড়াতাড়ি লজ্জা মিশ্রিত অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয় বাওয়া মেয়ে।

—আছিই ত। পঞ্চানন কাঁপা কাঁপা হাসে।

—হুঁ। কিন্তুন শুধু মিংটা-বায়েরা মাহা লয় গ। এক-দুদিন নয়, ঘায়যুগ। চিরকাল।

যে কারণে সব ছেড়ে সে পথের ধুলায় বেরিয়েছে, পিছনের সেই আকর্ষণই আবার যেন তাকে সামনে টেনে নিয়ে চলতে চায়। পঞ্চানন এখন বিহ্বলতা কাটিয়ে কেমন আঁকপাঁকু করে উঠল। তারপর ক্রমে স্থিতিশীল হয়ে, উদাস চাহনিখানা আগের মতো রঙলার মুখের ওপর বিছিয়ে ধরে চুপ করে থাকল।

রঙলা এবারে বাওয়া মেয়ের সহজ হাসিতে কণ্ঠ ভরালে। ফুঙ্গির বলার ঢঙে মনটা সহসা কেমন উধাও হয়ে গিয়েছিল। চট্‌কা ভেঙে, হাল্‌কা রসিকতায় পুনরায় ভ্রূ দোলালে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, কি দেখিস্ এত্ত মোর দিকি, আঁ? মেয়ামানুষ আর কুনোদিনও দেখিস লাই লিকিন গ, হাঁদে? বলে তার গায়ের ওপর যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ল।

পঞ্চানন জড়োসড়ো হল।

রঙলা খিলখিলিয়ে হেসে সরস মন্তব্য করলে, থোইলা মানওয়া কাঁহিকা। হেংলা কোথাকার। বলে পিড়পিড়িয়ে আরো গায়ে টানল তাকে। পরে আবেগ ভরা আবেদনে বলে উঠল, তু ওড়া হারায়েনচিস ফুঙ্গি, ই ঘর তুয়ারে দিতি চাই। মেকদার থাকে ত ল্যে গ। এই কথার সঙ্গে তার গলায় আর স্বভাবমতো চঞ্চল হাসি খেলল না। বরং কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে। তার ঝারিভাঙা

রুক্ষ চুল উড়ে গিয়ে পঞ্চাননের গালে চিবুকে লাগল। নিঃশ্বাসে গরম ঘন বাতাস বইছে। মুখের কাছে মুখ, কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও যখন ফুঙ্গি সংকোচের কুঁকড়ানি ছেড়ে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হল না, কিছুটা বিরক্ত বোধ করল বুঝি সে।

—ভয় পেছিস লিকিন ? জিজ্ঞাসা করল আস্তে আস্তে।

—না।

—তবে এট্টাও কাথা কচিস লাই কেনে গ ?

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি ইতিউতি তাকাল। উসখুস করল। তারপর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কি হল, আর্ত কাতরতায় এক দমকে বললে, আখুন ঘরে যাও মেয়া, রাত অনেক হল। কেউ দেখলি—

রঙলা যেন তখন থমকে গেল কোন কাজের মুখে। অনেকটা সময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে সক্রোধ বিরক্তিটা সম্ভবতঃ প্রবল হয়ে কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠল, ঠোঁটের পাতা ফুলিয়ে ঝাটকানি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।—দূর, মর, বত্‌রি মর্দানা। ভীতু পুরুষ। বলেই আর দাঁড়াল না।

পঞ্চানন পিছনে ডাকল, তুমি আমার উপর রাগ করলা বাওয়া মেয়া ?

রঙলা এখন অনেক সংযত। তবু চরিত্রানুযায়ী নিজেকে একেবারে বাঁধতে পারল না। শ্লেষাত্মক গলায় বললে, তুয়ারে ঠিক মালুম কব্যা নিছি গ, পাচ্চো। মুখে ছোকান বুলি বুললে কি হবেক, আসলে তু এট্টা—। এই পর্যন্ত বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ে এক ছুটে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

পঞ্চানন পিছনে স্থাণুর মতো থেমে রইল।

এর মধ্যে এসে পড়ল আহেলা চাঁদোর তুরুই জুমবাড়ি দিন। আষাঢ় মাসের ষষ্ঠি তিথি।

হিসাবটা রাখা হয় জেটবেঙ্গা মাস থেকেই। প্রথম পনেরো দিন যায় সেকা রাত্রি। পূর্ণিমা। ঝকঝকে আলোয় দূরের মাঠ প্রান্তর, তুহিনার ধারা রুপোর পাতের মতন জ্বলে। তারপর আরম্ভ হল ইউৎ-ইন্দা। অন্ধকার রাত্রি। ক্রমে মিৎ-বার-পে-পোন্-মোড়ে হয়ে তরুই জুমবাড়ি দিন। উৎসবটা হবে আরো তিনদিন পর। এয়ার-ইরাল-আরে হয়ে গেল্ দিনে। দশমী তিথিতে।

আকাশে বজ্র বাজবে, বিজলী চমকাবে। কখনো মেঘ ঘনিয়ে ঝড় উঠবে। তারপর আবার নীল নিঝুম বনান্তরের আকাশ রোজকার মতন রামধনু আঁকা পড়ে। দেওতা পুরকন হল, বঙ্গা মহাদেও-এর আরেক নাম। দৃষ্টিতে যাঁর সংহার ও বরাভয়ের লীলা। বাইরের প্রকৃতির মতোই খেয়ালী প্রমত্ত-চরিত্র দেওতার। এই হয়তো হাসছে খুশীর ঝন্ঝনা, তারপরই অট্টরোল তুলে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়ে জুড়ে দিল। এই অর্থেও এই মাসে, এই তিথিতে বঙ্গার আরাধনা ব্যঞ্জনাময়।

দেওতা পুরকন!

দেকো পুসিরা পূজা করে শক্তির আধাব দেবী চণ্ডিকার। বিপদ তারিণী। বাওয়া মানুষেরা করে তার প্রথম ক্রিয়াকলাপটুকু। বেল-বরণ। এই তিথিতেই দেবী যৌবন ধর্মে অশুচি থাকেন। 'অম্বুবাচী' বলে তাকে দেকো পুসিরা। আগুনে তৈরি কোন রান্না খাবে না। বাওয়ারাও খায় না। অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হবে ওই ষষ্ঠীর দিন থেকে। নিবৃত্তি গেল্ দিনে। দশমীতে।

শীত শেষ হয়ে চৈইত্-বেঙ্গার আকাশে সেই যে কবে থেকে সিই-চাঁদোর প্রচণ্ড ঝলকানি আরম্ভ হয়েছিল, তারপর মাঝে সেলু মাস, জেটবেঙ্গা গেছে—এতটুকু মন্দীভূত হয় নি উত্তাপ। গরম যেন তরল ধারায় গড়িয়ে পড়েছে তামাটে বর্ণ আকাশের গা থেকে। দূর নিকটের মাঠ-প্রান্তর পুড়ে সবুজাভা মরে পিঙ্গল রঙ চেহারা নিয়েছে। চাষের ক্ষেত ফেটে চৌচির, চিত্র-বিচিত্রিত।

রঙ্গিণী নদীর ধারাতেও প্রবল ঘাট্‌তি। অবশেষে বর্ষা এসেছিল নবীন বাজনা বাজিয়ে। অদূরের খড়ি ডুংরীর মাথায় প্রথম মেঘের হিলিবিলিতে চকমকি আলো জ্বেলে শেষে ডেরা-ডিহি-ভাসিয়ে অবাধ বর্ষণ-আরম্ভ হয়েছিল। মজা গাড়া, পুক্‌রী—সব ভরে টই-টুম্বুর হয়ে উঠেছে। সেদিক দিয়েও দেওতা পুরকনের পূজা অর্থময়। দারুণ উদগার (গ্রীষ্ম) ভোগের পর শারীরিক ক্লেশ নিবারণের সঙ্গে মাঠে এবারে নেমে পড়বে চাষী। রাসুজ্‌নি ফসলের চারা জল পেয়ে অঙ্কুর ছড়িয়ে মাথা ঝাঁপিয়ে উঠবে। পুরকন বঙ্গার পুজো, বীজ বপনের উৎসবও বটে।

সন্ধ্যার পরই নদীতীর কাঁপিয়ে সেই ঝাঁই ঝপাঝপ্‌ শব্দ ওঠা আজও বন্ধ হয় নি। সঙ্গে নাকি-গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে মেয়েলী কণ্ঠে খোনাস্বরের কান্না। তবে যদিও খুব নিয়মিত শ্রুত হয় না ওই শব্দ বা কান্না, বেশ কয়েকদিন হয়তো চুপচাপ গড়িয়ে গেল, তারপরই হঠাৎ একদিন সকলকে সচকিত করে সেই ধ্বনি-কম্পন আরম্ভ হয়। সঙ্গে নাকে কাঁদুনি। শহর থেকে পুলিস এসেছে, সতর্ক পাহারা-চৌকি বসেছে চারিদিকে ঘিরে। এত আয়োজন, উদ্যোগ, তবু কিছুতে যেন কোন ফলোদয় হবার নয়।

এ কদিন মুরুব্বি সমানে প্রচার চালিয়েছে। যে কোন ব্যাপারে ডমরুর ক্ষিপ্ত হওয়ার পক্ষে একটা মাত্র কারণই যথেষ্ট ডমরু ওই প্রসঙ্গ ধরে তার স্বভাবমতো লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে একশা করেছে। —হেঁ, হেঁ, কয়্যাচিলম্‌ লাই? আসমানে আখুনো ইন্দা-চাঁদো, সিই-চাঁদো উঠে গ। হয়েদা বয়। সডোঃ-র বুকি দাঃ। চন্দ্র-সূর্য ওঠে। বাতাস বয়। নদীর বুকে জল। বেইমানীর সাজা মিলবিক লাই শালোরা? বঙ্গা কি কাঁড়া লিকিন? কানা? শাপমন্নি নয়, রীতিমতো অভিসম্পাত করা যাকে বলে। যাতে করে লালকুঁয়োর বনস্থলি ভয়ে সারা হয়েছে।

এবার উৎসবায়োজনে বিশেষ করে ঠিক হল, ওই সব অমঙ্গলে

হাঁকডাক বন্ধ করার জন্যে এল্লা-বঙ্গা মহাদেওয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকারে প্রণতি জানানো হবে। গ্রামসুদ্ধ লোক উপোস করবে সাব্যস্ত হল। সাধারণত মেয়েরাই উপোস-পালা যা কববার করে। এবার পুরুষেরাও সামিল হল। দত্যিদানো কিছু নয়, অথচ শরীরী কেউও নয় আবার। অদ্ভুত এক রহস্যময় কাণ্ড।

একসঙ্গে গলায় বাঁধাবাঁধি অবস্থায় দশটা কাড়া বলি দেওয়া হবে। তাজা রঙের স্রোত বয়ে যাবে। শেষে, সেই রক্তে প্রসাদি অর্চনা হবে। গ্রামসুদ্ধ মানুষ সন্ধ্যায় রোজা ভাঙবে ওই প্রসাদ ভক্ষণ করে। অবশেষে সারা বাত্রি বঙ্গা পুরকনের থানে অতন্দ্র নিশি জাগবে দেহাতী জাদান সন্তানের দল। নিশি জাগাটা বঙ্গা পুরকনের পূজার অন্যতম নিয়মবিধি। প্রতিবারই এ নিয়ম পালিত হয়। এবারে ঠিক হয়, গ্রামসুদ্ধ সকলে জাগবে। যেমন সবাই একযোগে উপোস দেবে।

এই রাত্রি জাদান জীবনে সবচেয়ে কামনার রাত্রি। পাপক্ষয়ের জাগর রাত। পুণ্যের রাত্রি। আবার ভয়েরও রাত্রি এটা। এই দূর শালঘেরিয়ার জঙ্গল-সীমানায় এই পূজা উপলক্ষে একজন মানুষ খুন হয়। প্রায় ফি-বারই হয়। এটিও এক আশ্চর্য এবং প্রায় অলঙ্ঘনীয় কানুন, এই পূজার। বাওয়া বাসিন্দরা যদিও এই কাণ্ড-কারখানাকে বলে, একজনকে আপন কোলে টেনে নেন দেওতা, এই দুনিয়ার মধ্যে যাকে তাঁর সবচেয়ে অপছন্দ। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা, খুন-ই।

গ্রামসুদ্ধ সকলেই প্রায় সজাগ থাকে। জোয়ানের দল তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁচাবাঁচা করে ফেরে। তবু কি অবাক কাণ্ড, খুনটা হয় নিয়ম নির্দিষ্ট পথে। কোন দৈব-দুর্যোগে মরা নয়, কিংবা রোগে ভোগে। তাজ্জব আরো, আততায়ী কোনদিনও কখনো ধরা পড়ে নি। পড়ে না।

কখনো সখনো দু'একবার নেহাতই যেবার অঘটনটা ঘটে না,

ফস্‌কে যায় শিকার, বলা হয়, দেওতার থানে সময়মতো পাওয়া যায় নি নির্ধারিত বলি। অর্থাৎ, হত্যা যার কপালের লিখন ছিল।

বিগ্রহের খুব একটা কাছাকাছি না হলেও, চৌহদ্দির মধ্যে খুনটা হয়। জমায়েতের কোন ঝোপে-ঝাড়ে, ঢিবির অন্ধকারে, কিংবা কোন জলা-দাম জঙ্গলে। কোথাও কোপাই দিয়ে, কখনো খুনিয়ায় বিদ্ধ করে, অথবা গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মাটিতে মুখ রগ্‌ড়ানো হয়ে মরে পড়ে থাকে।

সুতরাং এই জাগর পুণ্য তিথিতে বঙ্গা পুরকনের হাতছানিকে একদিকে যেমন উপেক্ষা করতে পারে না জাদান বাসিন্দা, অপরদিকে প্রতিমুহূর্ত তাদের তীব্র এক অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হয়। কখন সংঘটিত হবে ব্যাপারখানা? এবং কার কপালের লিখন আছে এ যাত্রায়?

পূজার আয়োজন যত নিকট হয়, লালকুঁয়োর বনরাজ্যের আকাশ-মৃত্তিকা ততোই এক বিচিত্র উচাটনে মুখর হতে থাকল। আর এই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রুক্ষ প্রান্তরের বনবাদাড় ভেঙে মুরুব্বিও। সে সমানে দেবতার নাম করে সকলকে খিস্তি-খাবুদ করে যায়।

গাঁ-লালকুঁয়োর এখন আরেক চেহারা। তাই পূবপাড়া ছাড়িয়ে পোয়া-ক্রোশ খানেক দূরে, নদীর তীরে খোলা মাঠের চত্বরে, বুড়ো বেল গাছের নিচে আসর পড়ে এবারের পুজোর। জায়গাটা উঁচু-নীচু মতো স্থান, মাঝে মাঝে টিলা-ঢিবি থাকলেও, নুড়ি পাথর আর বেলে মাটির প্রান্তর। পিছন দিকে যদিও কোমর-ডোবা জংলাদাম ঝোপ। বেঁটে ঝাঁকালো পিয়াশাল, মহানিম গাছের প্রাচুর্য।

পুজোর থানের গাছের গুঁড়িতে রাখা আছে, কিছু ছোট-বড়-মাঝারি আকারের পোড়ামাটির কান উঁচোনো ঘোড়া-হাতি। আর ক'খানা, লিঙ্গাকৃতি কালো কষ্টিপাথরের শিলাখণ্ড। বড় একটি কাষ্ঠকালিতে সিঁদুর তেলে তিনটে বড় বড় চোখ আঁকা হয়েছে। দু'টো দু'পাশে, আর একটা ঠিক দুই ভুরুর মাঝে কপালের ওপরে।

মাঝে কালো মণির চিহ্ন দেওয়া। অপলক আরক্ত চোখে যেদিকে তাকাচ্ছে বিগ্রহ যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সব এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে পড়ে নিচ্ছে।

পুজোপাট বাওয়া ধর্মের অনুশাসন মতো। কিন্তু আদিবাসী আরণ্যক জীবনে সকল আনন্দের অংশীদার সেই বন-প্রদেশের বাসিন্দা তাবৎ মানুষ। এখন তো আগন্তুক মানুষের স্রোত আরো বেড়েছে। বিহারী মহল্লা, তেলেঙ্গানা বস্তি সর্বক্ষণ লোক সমাগমে জম-জমাট। অতএব পূজা উপলক্ষে চমৎকার একটা মেলাও বসে যায়। মনিহারী সামগ্রী এবং খাবারের দোকান। টুকিটাকি সওদার মতন ছাউনি-চালা কিছু।

হঠাৎ খেয়াল হল সকলের, পাড়াঘরের সবাই এসেছে, আসে নি কেবল একা মুরুব্বি। তবে কি তার ওপর দিয়েই গেল নাকি চোট্টা? গঙ্গা কাছে টেনে নিল তাকে? এক ভয়ংকর শীতল ভাবনায় সকলে একটুক্ষণ থতিয়ে যায়। এটা পরিষ্কার, মুরুব্বি অন্তত আজকের এই দিনে মেলা প্রাঙ্গণ ছেড়ে সহজে অন্য কোথাও যাবার পাত্র নয়। এদিকে ইতিমধ্যে রাত ঘনিয়ে উঠেছে বেশ। স্তরে স্তরে শিশির বিন্দু জমছে ঘাসের ডগায়। তুরগুম তুরগুম করে পেঁচার সারি ডেকে চলেছে দূর নিকটের গাছের চুড়োয়। অন্যান্য রাতজাগা পাখ্‌পাখালির ডানা ঝাপটানোর শব্দ আসছে।

বুড়ো সর্দারদের গলা রা না-ফোটার অবস্থায় পৌঁছুলো। পট্টির উদোম ন্যাংটো ছেলেগুলো পর্যন্ত প্রত্যহকার হৈ-চৈ, চেঁচানি ভুলে বেবাক্ চুপ। তারা ব্যাপারের বোঝে নি কিছু ঠিক, কিন্তু বয়স্ক সকলের অস্থিরতা দেখে সর্বনাশা অমঙ্গলের সংবাদটা কিভাবে যেন আঁচ করে নিয়েছে।

এমনি সময়ে সহসা দিগন্ত কাঁপিয়ে অদূরে নদীর কিনার ভাঙার শব্দ হল, ঝুপুস ঝাঁই। গাড়া তুহিন। প্রতিদিনকার তাড়না মাফিক

পাড় ধামসাচ্ছে। বাতাসে সেই উত্তপ্ত চাপা আর্জি। কেউ যেন নাকিসুরে কাঁদছে ওই সঙ্গে।

স্বভাবতই এরপর ডুকরে উঠবে প্রত্যেকে। এত পূজা-পার্বণ, আবেদন-নিবেদনের পরও রোষ কমলো না দেওতার, তুষ্ট হল না? মুরুব্বিকে নিল, তবু বন্ধ হবার নাম নেই অশরীরী কাঁদুনি।

মুরুব্বিকে না পাওয়ার সংবাদ ক্রমেই যখন সর্বত্র লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং অবিলম্বে তার ধড়ের খোঁজ আরম্ভ করবে সকলে ভাবছিল, সহসা পাড় ভাঙার আওয়াজ উঠে মাথা-টাথা সবাইকার একেবারে গুলিয়ে দেয়। এখন হঠাৎ কার যেন প্রথম খেয়াল হল, শুধু মাত্র মুরুব্বি নয়, গুণিনও নেই। জমায়েতে গর-হাজির সে অনেকক্ষণ থেকে। তখন ব্যাপারটা আরো কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সদরের পুলিসে পুলিসে ছয়লাপ এবারে চারিদিক। সতর্ক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতা। তবু কিছুতে যখন কিছু রোধ হল না, দুড়দাড় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে। চিৎকার, বচসায় তুমুল কাণ্ড।

আশ্চর্য, এমন ঘটনা বুঝি কখনো কোনদিনও ঘটে নি তাদের জানাশোনা সময়ের মধ্যে। দেওতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে জাদান মানওয়া এমনভাবে আর কখনো বিফল হয় নি। বরং বিপরীতটাই এতাবৎ ঘটে এসেছে। এই মুহূর্তে বুরনকে পাওয়া তাদের অতি জরুরী হয়ে উঠল এইজন্য, সে-ই গুণে গেঁথে প্রথম ফতোয়া দিয়েছিল, 'নাওয়া' দিন আসছে দুনিয়ায়। নীলবান দেশের মানুষকে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। আর তা না করলে, নিজেদেরই ঠকার পাল্লা ভারী হয়ে উঠবে দিনে দিনে। যে কারণে, তারা মুরুব্বির সাবধান বাণী হেলাফেলা করেছে। পাগলের প্রলাপ বলে হাসি মস্করা করে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন তাদের প্রশ্ন: বঙ্গার পূজাপাটে কোন ফল দর্শাবে না, বাওয়া মানওয়ার উথাল-পাথাল ব্যাকুলতা বেড়েই চলবে দিনে দিনে—একেই কি গুণিন 'নাওয়া' দিন বলেছিল, এবং

এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুহিনার পাড়বাসী দেহাতী মানুষকে উপদেশ দিয়েছিল, সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য? কি হিসাবে সে ওই মন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করেছিল? দেশ-গাঁ, রাখের ইজ্জত—সব বিলিয়ে দিয়ে তার কি ফয়দাটাই বা হল? বাওয়া প্রাচীন অনুশাসন তাদের কোন্ ক্ষতি করছিল? গুণিনকে বিশদভাবে আজ এর জবাবদিহি করতে হবে।

এদিকে বুরন ছিল একটা ঝোপের আড়ালে। বাস্তবিক তার অবস্থা আজ রীতিমতো সঙ্গীন। আগের কথা তো নিশ্চয়ই, এমন কি পরবর্তী দিনেও বিহারী রেজাবস্তির কুলিরা যখন বলেছিল, এ কান্না দানো সাহেবের, পরে যদিও তা ভুয়ো প্রমাণিত হয়েছে, সে তাচ্ছিলোর হাসি হেসেছিল। তারপর যে বিধান জারি করেছিল, জাদান বা সন্দারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করেছিল। বিশ্বাস করেছিল, তাব আপ্ত নির্দেশ। গাঁ-জেরাতে সম্মান ভারী। কিন্তু এখন সব ভূলুণ্ঠিত হয় দেখে, গুণিনের এই নির্জনতা বাসের চেষ্টা। ব্যাপারটায়, সত্যিই কোন কূল-কিনারা পাওয়া যেন ভার! সত্য আরো, বাওয়া জাবনের অনেক কিছুই আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। নীলবান দেশের বহুতর সুখ-আনন্দের ছবিগুলো। বর্ণালী জ্যোৎস্নার নিবু নিবু আঁধারে আগের সেই সুর, সেই গান আর ধ্বনিত হয় না। কিংবা তুহিনার লঘু চলায় সেই তুলকি তরঙ্গাভিপ্রেত। ডমরু চেঁচায়, সব রাপুৎ যাবেক কয়্যা দিলম। সত্যি, তাই যেন আজ যেতে আরম্ভ করেছে। ইত্যাদি নানান ভাবনায় বুরনের মাথার আর ঠিক নেই। সে ঝোপের মধ্যে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে কেবল বিড়বিড় করছিল, আর সন্ত্রস্ত নয়নে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। এই সঙ্গেই কেমন আরেক দুর্বোধ্য ভাব মনের মধ্যে মুহুর্মুহু কষান হাঁকাচ্ছে। আর ততোই অজানা এক অনুসন্ধিৎসায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে তার দু'চোখের দৃষ্টি।

এতকাণ্ডের পরও যখন কোনই ফল লাভ হল না, অচিরেই

সমগ্র বনরাজ্য জুড়ে হৈ-চৈ, চেঁচামিচি, ব্যস্ত সোরগোল পড়ে গেল। 'ওঁয়াদের কাহিনী' লালকুঁয়োর বনসীমানার অচিন গল্প কথা নয়, ধরেই নিল সকলে, তেমনি একজন কারো উপস্থিতি ঘটেছে এই পাহাড়-বনের মুলুকে।

ওদিকে গুণিনও ইত্যবসরে ধরা পড়ে যায়। বুরনকে দেখতে পেয়েই সকলে চেপে ধরল, জবাবটো দে। ই সব কি হছে বটিস ?

থতমতো খেয়ে বুরন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হুঁ, কব, কব। সব কব। রাতটো শেষ হ'তি দ্যাও আগে। দেখে শুনে নি। বলে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাতে থাকল মেলার চারিপাশে। কি যেন খুঁজছে সে আঁতিপাঁতি করে। কুঞ্চিত ঠোঁটের কোনায় তার অস্পষ্ট হাসির ঝিলিক। আজ রাত্রের খুনের কথা সে ভাবছে। খুন হল শেষে মুরুব্বি। বঙ্গার সবচেয়ে অপ্রিয় মানুষ তাহলে সে ছিল বলতে হয়। অথচ বঙ্গার উমেদারী সে-ই কিনা করত সর্বক্ষণ।

ভিড়ের মধ্যে বুরনের এই ভাবান্তর অনেকেই লক্ষ্য করল। ঝুমনিও করে। সন্ধ্যার পর একবারও পাচ্চো আজ তাকায় নি তার পানে। খুনসুটির একটি কথাও বলে নি। গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে আসে নি। ঝুমনি আশেপাশে তাকায়। কেউ নেই দেখে অতঃপর টুপ্ করে এগিয়ে গেল সম্মুখে। বুরনেব হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে, হেই গ, অমুন করিস কেনে ? কি, হছে কি উসব, আঁ ? জয়ঢাকের মতন উঁচু পেট হয়েছে ঝুমনির। আট মাসের বাচ্চা তাইতে। অল্প কথায় হাঁপ এসে যায়। বড় বড় নিঃশ্বাস টানতে থাকল সে।

বুরন যেন আচমকা একটা খোঁচা খেয়ে গোঁত্তা মেরে উঠল।

ঝুমনি আবার টেঁটিয়া স্বরে জিজ্ঞাসা কবল, আরে জ্বালা, হছে কি তুয়ার ? সিটো বলবি ত গ ?

—কিছু লাই। চুপো যা আখুন। বিরক্ত করিস লাই।

এট্টা বাত্ ভাবতাছি। হাতটা ঝুমনির মুঠি-মুক্ত করে দাবড়ে উঠল গুণিন। গলা তার আশ্চর্য রকম গোঙা গোঙা শোনাল।

বিধবা রেণ্ডী মেয়েমানুষ সে। স্বামী 'খেয়ে' পাঁচ ভাতারি নোলা তার। তবু বাওয়ানী মেয়ে বলেই বুঝি মনের সুকুমার দিকটা একেবারে নিঃশেষে খতম হয়ে যায় নি। শুধালে, তা বাত্টো কি ? সিটে ত বুল্বি গ। ভয়ের চেয়ে রাগই তার চোখের পাতায় ঝিকমিকিয়ে উঠল বেশী করে। ধমকালে, পাগল হ'লি লিকিন ছাই শেষে ?

বুরন পলপলিয়ে ফ্যাকাশে হেসে উঠল। চোখ নাচালো তিড়িং বিড়িং। ফিসফিস করে পরে আবার বললে, হুঁ, মন বলছিক রি, মুরব্বিটো আখুনো মরে লাই। বাঁচ্যে রছে। ছোক্লাটো দিখ্তি পাব মো। মৃত্যু পর্বটা।

—ছোক্লাটো ?

—হুঁ, যিটো হবেক আজ রেতে।

ঝুমনি যেন শিহরণ পেল শরীরে।—কেনে, তু দিখতে পাবি কেনে ? তু বঙ্গা লিকিন ?

—লাই গ। কিন্তুন মন বুল্চিক। বুরন আবারো তেমনি চোখে তাকাতে থাকল চারিদিকে। তীব্র কৌতূহলে তার দৃষ্টির ধরন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাল।—হুঁ, পাব। জরুর পাব। চাপা সানুনাসিক উত্তেজনায় সেই কথা কেমন যান্ত্রিক ধ্বনির মতো শোনাল। ঝুমনিকে নয় শুধু, নিজেকেও যেন বিশ্বাস করাতে চাইলে সে ওই প্রসঙ্গে। আবার বলল, দেওতার কিরা, পাব। হুঁ।

ঝুমনি সরে গেল। চারিপাশে এখন চেনা মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে। এখন বাওয়া অনুশাসনের প্রশ্ন আসে। বেড় বাঁধ রেকায় নয়, বঙ্গা পুরকনের থানে তারা উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় গণ্ডির আওতাধীন।

ঝুমনি সরে যেতেই বুরন হাঁটা ধরল। পুব ধারের ঢিবি জঙ্গলের

দিকে প্রথমে। ঘন অন্ধকারে কিসের একটা শব্দ পাওয়া গেছে ওই পথে। খানিক এগুতেই বুঝতে পারল, একজন মানুষ। মনের মধ্যে অমনি তার আছাড়ি-পিছাড়ি বাড়ি পড়ল। কে লোকটা? কি করছে, এই শালঘেরিয়ার অরণ্যের মাঝে একাকী? ত্বরিত পায়ে এগুলো সে আরো কিছুটা। দ্বিগুণ উত্তেজনায় উন্মাদের মতো ঠেকে নিজেকে। জিব ঝুলে পড়ে লক্‌লক্‌ করছে। সারা শরীর ঘামে জবজবে। আরো নিকটস্থ হতে দেখল, হাই কপাল। একজন পাহারাওয়ালা। হাতে লাঠি নিয়ে চৌকী দিচ্ছে ঘুরে ঘুরে।

না, এ মানুষ নয়। যাকে সে খুঁজছে। তার নিজের মধ্যেই কে বুঝি কথাটা বলে উঠল। নাকের নিঃশ্বাসে ফরফর শব্দ হল। তারপর উন্মত্ত তাড়নায় যেমন হাঁটছিল, চলতে শুরু করল।

জলো জমি। নিচে প্যাচপ্যাচে কাদা। কোমর-ডোব' কাল-কাসুন্দের জঙ্গলে বাতাসের ছপ্‌টি মার গোঁ গোঁ আওয়াজ হাঁকাচ্ছে। সামনে পূর্ণিমা। দশমী রাত্রের মাখো-মাখো অন্ধকার ধরিত্রীর পটে। মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে আছে। বাঘবন্দি, ষোলঘুঁটি বাঘচাল খেলছে কেউ। আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কোন পাট নেই। তাই কোন ব্যস্ততাও নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে কাটিয়ে, কাল সকালে নদীতে স্নান সেরে পাড়ে মাটি দিয়ে কপালে-বাহুতে টিপ এঁকে, বেলতলায় প্রণাম করে, তবে খাওয়া-দাওয়া যা কিছু। হাঁড়ি চড়ানো হবে।

ঝুমনি বুঝি তক্কে তক্কে ছিল। ঈষৎ আলোছায়াময় স্থান দেখে দৌড়ে এসে আবার ধরে ফেলল গুণিনকে। ধমকালো, হেই, শেষে কিছু কামড়-টামড় খেতে চাস লিকিন গ? আঁধারে পাগল পারা ঘুরছিস তখুন থিক্যা।

কিন্তু বুরনের এখন আরো বেহুঁশ ভাব। হওয়ার উছল দৌরাত্ম্যিতে কার কণ্ঠের জানান যেন সে শুনেছে। তাই ঝুমনির

কোন কথা কানে তুলল না। উপরন্তু বেঘোরে বলার মতো বলে উঠল, হুই, হুই শোন্ চিৎকার। কান্না। পেছিস ত শুনতি?

ঝুমনি তার হাত ধরে প্রচণ্ড ক্ষোভে ঝাঁকি দিয়ে বললে, কি আন্ বাত্। কান্না কুথাকে? ধারালো চোখের দৃষ্টি পাত্লো বক্তার মুখে। লোকটার সর্ব ব্যাপারে সৃষ্টি ছাড়া ভাবভঙ্গি।

ফিসফিস করে চোখ পাকিয়ে বুরন বললে, হুঁ, জরুর। মো দিখতে পাব, উ মরণটো। জরুর বুলছি। বলেই আর কোন কথা না বলে, কোনদিকে না তাকিয়ে উত্তরমুখো ঘুরে আবার হাঁটা ধরল। কে যেন তাকে বাতাসে ভাসিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল। আশেপাশে চেনা লোকের ভিড়। ঝুমনি একটু ফাঁক হয়ে গেল। শুনতে পেল, বুরন বিড়বিড় করে বলছে, মো লয়, বঙ্গাই মোরে ন্যে চলল্। লিচ্চয় দেখাবেক খুনটো।

কয়েকজন মুণ্ডা পুরুষ মেয়ে দল বেঁধে বসে আছে এক জায়গায়। তিরিও বাজিয়ে তাদের মধ্যে একজন জোয়ান ছেলে দেহাতী কি একটা সুর গাইছিল। মাঝে মাঝে খুব লঘু হাতে তুম্দায় চাঁটি দিচ্ছে আবেকজনা। মাঝ প্রহরের শান্ত নিঃশব্দ রাত সেই স্তিমিত বিলম্বিত-লয়ের মায়াজালে যেন বাঁধা পড়ে গেছে। হঠাৎ চোখে ঠেকা দৃশ্য। নিঝুম আঁধারে একজন মানুষ চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছুতে। অথচ ঠিক চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা নয়, একটা নেপথ্য উস্খুস্নির ভাব আছে তার হাত-পা নাড়ানো, চোখ নাচানোর ভঙ্গিতে। দৃঢ় মুঠিবদ্ধ হাত। আচ্ছা, কি আছে ওর হাতে? আর অমনি বা করছে কেন?

চমকে ওঠে বুরন চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে শুধু দেখবে। কথা কওয়া তার বারণ। দেওতা পুরকনের সোহাগ আলিঙ্গন কপালে যার লিখন আছে, তাকে মরতে হবে।

হঠাৎ লোকটা ধাঁ করে ওখান থেকে সরে গেল। হাঁটতে

থাকল পিছনের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। যত দ্রুত হাঁটা সম্ভব কোন মানুষের পক্ষে, তার গতি এখন সেই পর্দায় ওঠানো।

এই দেখো! অন্ধকারে ছায়ার মতো ওর আগে আগে ওটা আবার কি চলেছে? কালকাসুন্দের কোমর-ডোবা জঙ্গল ঘুরে ওপরে উঠে দাঁড়ালে আগের ছায়াটা—এই, এই। মনে মনে চেঁচিয়ে উঠল গুণিন, এইবার কামটো হবেক। হুঁ, ইবার।

বন্ধ-নিঃশ্বাসে, হাত পা শক্ত করে, গা ঢাকা দিয়ে রইল বুরন। না, ভয় পেলে তার চলবে না। ভয় সে পায়ও নি। দেখবে। দেখতে সে নিশ্চয় পাবে। সে অনুভব করল স্পষ্ট, অন্য কারো ইচ্ছেয় তার হাঁটা-চলা এখন সম্পন্ন হচ্ছে। নিজের ইচ্ছাধীন আর নয়। অবশেষে মেঘ সরে চাঁদের আলো পরিষ্কার হতে দেখতে পেল, সামনের ছায়াটা পুরুষ নয়, একজন যুবতী মেয়েমানুষের। প্রায় আদুল গা। খোলা চুল। আর পায়ের অনেক উঁচু অবধি কাপড় তোলা।

—হেই বাবা, মনে মনে বুরন ডেকে উঠল। হবে লিকিন ইবার কামটো?

জায়গাটা নদীর প্রায় কোল ঘেঁষা স্থান। তবু ভাপসা অন্ধকার সর্বত্র। নদী সহসা মোচড় নিয়ে দক্ষিণে ফিরেছে, খাড়ি পাড়ের আড়াল তাই। আর সে কারণেই মেলার আলো এসে পৌঁছুতে পারে না এখানে।

মনে মনে পুনরায় সে বলে উঠল, হুঁ, ছোক্‌লাটো ঘটবার মতুনই থান বটেক ইটো। নিরালা। আঁধার-চাপা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বুরন। মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। পিছনের সেই পুরুষটা কাছে যেতেই হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল। তারপর হাঁটতে লাগল নদীর খাড়ি পাড়ের অন্ধকারের দিকে।

বুরনও চলল পিছু পিছু। খানিক দূরত্ব বজায় রেখে নিঃশব্দে

গো-সাপের পায়ে হেঁটে অনুসরণ করল তাদের। নজর স্থির নিবদ্ধ। অকম্পিত। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব। অথচ ওরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

চকিত এক শব্দে সচমকে তীক্ষ্ণ কৌতূহলে বুরন তাকাল তাদের দিকে। পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে নিতে বাধ্য হল। ধুত্তোর, পুরুষটা দু'হাতে সাপটে জড়িয়ে ধরে মেয়েটার বুকে, ঠোঁটে, বেধড়ক চুমো খাচ্ছে। দু'জনেরই বেবাস শরীর। দামাল, উদ্ধত।

বুরন শুনলে, মেয়েটি চাপা হাসিতে ফিক্‌ফিক্ শব্দ করে বললে, বুড়ো দানবগুলানের লেগে এত্তক্ষণ উঠতে লারছিলাম গ। হারাম-জাদাদির চক্ষু, যিন্ গিদির চক্ষু। শকুনের চোখ। সারাক্ষণ সজাগ লজর। বললে, আর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ক্রমেই পুরুষটা সমেত নিচেকার ভিজে মাটিতে মিশে যেতে থাকল।

ছিঃ ছিঃ। খুন নয়, উল্‌টো। থপ্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল বুরন। দাঁড়িয়ে এক পলকে ভেবে নিল, তাই বুঝি পুরুষমানুষটার হাবে-ভাবে তখন অমনি অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছিল। বার বার মুঠো পাকাচ্ছিল আর খুলছিল। ঝুমনির কথা মনে পড়ল তার। যে কথা সে একবারেও ভাবতে চায় নি, এই পুরকনের থানে এসে।—দূর, মর্। বলে পিছনে ফিরল। তারপর লোকালয়ের কাছাকাছি এসে উত্তরমুখো পথ ধরল। মনে হল, কে যেন তার পা ' রে হিড়হিড় করে টানছে ওই পথে যাওয়ার জন্য। সে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিল। কিন্তু কখন খুনটা দেখতে পাবে? রাত তো কম হল না।

সহসা একজনের দিকে চোখ গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধক্ করে ফের বুকের মধ্যে বেজে উঠল। কোমরের কোপাই হাতে তুলে নিয়ে মুখিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা। চোখের দৃষ্টি তার ভয়ংকর শানিত। লকলক করছে হাতে ধরা কোপাইয়ের ফলা। বুরন পিটপিটিয়ে ভাবলে, এইবার, হবেক লিকিন আসল ক্রিয়াটুকু? বঙ্গার ভর হয়েছে যিন্ লোকটোর শরীলে।

বিহারী কুলিবস্তির কিছু খারাপ মেয়ে, এই মেলা প্রাঙ্গণে এসেও আসর পেতেছে তাদের ব্যবসার। তাদের কাছাকাছি ভিড় কিঞ্চিৎ বেশী। তাদেরই একজনের সঙ্গে টাকার ব্যাপার নিয়ে কি বুঝি কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাইতে গণ্ডগোল বেধে অবস্থা ওই পর্যায়ে উঠেছে।

একজন স্বৈরিণী তাকে ধরে হেনস্তা করেছে। সেই রাগে জোয়ান পুরুষ এখন কোপাই তুলে মারমুখী হয়ে গজরাচ্ছে। বুরন সবে দাঁড়িয়েছিল। ভাবছিল, নিশ্চয় এবার জমবে কামটা। খুন হবেক। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতেই বিরক্তিতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে গেল।—না, এখানেও নয়। মনে মনে উচ্চারণ করলে আরেকবাব। মাথা তার বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকল। মনের ভিতরে একটা গুমোট দাপাদাপি। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কে যেন তাকে ঠেলে ঠেলে সামনের শূন্য, নির্জন, অন্ধকার প্রান্তরের দিকে ধাইয়ে নিয়ে চলেছে। এই সময় সহসা কি বুঝি পায়ে ঠেকে। বুরন বিষম খেয়ে আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ নজর ফেলল মাটির দিকে। একটা আস্ত মানুষ স্থির ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। তবে কি সব শেষ হয়ে গেল নাকি? সে এক পলক ভাবল। দেখা হল না দৃশ্যটা। বুরন চোখ কপালে তুলে থমকে গেল। তারপর নিজের মনেই যেন হাঁক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, হেই, বাবা পুরকন, মোরে না দিখায়ে খেও নি যেন কাওরে।

ক্ষিপ্র গতিতে উবু হয়ে বসে দেখতে চাইল, কে মানুষটা? মুরুব্বি লয়তো? তাড়াতাড়ি হেঁচড়ে লোকটাকে পাশ ফেরালো। ঝাঁকড়া চুলো মাথা, রোগা এক বগ্‌গা লম্বা চেহারা। না, মুরুব্বি নয়। পরমুহূর্তে বিশ্রী বোঁটকা একটা গন্ধ নাকে পেল। ওহো, হামড়ি খেয়ে টাল সামলাতে পারে নি, বাছাধন। বেহুঁশ হয়ে রাস্তার মাঝেই লুটিয়ে পড়েছে। খোয়ারি ভাঙবে সেই কাল সকালে। এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল গুণিনের, আশেপাশে ওরই মতো বেসামাল

বেহেড মাতাল আরো ক'জনা, অচৈতন্য হয়ে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

—নিচ্চয় হাঁড়ি মারার দল। এক পাত্রের ইয়ার। মনে মনে গালি দিয়ে সে বললে। বলল, তারপর আবার হাঁটতে লাগল সামনের পথে। সম্মুখের খোলা মাঠের নিস্তব্ধ আঁধারই তাকে যেন শিশুর মতো হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল।

ক্রমেই মনে গাঢ় রকমের একটা অস্বস্তি দানা পাকিয়ে উঠছে, কখন হবে কাজটা? কখন? এদিকে রাত যে প্রায় শেষ হতে চলল। পুবের আকাশে ফিকে রঙের আঁক পড়েছে দেখা যায়।

কোমরে হাত দিল সে। বাওয়া মরদ। জাত-ধরম, পুরুষ হলে কোমরে রাখতে হবে কোপাই। আর মেয়ে হলে, খুনিয়া। সে দেখল, চোখে-মুখে একটা বাঁধ-না-মানা উচ্ছ্বাস. গায়ে আসুরিক বল দিয়ে দেওতা পুরকন তার হাতেই কেমন যেন ধীরে ধীরে ছটপটিয়ে ওঠা আরম্ভ করল।

অবশেষে বুরন আরো দেখল, হাতটা তার নয়। বুড়ো বেল গাছের নিচে শয়ান যে কাষ্ঠবিগ্রহ—তেল সিঁদুরে চর্চিত আঁকা বড় বড় তিন আরক্ত চোখে কালো মণি—বঙ্গা মহাদেও, তাঁর।

আশ্চর্য! ওই সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ বিচিত্র এক স্তব্ধতা ক্রমেই তার চারপাশ ঘিরে ঘনিয়ে ওঠা শুরু করেছে, সে দেখল। কলকল করে ঘামতে থাকল বুরন। কে খুন হবে, কে সে? কোথায় আছে সে এই মুহূর্তে, কে জানে, বাবা। ক্ষুরধার দৃষ্টি বুলিয়ে নিবিষ্ট মনে বার বার তাকিয়ে দেখে নিতে লাগল সে চতুষ্পার্শে। শেষে, সহসা এক সময় লক্ষ্য পড়ল, কোপাই সমেত তার নিজের হাতখানা এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে থরথরিয়ে কাঁপা আরম্ভ করেছে। আপন বুকের নিভৃতে কি এক দুর্বার আবেগ আছে, ওই সঙ্গে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় টলা পায়ে যেমন এগুচ্ছিল, এগুতে থাকল। পায়ে পায়ে বাধা। সামনে পথ

আটকে এক বিরাটকায় ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চল, ঝুলন্ত ছায়া। যেন শিকড় আল্‌গা হয়ে ছায়াটা উল্‌টে মুখ থুবড়ে পড়েছে। গুণিন সেই পথেই তাড়সে ধেয়ে চলল।

মাগো! ছায়াটা মানুষ নয়। কাছে পৌঁছুতেই ঠকঠক করে কেঁপে উঠল বুরন। একটা বড় চাঁই পাথর। পাথরের গায়ে মনে হল, সেই বিশালকায় চোখ তিনটে আঁকা। লাল রঙ। ভিতরে কালো মণি। দেওতা পুরকন!

এবার নিজেরই কোপাই ধরা হাতের পানে চেয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল বুরনের চোখ। শ্বাসনালী বন্ধ হবার যোগাড়। প্রাণভয়ে সে চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু কোন আওয়াজ বেরুলো না গলা দিয়ে। কেবল বজ্রমুষ্ঠি শক্ত হাত কোপাই সমেত নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে এগিয়ে যেতে থাকল তারই বুকের দিকে।

সে কাঁপতে কাঁপতে আরো অবাক হয়ে দেখল, হাতটা তার নয়, বঙ্গা পুরকনেরও নয়। ঝোরকার! বিধবা ঝুমনির মৃত স্বামী। ঝোরকার জীবিতকালেই ঝুমনি খারাপ হতে শুরু করেছিল বুরনের সঙ্গে। বুরন ছিল নিঃসঙ্গ। বাচ্চা বিয়োতে বউ মারা যাবার পর আর সাঙা করে নি। রাত বিরেতে দেখা করত ঝুমনির সঙ্গে। হাসি মস্করা চলত। আর ঝোরকা তাই নিয়ে কোন প্রতিবাদ করলে, আবহাওয়া বচসা মারামারিতে পর্যন্ত গিয়ে ঠেকত। কবেকার কথা সেসব।

বুরন বলত, ঝোরকা আর বেশীদিন বাঁচবে না। সে গুণিন মানুষ। গুণেগেঁথে জেনেছে। সুতরাং পরবর্তীকালে ঝুমনি তার-ই হবে, হয়েছে তাই। তবে নীলবান গাঁয়ের মানুষ বলবে, ঝুমনির লোভে বুরনই বাণ-ফোঁড়া করে মেরেছিল ঝোরকাকে। গুণতুকের প্রক্রিয়ায়।

এতকাল পরে পুনরাবির্ভাব বুরন দেখলো, ঝুমনির স্বামী ঝোরকা, পুরকনের মতোই রক্ত রাঙা চোখে শ্বাপদ হিংস্র দৃষ্টিতে তার পানে

তাকিয়ে রয়েছে। এবং রক্তাক্ত নিষ্ঠুর হাত, ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে আসছে তার বুক লক্ষ্য করে। হাতে তার চকচকে কোপাই।

বুরন আপ্রাণ চেঁচাবার চেষ্টা করল। মরণ যন্ত্রণায় যেভাবে ছটফটায় তীরবিদ্ধ পাখি—মারিস লাই ঝোরকা। মারিস লাই। মাফি কর‍্যা ছে। কসুর হয়্যা যেছে এক কিসিম। গুণা কর‍্যা ফেলাচি। আর হবেক লাই গ।

হাতটা কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না বুরন। ক্রমাগত শক্ত খাঁচার মতো আঁটালো হয়ে চেপে আসছে। পিছনে ঝোরকার ভরাট দৈববাণীর স্বরে মোটা গলায় অট্টহাসি বাজলো। সে কি ধমক!

—গেল, গেল। শেষবারের মতো বুঝি বুরন হাঁকরে উঠল। বাঁচাও, খুন কর‍্যা ফেলাল। মারল গ। মরলম গ।

কিন্তু ততোক্ষণে কোপাইটা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল তার পাঁজরে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। ধুপুস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বাওয়া গুণিন।

পরে, মেলা প্রাঙ্গণে এ খবর প্রথম চাউর করল ডমরু। মুরুব্বিকে দেখে অবশ্য প্রথমে ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে গিয়েছিল সকলে। ভয়ও পেয়েছিল কেউ কেউ। মরা ডমরু উঠে এল নাকি জ্যান্ত হয়ে? ছেংলালা। ভূত-প্রেতেরা যেমন পাবে।

ডমরু হরেক অঙ্গভঙ্গি-সহ হেসে চেঁচিয়ে আ[illegible]র হল। নেচে নেচে বললে, শালো, মো মরব। কেনে, করছি কি মো?

ডমরু কিছু করে নি। গলা সপ্তমে তুলে সে আরো দ্বিগুণ উৎসাহে ভুবন মাত্‌ করে শুনোলে, কেমুন, তখুন বুলি লাই, উ কাম কোই করিস লাই গ। তা, মোর বাত্‌ শুন্যা, হাস্যে ম'লো গ সব। জাঁক হল, গুণিন বটিস মো। বড়ী গুণিন। আবি দেখ্‌ কেনে, কে শালো ক্বাই কর‍্যাচে। অউর মো ঝুটা কয়্যাচিলম লিকিন?

মুরুব্বি শেষ পর্যন্ত বলে নি, তবে তারই মধ্যে বুঝে ফেলে সকলে। ডমরুর এত লাফ ঝাপ কেন? সে কি বলতে চায়। বাঁধের

কাজ নেওয়ার জন্য বুরনই সর্বপ্রথম মুরুব্বির কথা উপেক্ষা করে জাদানবাসীকে শলা-পরামর্শ দিয়েছিল। এ কাজ নিতে প্ররোচিত করেছিল। তাই আজ অলঙ্ঘ বিধির নিয়মে পাপের শাস্তি বইতে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হল।

একসঙ্গে অসংখ্য জোড়া চোখের ওপর আকাশ গুঁড়িয়ে পড়ার অবিশ্বাসজনক কাহিনী। ডুকরে কেঁদে উঠল ঝুমনি। হায়, হায়! সেই মানুষটাই কিনা শেষে মরল, যে পুরকন বঙ্গার পূজা উপলক্ষ্যে মৃত্যু হওয়াটা দেখতে চেয়েছিল। বরং মরেছে বলে, বলি হল বলে, সকলে যার কথা ভেবে স্থিরকল্প ছিল, তার কিছু হল না, উল্‌টো বিপত্তি। পেটে তার আট মাসের বাচ্চা এখনো কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। বুরনের দেওয়া উপাচার। প্রথম পুরুষটাকে সে খেয়েছিল নোংরা ফিকিরে, বৃহৎ লোভের আশায়। দ্বিতীয় জনা গেল। ঝুমনি তাই কোন মতেই কান্নাকে রুখতে পারল না।

ডমরু বর্ণনা করল আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা। নদীর পাড়ে আঁধার পথে সে গিয়েছিল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। উঠে আসবার মুখে দেখতে পায় বুরনকে। বাঁচাও, বাঁচাও, বলে চেঁচাচ্ছে। আর শক্ত হাতে ঝকঝকে একখানা কোপাই বসিয়ে দিচ্ছে নিজেরই বুকের পাঁজরে। ডমরুর কথা শুনে সকলে অবাক হয়। মৃত ঝোরকার নাম নিয়ে আঁকুপাঁকু করে শেষে বুরন মরল!

সংবাদানুযায়ী অবশেষে সবাই চলল সেই স্থানে। গিয়ে দেখল, সত্যি, বুরনের রক্তাপ্লুত অনড় শরীর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে পড়ে রয়েছে। শেষ সময়ে যে একটা আর্ত কাতরতা নিয়ে মরেছে, চোখে মুখে এখনো তার চিহ্ন বিদ্যমান। সকলে বিস্মিত হল, তাদের দেবতার অলৌকিক লালা দেখে। সবের মাঝ হতে গুণিন মানুষ-টাকেই শেষে বেছে নিলেন ঈশ্বর! পুজোর রাতে তার চৌহদ্দির সীমানায় খুন। অথচ সে-ই ছিল কিনা এই পূজার এক রকম উদ্যোক্তা, হোতা বলতে গেলে।

তবে, তবে? জিজ্ঞাসা তাদের এইতেই ফুরোতে পারে না কখনো। নদীর পাড়ের আওয়াজ কিছুমাত্র কমে নি আজ পর্যন্ত। আজও অনেক রাত্রি পর্যন্ত শোনা গেছে সেই অশুভ যন্ত্রণাদায়ক শব্দ-ঝঞ্ঝনা। সঙ্গে খোনা-সুরে নাকি গলার কাঁদুনি। কেবল ফাঁক গলে চলে গেল সেই মানুষটা, যাকে ঘিরে ওই জিজ্ঞাসার উত্তর তারা ফিরে ফিরে চাইত।

তারপর এক সময় লালকুঁয়োয় ঋতু পরিবর্তনের খেলায় যেভাবে বর্ষা ফুরিয়ে শীতের আঁচড় আসে, মারাং বুরুর মাথায় ডিবরি লণ্ঠনের শিখা জ্বেলে আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হল রাঙামাটির প্রান্তর। মানুষেরা দেওতার পূজাপাট সেরে ফিরে গেল ঘরে। বঙ্গার থান, লালকুঁয়োর ধুলোয় রক্তের দাগ কখনো গাঢ় হয় না। ক্রমে মাঠ, অরণ্যরাজা, কাঁচের আয়নার জ্বলে উঠতে থাকল ধিকিধিকি।

ইত্যবসরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কি মনে করে ডমরু একা সট্‌কে পড়ে নেমে এল একেবারে নদীর-কিনারে। হাত খানেক নিচেই প্রবহমান ধারা। ডমরু মুখ নিয়ে পাত্‌লো কাচবর্ণ জলের ওপরে। আকাশের আলোক-চিত্রণে প্রতিবিম্ব পড়ে নিচের আয়নায়। না, মুখ তারই, অন্য কারো মুখের ছায়া নয়। এই দুর্ভাবনাই এতক্ষণ তাকে কণ্টকিত করে তুলেছিল। পরে ভাবল, তবে সে এতক্ষণ কেন ঝোরকার মুখের কথা ভাবছিল? বার বার কেবলই যেন মনে হচ্ছিল, ঝোরকার মুখ উঠে এসে তার মুখের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এবং সে-ই যেন কোপাই সমেত মুঠি বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দ পদে এগিয়ে চলেছে কারো দিকে। ডমরু ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাঁধ নাচালো বার কয়েক। তারপর কাতুকুতু লাগার মতন খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। পরে, মুরুব্বি-চালে এগিয়ে চলল পট্টির পথে।

মিশির একটা লোককে ডাকল, এই, এই ঘাটের মড়া শোন্।

লোকটা কাছে এলে এবার শুধোল, কি নাম রে তোর, কুলো-কেনো?

লোকটার কানদুটো বাস্তবিকই একটু বিসদৃশ ধরনের বড়। কিন্তু সে বুঝি মিশিরের শ্লেষে কোন আঘাত-বেদনা পায় না। উলটে বরং মজা পেয়ে অকাতরে হাসল। এবং নিজের কান দু'খানা সকৌতুকে হাতের থাবা দিয়ে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে কিছু কসরত করল। পরে, নাম বললে, হারুলোর গ।

শুনে, এবার মিশিরের মজা পাওয়ার পালা। খিকখিক করে হেসে সারা হবার উপক্রম হয়।—অ্যাঁ, কি নাম বললি রে শালা? হারুলোর, না গুলিখোর?

ওদিকে হারুলোরের মজা পাওয়া তখনো সম্ভবত মেটে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর ফিক্‌ফিক্ করে একই রকম হেসে যেতে থাকল।

অবশেষে উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগটা কিছু মন্থর হলে মিশির আরম্ভ করল, সে যাক্। খুব তো মুরুব্বির মতো হেঁটে চলেছিস, এট্টা কাম করতে পারবি? সামান্য কাজ। লেকিন করতে পারলে, নগ্‌দা মোড়ে লোট তুলকা মিলবে। হাঁ-হাঁ, পাঁচ টঙ্কা। অউর সাথ্, এক ঝাঁঝর পাকি মাল। এক বোতল মদ। পাউরা।

লোকটার চোখে যেন লহমায় বিদ্যুৎ দেখার হিলিবিলি খেলে গেল। মুখ-চোখের রঙে একটা চিত্রবিচিত্র রকম চিকচিকানির আভা। হেই, কাথাটো কি গ, এট্টা সামান্য কাজ কর্‌যা দিতি পারলে অত্ত গুলান জিনিস একসাথ্ পাওয়া যাবেক। এরপরও বাঁধ রেকায় গুসিই-কিষাণ খাটছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। তাজ্জব কারবার দেখি! যাই হোক, যদি আদৌ সত্য হয় প্রস্তাবটা, তাহলে জাদান সন্তান হয়ে কাজ সে করতে পারবে না-ই বা কেন?

মিশির আবার যখন জিজ্ঞাসা করল, কি রে, পারবি?

সে লাফিয়ে উঠে জবাব দিলে, লয় কেনে গ? জরুর।

মিশির তখন সন্তুষ্টির হাসি হাসল, বেশ। পরে, তার সম্পর্কে খুশিভরা মন্তব্য করলে, আমি আগেই জানতাম, তুই আদতে একটা মস্ত কাজের লোক। এখন দেখছি, যথার্থই বটে। আচ্ছা, এবার শোন—। বলে আসল কথাটা বলার জন্য গলা খাঁকারি দিয়ে তৈরি হয়ে নিতে ব্যস্ত হল।

ওদিকে হারুলোর বাগিয়ে দাঁড়াল।—ঠিক আছে ক'।

মিশির এবার প্রথমে এক পলক এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর সাফ-সটান কথা। শুরুতেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, লড়কি যোগান দিতে পারবি? তুদের পাড়ার মেয়া। খুব-সুরত নও জোয়ানী লড়কিয়াঁ।

হাই! আয়ু গ। আপুং গ। কেউ যেন ঝপাৎ করে ধারালো বাসলার কোপ বসিয়ে দিয়েছে জাদান মানওয়ার স্কন্ধদেশে। গেছে, যেন ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পাঁজরার মুখ দু' ফালা হয়ে গেছে। কি কথা রে বাবা! বাওয়া পুরুষ কিনা আপন রাখের ইজ্জত সব জলাঞ্জলি দিয়ে কাচ্‌রা কাজের জন্য সাহেব বাংলোয় বাওয়ানী ঝুমকো যোগান দেবে। বা, রসের গাওনা!

এই তো নিয়তি! বাওয়া শের আজ হাঁদুর চেয়েও ক্ষীণশক্তির প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজেকে দিয়েই কথাটার সত্যাসত্য বিচার করা যায়। নাহলে মিশির তো কোন্ ছাড়, তার উর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষেরও বুঝি সাহসে কুলোত না, জাদান দেশের কোন বাওয়া পুরুষকে তাদের ঘরের রূপসী মেয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে কোম্পানির হাতে জিম্মা করে দেওয়ার সামান্যমাত্র প্রস্তাব করতে। এতক্ষণে কথকমশাই তবে কখন টুকরো টুকরো হয়ে যেত না কোপাইয়ের ঘায়ে? অথচ মিশির এখন দিব্যি নির্বিবাদে বলতে পারল। এবং বলে, উত্তরের অপেক্ষায় খোলাখুলি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মিশির তর্ক তুলল, কেন, এতে চমৎকাবার কি আছে রে, হারামজাদা ? যে কোন কামই, কাম। বাঁধ রেকায় গন্ধা মজুর কাম আর করতে হবে না, গতর না ভিড়িয়ে বেশক্ মোটা কামাই। এক-একটা চিংড়ি হাওয়ালা করবি, আর মিলে যাবে এক বোতল পাউড়া, অউর একখানা মোড়ে তুল্কার লোট। পাঁচ টঙ্কা। খেলা কথা নাকি রে ?

হেই, আয়ু গ! পাগল করিস লাই তুয়ার কুঙ্গা হপনটোরে!

দুর্বল রোগা স্বাস্থ্য হারুলোরের হাঁপের কষ্ট আছে। ইদানীং মাঝে মধ্যে পেটে আবার একটা ফিক্ ব্যথা ওঠে। হাত-পা তখন মোচড়াতে থাকে। মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে দেয়। বমি বমি ভাব হয়। যে কারণে অনেকদিনই কাজে যাওয়া হয় না। নাগা হয়ে যায়। আর যদি বা নাগা না করে, শরীরে তেমন বল পায় না বলে ফুট্কাজের পাত্তি বেশী দেখাতে পারে না। ফলে রোজগার-কামাই একেবারে হাতে-ধরা। অথচ অপরাপর বাওয়া মরদের মতন পরান কুটানি চাহিদাটা ঠিকই সহস্র শিকড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অন্তরে।

মিশির ফুসলোল, আরে গাধা, দিনকাল কি আর তেমন আছে, খুঁজে দেখ, এক সুনার হাড়িয়াও কেউ খাওয়াবে না বিনাস্বার্থে। এখন যার-যার, তার-তার। তাই বলি, হাতে যখন সুযোগ এসেছে, ফিকর না করে এই ধান্দায় কিছু কমিয়ে লে। তুই রাজি না হলেও, দেখিস, আরেকজন ঠিকই রাজি হয়ে যাবে।

তারা জন্মাবধি ছিল চাষী। হাটুক সন্তান। কিন্তু বাওয়া পুরুষ আর কোনদিনও বুঝি তাদের পুরাতন বিশ্বাসে ফিরে যেতে পারবে না। জলে-কাদায় নেমে ক্ষেত-খামারের কাজ। অথবা ঢেলা-ঢাঙড় মাটিকে লাঙলের ফলায় চিরে পেষা করা। সারা বছর হাড় ভাঙা খাটুনির পর সম্পূর্ণ অদৃষ্টনির্ভর হয়ে থাকা জীবন। কোনবার কেমন ফসল হবে, আগেভাগে কারো পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। অথচ বেড় বাঁধের কাজ শুরুর অব্যবহিত আগের যুগেও, এই

স্বপ্নই তাদের বুকজুড়ে ছিল। জল নিকাশী খালের পার হতে আ-দিগন্ত বিস্তৃত ভূমি সবুজ রাস্তুজনি গমের চারায় ছেয়ে যাবে। ফসল ফলবে দুনো। যেজন্য, মুরুব্বির নির্দেশনামা মানতে সেদিন নেপথ্যে অনেকেই অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

আজ হ্যাঁচ্‌কা পয়সার কারবার তাদের সকল বোধ ও প্রথাকে যেন টলিয়ে দিয়েছে। দিন ঘুরলেই একদিনের রোজ। নগ্‌দা কামাই। এরই অবশ্যম্ভাবী কুফল স্বরূপ গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ভেঙে গেছে, কোন একতা আজ নেই তাদের মধ্যে। কেউ কারো কোন খোঁজ-খবর রাখে না। নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে মশগুল সবাই। পিছল পথে একবার হাঁটা শুরু করার পর চট্ করে সে-রাস্তা ছেড়ে উঠে আসা সহজ নয়। জাদান দেশের কোন্ মানুষ আর এই সহজ জীবন ছেড়ে, পুরাতন ক্লেশকর জীবনে ফিরে যেতে উৎসাহ বোধ করবে? গুন্‌তিতে একজনকেও হয়তো পাওয়া যাবে না। তাই দিন বদলের বহুতর প্রতিক্রিয়া তাদের হজম করতেই হবে।

হারুলোর চুপ।

মিশির খোঁচা দিল, কিরে, আমি কিছু গুনাহ্‌ বললাম। বলবি ত ছাই, যা হোক উত্তর।

হারুলোর এবার আর ততো যেন উথাল-পাথাল হয় না। বরং আস্তে আস্তে প্রসারিত ফণা নামিয়ে কেমন গুম খাওয়ার মতো হল।

তাহলে প্রস্তাবটা এতক্ষণে নিশ্চয় কিছুটা মনে ধরে থাকবে শ্রোতার। মিশির অতঃপর যেন বিরক্তি ভরে কথাগুলো বলে উঠল, এত শোচবার কি আছে এতে, ঘোড়ার ডিম। তোর নিজের জরুকে তো আর নিয়ে আসছিস না? মধ্যে থেকে ফাঁদোয়া কারবারটা হয়ে যাবে।

অভিনয় বুঝল না হারুলোর। কিন্তু কথাগুলোয় যেহেতু অনেক ব্যথা প্রকট হয়ে পড়ে, আরেক দফা চমকিত হল। তারপর কি ভেবে, একই মতো গোঁজ-মেরে রইল।

মিশির তখন সোৎসাহে তার নিকটস্থ হয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সুরে সান্ত্বনা দেবার মতন করে আরম্ভ করল, জাদা কামাই করতে পারিস না। ফাঁকে-ফোঁকরে কিছু মিলে যাওয়ার সুযোগ থাকলে, ছাড়িস কোন্ বুদ্ধিতে, আঁ? যা দিনকাল আসছে। উজবুক কাঁহিকা। বলে একটা রহস্যময় টেপা দিল তার শরীরে।

হারুলোর এবার জলে ডুবন্ত মুমূর্ষু মানুষ যেন। শেষ কিস্তিতে বুকে অসীম সাহস আনতে চেয়ে পকপক করে বলে উঠল, হাজরাবাবু গ উ বাত্, বুলিস লাই গ মোরে। মো বাওয়া মরদ বটিস। রাখের ইজ্জত—

মিশির ধমক দিল, তোর ইয়ের নিকুচি করি। ওসব ভ্যান্তাড়া কথা ছাড়। বলে উঠে গেল। মাথায় দুরভিসন্ধিটা ততক্ষণে বুঝি পুরোপুরি খেলে গেছে। একটু পরে একটা টিনের প্লেটে করে কি খানিকটা খাবার নিয়ে ফিরে এল। এসে তার উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরে বললে, এটা খা এখন। অল্প বাদেই হমার সাথ্ আজকের দুপুরের খানা এখানে খেয়ে যাবি। নিজে দেখেশুনে কাল শহর থেকে খাসি গোস্ত্ মুলিয়ে লিয়ে এসেছি। রান্নাও হয়ে গেছে প্রায়। ক্যায়সা উম্‌দা খানা দেখতে পাবি।

লহমায় একটা আলোড়ন বয়ে যায় যেন। হারুলোর চুকচুক শব্দ করে জিব টেনে উঠল। এটা সত্যি কথা, খাওয়ার ব্যাপারে বড় লক-লকে নোলা তার। এই প্রসঙ্গ শোনা মাত্র আর কোনদিকে দিশা-হুঁশ থাকে না। চোখ-মুখ নাচিয়ে হাসল, খাওয়াবি, সাচ?

মিশির তার পিঠে চাপড় মারল।—তো, তোর সাথ্ মাজাকি বাত্ বললাম?

—লাই, তা লয়। হারুলোর গদ্‌গদ হয়ে ঘাড়-মাথা দুলোলে।

মিশির একটু থেমে নিয়ে, যাতে কথাটায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রকাশ পায়, চোখ-ভুরু অর্ধ মুদ্রিত করে ছদ্ম চাপা স্বরে পুনরায় বললে, হাঁ, অউর পাঁচটো রূপেয়া আর এক বোতল পাউড়া ভী দিয়ে দেব এহী

সাথ্। কাজের আগাম মজুরী। তারপর কাজ হাসিল করা না-করা তোর ইনসাফে যা বলে।

—দাদন ?

—গাধাইয়ের মতো বাত বলিস না। দোস্তীর নিশানা।

—বাপুস গ।

মুখে টিপ্পনি কাটলেও, হারুলোরের চোখের আলো নিষ্প্রভ হয় না। ঝিকমিক করতে থাকল সূর্য তাপে ঝলসানো পাথরের আয়নার মতো। বিড়বিড় করে বারেক উচ্চারণ করলে, হেঁ-হেঁ, কি কাণ্ড-কারখানা মাইরি, দানসত্র গ। শালোর কপালের এমুন জোর ছ্যাল, আগে ত কখুনো বুঝা যায় নি কুনো ব্যাপারে। বলে অদ্ভুত এক প্রকার গোঁ-গোঁ আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে।

মিশির কচলালো বিষয়টা।—নসীব কি চিরকাল এক জায়গায় ঠেকে থাকে নাকি রে বেত্তামিজ ?

—হবেক বুঝিন। উদাসীনের মতো হারুলোর তখন জবাব করল।

মিশির অবশেষে তার হাত ধরে বাড়ির পিছনের দাওয়ায় নিয়ে গেল। গিয়ে এক কোণে বসতে নির্দেশ করল। তারপর নিজেই তার পরিবেশনের উদ্যোগ আয়োজনে পাতা পেতে জল গড়িয়ে দিল। বললে, আজ আমার বানানো খানা খাবি, ইরপর একরোজ তুরে সাহাব কোঠির খানা খিলাব। দেখ্‌বি, কি বড়িয়া চিজ সে-সব।

হারুলোর আবারো গোঁ-গোঁ আওয়াজটা বের করল গলা দিয়ে। যেন ধারাল কোন অস্ত্র বিদ্ধ হয়ে আছে কণ্ঠনলীর ওপরে। কাশল।

মিশির বুদ্ধি দিল, হাড় চুষে চুষে খা।

হারুলোর হুড়ুৎ হুড়ুৎ শব্দ করে হাড়ের মজ্জা বের করে খেতে থাকল।

অনেক সময় নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটলে, মিশির বুঝি

আরেকবার ঝালিয়ে নিতে চাইল প্রসঙ্গটা।—কি রে, ওয়াদা মতুন কাজ করবার কথা মনে থাকবে ত ?

হাত ধোয়ার পরও রান্না মাংসের খুশবুটা বোধহয় পুরোপুরি হাত ছাড়া হয়ে যায় নি, নাকে হাত ঠেকিয়ে হারুলোর তার গন্ধ টানছিল দুচোখ বুজে। মিশিরের জিজ্ঞাসায় একটু থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু সে-জিজ্ঞাসা যে তার মরমে প্রবেশ করে, এমন মনে হয় না। ফিক্ ফিক্ করে হেসে শুধোলে, আরেক রোজ ফির্ খিলাবি ত, অঁ্যা ? কাথা দিছিস কিন্তুন।

মিশির কাষ্ঠ হাসল, বলেছি ত, সে হবে'খন। আগে কাজটা ফাঁসা। যা নিয়ম ব্যবসার। শুধু এক তরফা আমিই করে যাব নাকি ?

তখন প্রথম বেলাকার আগুনে-হাওয়াটা দমকা যেন আরেকবার বয়ে যায় হারুলোরের দু'বুক ঝাঁঝরা করে। হেই আয়ু গ, আপুং গ ! তুয়ার কুঙ্গা হপনটোর মাথা বিলকুল খারাপ কর‍্যা দিস লাই গ হাদে। হারুলোর খক্ খক্ করে কাশতেই থাকল।

মিশির ওয়াদা অনুযায়ী দেয় সামগ্রী বাড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার স্বরে এবার ফের বললে, অযথা মেলা ভাবিস না বেশি। মন দিয়ে কাম ফাঁসা, কয়েকদিন বাদে দেখবি, বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। আর ভালও লাগছে কাজটা। নগ্‌দা কামাই। একজনের জন্য মোড়ে ভুলকার লোট, অউর এক বোতল পাউড়া। খেলা কথা নাকি ?

—দাদন দিলি ?

মিশির দাঁতের ফাঁকে হাসল, দূর গাধা। দোস্তীর নিশানা।

হারুলোর আরেকবার জোরসে নাকে টেনে হাতের গন্ধ শুঁক্‌লো। এখনো ভুরভুরে স্বাদ আঙুলের ভাঁজে, নখের কোনায়, লেগে রয়েছে। এই গন্ধটা যাতে কোনদিন না শুকিয়ে যায় তার হাত থেকে, হঠাৎ ইচ্ছা করল হারুলোরের, এল্লাবঙ্গাকে কায়মনোবাক্যে ডেকে, বরটা চেয়ে নেয়। এরপরই তাকে কোন খেয়ালের ভূতে

পায়, মিশিরের চোখে চোখে তাকিয়ে সহসা শুধিয়ে উঠল, আচ্ছা, এট্টার জন্য মোড়ে তুলকার লোট, আর এক বোতল পাউড়া। কিন্তন দু'জনারে যদি আনতে পারি, কি মিলবেক ?

এরকম প্রশ্নে মিশিরের মতন দুঁদে মানুষ পর্যন্ত হকচকিয়ে যায়। পরে অবশ্য সামলে নিলে। নাকে হাসল। তারপর মুখস্থ বলার মতন সজাগ ধরতা দিল, কেন দু'জনার জন্য দো'বোতল পাউড়া আর গেল্ তুলকার লোট পাবি। দশ টাকা।

—বেশ। তা'লি তিনজনের জন্য ?

—তিন বোতল পাউড়া, আর গেগ্ মোড়ে তুলকার লোট। পনর টাকা।

হারুলোরের শির-মাথা দপদপ করছে। খেয়ালের তোড়ে শুধিয়ে চলল, আর চারজনের জন্য ?

—ই অনুযায়ী রেট। মিশির একটু যতি দিয়ে ফের বলেছে, যত আনতে পারবি, ততো কামাই বাড়বে। একশ'জনকে আনতে পারলে পানশো রূপেয়া, আর শ' ঝাঁঝর পাকি মাল মারতে পারবি, শালা।

হাই, আয়ু গ, আপুং গ! এখনো কানে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে তুয়ার কুঙ্গি হপনটো!

হারুলোর অতঃপর গাত্রোত্থান করেছে। মিশির তাকে ঢালের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত মাসুন একদিন মরল।

বিচিত্র রেওয়াজ বাওয়া সমাজে। যে মানুষ মরল, খাড়ি মুখে নদীর উঁচু পাড়ে ঢাঁই মাটির নিচে তাকে শুইয়ে রেখে আসে তার ঘরবাসী পরিজনেরা। বলে মাটি মঞ্জুর। অগভীর কবরের মাটি হয়তো সরে যায় একরাত পরই। কোথায় উধাও হয়ে যায় মৃতদেহ। শেয়াল কিংবা আর যাতেই টেনে নিয়ে যাক্, এদের

বিশ্বাস অমনি অবনত মস্তক হয়।—মানওয়াটোরে আপন রাজ্যের হেগাহড় (প্রজা) কর‍্যা যে গেল বঙ্গা।

ঘাট্‌লা পলাশ মিলন। পিছনে লা'র ক্ষেত। ডাইনে হিজল-মহুয়ার পরিব্যাপ্ত জঙ্গল চলে গেছে দূর ধূসর দিগন্তের দিকে। নদী-পারের ঝুপসি জঙ্গলের পাক্‌দণ্ডী ঘুরে ঈষৎ সমতল মতো ঠাঁই। জায়গাটা ক্রমে ছড়িয়ে গেছে ভিজা বালির নয়ানজুলি পথে। আগে মাটি মঞ্জুরের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো যে স্থান, এখন তা বাঁধের চতুঃসীমার মধ্যে পড়ে যাওয়ায়, নতুন পত্তনীতে জাদান সন্তানেরা এই ছাড়া-ছাড়া বনান্তরে আসা আরম্ভ করেছে। মাটি মঞ্জুর হয় নদীর তীর সংলগ্ন নরম ভূমিতে।

যথাবিহিত ক্রিয়াকর্ম সেরে একলা ফিরছিল সুধ্‌না নদীর পাড় ধরে। গাঁয়ের বাকী জনেরা সব আগেই ফিরে গেছে। সুধ্‌নাই বলেছিল তাদের চলে যেতে। তারাও আর বিরক্ত করে নি, মন বুঝে ফিরে গেছে। যতই হোক্, মাস্থুন তার জরু, তার মৃত্যুব্যথা-প্রাণে কিছুটা বাজবে বৈ কি!

একটু ঘুরপথ হলেও, জঙ্গল সীমানার চড়াই-উৎরাইয়ের রাস্তা ছেড়ে, সুধ্‌না চলেছিল খোলা প্রান্তরের আল রেখা ধরে। মাঝ-বর্ষার মেঠো স্নিগ্ধ হাওয়া গায়ে লাগছে। পায়ের তলায় জলে ভ্যাপ্‌সানো শুক্‌নো মরা পাতার স্তূপে খস্‌খস্ শব্দ হয়। এই রাস্তা গিয়ে মিশেছে একেবারে রেজা মুণ্ডাপাড়ার উপান্তে। যেখানে সন্ধ্যার পর সুন্দর ঝকমকে সাজে ঝুমরী মেয়ের দল দেহের সওদা সাজিয়ে শিস্ দিয়ে দিয়ে ডাকে মদ্দ জোয়ানের দলকে। বেশী বয়েসের মাওকিরা এলো-গায়ে ভারী পাছা দুলিয়ে হাটের মাঝে গান গাইতে বসে। অহোরাত্রি জোয়ানীর মচ্ছব সেখানে। হল্লা-গান-খেস্তাখিস্তি।

মাস্থুনের কবরের পাশে বসে যৌবনের অনেক কথা মনে পড়েছে সুধ্‌নার। তার হাসি, তার চোখ ঠারা। শেষ দিকে কিছুই

ছিল না মাস্থনের, তবু একটা মেয়েলী হায়ায় তার মতন বাউরা মানুষকে মাথায় ছাউনি দিয়েছিল। একদিন নিঃশব্দ আঁধার রাত্রে মায়জুর গলা টিপে সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিতে পর্যন্ত উদ্যোগী হয়েছিল সুধ্‌না। নিজে অসুখে পড়ে জোয়ান স্বামীকে যে লুকরান করে দেয়, তার প্রতি কখনো কোন অনুকম্পা থাকতে পারে না কোন বাওয়া মরদের। ভয়ংকর কোন পশুর মতন প্রসারিত বীভৎস থাবায় চুপিসারে হামা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল সুধ্‌না তার দিকে। এমন সময় সহসা চোখ মেলেছে মাস্থন।

ঘুম-ভাঙা ড্যাবা ড্যাবা চোখে তাকিয়ে দেখে আর্ত হেরেন্সকে। খ্যাপা মানুষটা তখন যেন বুনো পশুর মতো ঘোঁত-ঘোঁত করছে। পাত্‌লা ঠোঁট মাস্থনের ঈষৎ বুঝি কাঁপলো। জড়ানো অব্যক্ত গলায় কি বুঝি বারেক বলতেও চাইল। পরে, আবিল ধারায় দুই চক্ষু তার প্লাবিত হয়ে গেল। তারপর এক সময় উলুখড়ের চিল্‌তে ঘরে সহজ বাতাস বয়েছে। বাইরের বনের পটে কোন নিশাচর পাখি বুঝি সহসা ডেকে উঠেছে। অতঃপর মাস্থনকে ছোঁ মেরে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে তুলে ধরে ঘ্যাগাড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে সুধ্‌না, মাস্থন, মোর মায়ুজ। তু দাটা নহী, সোন্দরী।

সেই মাস্থন আর কোনদিনও তার জরাজীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে সুধ্‌নার দিকে ফিরে চাইবে না। পিছ্‌টান সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে সে এখন মুক্ত পুরুষ। পাড়াঘরে লুকরান মরদ খেতাবটাও এবার অনায়াসে ঘোচাতে পারবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দৃষ্টি তার বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? মনের ভিতর কি একটা ভাষাহীন গুঞ্জন উঠছে ঘুরে ফিরে, কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ যার নেই—কেমন বিস্বাদ লাগছে সব কিছু। বাঁধন ছিঁড়ে মাস্থন যেন আরেক কঠিন নিগড়ে বেঁধে গেল তাকে। এই গিঁট সে বুঝি কখনো খুলতে পারবে না। মুক্তির আনন্দ যে এমন বেদনাঘন হতে পারে, অনুভব করে সুধ্‌না যারপরনাই বিহ্বল হল।

চলতে চলতে সহসা এক সময় পথের পাশে বাসক পাতার ঝুপসি আঁধারে কথা বলার একটা হিসহিস শব্দ কানে এল। ধাওড়ার কুলি ব্যারাকে সান্ধ্য মজলিসের আড্ডা গমগম করছে। সেয়ানা বয়েসী মেয়েদের ন্যাকা কণ্ঠ, হাসি, গান শোনা যাচ্ছে। আর যারা অভিসারে বেরুবার, তারা ঝুমরী মেয়েদের ঢঙে মুখে-হাতে সস্তা প্রসাধনের প্রলেপ চড়িয়ে আনাচে-কানাচে আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতময় শব্দ ছাড়ছে। কোন কুলিমজুর চোখ তুললেই শিকার স'ন্দহে, চোখ মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে ইশারা জানায়। মুচকি মুচকি টেপা হাসে।

সন্ধ্যা রাত্রির পাত্‌লা অন্ধকার এখন অনেকখানি জমাট, গভীর। চাঁদের হেলানো আলো এসে পড়েছে চিক্‌রী পাতার ফাঁক দিয়ে। রুপোর পাতে মোড়ানো নদী দেখা যাচ্ছে। বিভঙ্গে লাস্যায়িত ছন্দ। ঝিকমিক করছে ছড়ানো বালির চড়া।

খানিক এগিয়ে মধ্যবর্তী একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে উঁকি দিতেই মাথাটা তার বোঁ বোঁ করে ঘুরে যাওয়ার দাখিল হল। গাছের নামানো একটা সরু ডাল ধরে কোন রকমে টাল সামলালো সুধ্‌না।—এহে, রামোকাণ্ড। একেবারে দেহ সম্পর্কের শেষ ধাপে বিচরণ করছে একজোড়া কপোত-কপোতী। দুজনকেই সুধ্‌না চিনলো। মেয়েটা ধাওড়ায় বিহারী কুলিবস্তির। আর, খড়ি ডুংরীর ওপাশে তেলেঙ্গানা পট্টিতে ছোকরাটা থাকে। দুজনে রক্তে রক্তে যোগ করে অনুভব করছে বেঁচে থাকা কার নাম। মাঝে মাঝে কি বুঝি বলাবলি করছে তারা পৃথক দুই ভাষায়। অস্পষ্ট বোবা স্বর। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, উভয়েই উভয়ের কথা বুঝছে।

মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা ঝট্‌তি উবে যায় দর্শকের মাথা থেকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠল। কোথায় পা পাতবে? হঠাৎ সে ছুটতে শুরু করল। এই দণ্ডে এখান থেকে পালাতে না পারলে সে যেন আর বাঁচবে না।

আনমনা দৌড়তে দৌড়তে একটা চাঁই পাথরের হোঁচট বাঁচাতে গিয়ে, আচম্বিতে তার মনে বৃষ্টি-ঝরণ সেই দিনের কথা ভেসে ওঠে। লাছলীর জলে ভেসে যাওয়া, এবং তার উদ্ধার প্রণালী। সুধ্না এখন যেন সেই সুখ-স্পর্শ অন্তরে অনুভব করল। কপালে নাকে তার ঘাম জমে উঠল। হাত পা কাঁপতে থাকল থরথরিয়ে। কেমন এক ধরনের নেশাচ্ছন্ন টলা-টলা অবস্থা।

সুধ্না ভোলে নি সে সব দিনের কথা। প্রায় রাতেই মাসুনের পানে চেয়ে দেখে খ্যাপা হত বনের মানুষটা। ছটকে বেরিয়ে পড়ত ঘর ছেড়ে। তারপর টিলার পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতো। ভৌতিক আঁধারে নিভৃত ঘরে শুয়ে আছে এক দুধ-পাখা রাজহংসিনী। জানালার বাইরে নিঝুম অন্ধকারে মশার কামড় উপেক্ষা করে সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে থেকে সুধ্না তার সৌন্দর্য উপভোগ করত।

সুধ্না দৌড়চ্ছিল, এবার সে নাবাল জমির দিকে এগুতে থাকল। দু'পাশে আটকিরা, গেমো ও বনতুলসীর ঝোপ।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, ঝুমনি যেন। বাবু মহল্লার একটা বখাটে ছোকরার সঙ্গে মেতে আছে। ছোকরা কোন বাবুর বাড়ির নকর-চাকর হবে বুঝি। ঝুমনি নিজে নতুন স্বপ্ন দেখছে আর তাকে শোনাচ্ছিল সে কাহিনী। আর ছোকরাটাও, ভরাট শরীরের বিধবা ঝুমনিতে ডুবে গেছে যেন স্বপ্ন আর কিস্সায়। গোঙা স্বরে হয়তো বহুক্ষণ পরে-পরে এক-আধটা কাটা জবাবে আবোল-তাবোল কিছু বকছে।

তাহলে বুরনের শোক বেমালুম ভুলে গিয়েছে কসবী ছিনালটা। অবাক্ কারবার, সুধ্নার এখন আর মাসুনের কথা একেবারে মনে পড়ছে না। সে থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। মহুয়া ফুলের মিষ্টি সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। ধারে কাছে কোথাও মুচকুন্দ গাছও আছে বুঝি, গন্ধ পাওয়া গেল। সুধ্নার পা এখন জলদ বাজনায় নৃত্যশীল। না, মাসুনের জন্য কোন

মায়া-মমতা আর তার মনে অবশেষ নেই। নিজে মরে থেকে সুধ্‌নাকেও এতদিন সে মেরে রেখেছিল। সুধ্‌না জোরসে একটা ফুঁ হাঁকালো। এই তো সে দিব্যি হাত-পা খেলাতে পারছে। বসে পড়ে একটা পাথরের কুচি তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা নদী পর্যন্ত গেল না, উড়ে গিয়ে পড়ল ঢালের গেমো বনে। সুধ্‌না হাততালি দিয়ে নেচে ওঠার মতন করল।

তখনো ভালো করে জমে নি বাঁধ রেকার কাজকর্ম। ফলে কুলি পট্টিও এত জমজমাট হয় নি। সুধ্‌না একদিন টিনের তোরঙ্গ হাতড়ে বুঝি কিছু পেয়েছে, হাঁটা ধরেছিল নতুন পাত্তনী ঝুমরী বস্তির দিকে।

পাড়ার প্রথম বাড়িতে পৌঁছেই দরজা ধাক্কেছে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। চিক্‌রি বেড়ার ফাঁকে আলোর জানান পাওয়া গেলে, সুধ্‌নার বুক লকলক করে দুলে উঠেছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ-বন্ধ। অতঃপর দুর্বোধ্য গলায় সে গোঙিয়ে উঠেছিল সেই ঘরের স্বৈরিণীর নাম ধরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধাই তার হয় নি। তখুনি আরেকজন ব্যাপারী খদ্দের সেখানে এসেছে, স্বৈরিণী তাকে ঢুকতে না দিয়ে, সেই ব্যাপারীকে হাত ধরে মহা সমারোহে ঘরে উঠিয়ে দুয়োর দিয়েছে। সুধ্‌নার ঘাড় তখন বুঝি হাঁসের গলার মতন সরু হয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠ থেকে পিকপিক একটা শব্দ কেবল বেরতে পেরেছিল।

ফাঁকা মাঠের নির্জন নিরিবিলিতে সুধ্‌না এখন ডমরুর মতোই লাফঝাঁপ হাঁকাতে থাকল। অর্থহীন তার এই উল্লাস, তবু এই প্রগল্‌ভতা সে কিছুতেই দমাতে পারে না।

সুধ্‌না হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একটা কুল গাছের ডাল ভাঙতে গেল। কাঁটা ফুটে গেল হাতে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে আহত স্থান খুঁটল। কাঁটা উঠে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকল। সুধ্‌নার সেদিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না।

বার বার সেই ছবিটা তার মনে পড়ছে। ভৌতিক আঁধারে নিভৃত ঘরে আলুথালু হয়ে শুয়ে আছে এক দুধ পাখা রাজহংসিনী। জলের ডাকে বেসামাল কাপড়-চোপড়ের নিচে উচ্ছল যৌবন সরোবরের দুই ডুব কলসী।

হঠাৎ বুঝি শিস্ শুনলো কারো। পিছন ফিরে চাইল সুধ্না। আরে কারবার, মাস্তুন দাঁড়িয়ে আছে দেখি! শীর্ণা একহারা চেহারা। কিন্তু টিলাময় বক্ষ। ঢিলে কিচ্ড়ির আবরণে চটক উঠেছে খুবসুরত। অদূরে ঝাঁকড়া কেঁদ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে খিটখিট করে হাসছে আর চোখের ইশারায় নোংরা ইঙ্গিত করছে।

সুধ্নার বুকে-মুখে খিল। গায়ের রোম সব দাঁড়িয়ে গেছে। হ্যাঁচকা ভয়েতে চিৎকার করে উঠতে গেল। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুলো না। প্রেতিনী মাস্তুন ততোই অঙ্গ সঞ্চালন করে হাসতে থাকল খিটখিট করে। সুধ্নার মনে হল, সেদিন যে ভাবে গলা চেপে মারতে গিয়েছিল সে মাস্তুনকে, ঠিক তেমনিভাবে কাঠি কাঠি আঙুল দিয়ে মাস্তুনই যেন আজ উল্টে তার গলা টিপে ধরেছে। তাই স্বর বের করবার আর কোন উপায় নেই। এবং এই ব্রহ্ম ফাঁস থেকে বাঁচবারও আর কোন পথ খোলা নেই।

অদৃশ্য এক যাতনায় ছটফটিয়ে উঠল সে। মাথা ঘোরা তার আরো বেড়ে গেল। অস্বচ্ছ ঘোলাটে দৃষ্টি। আকাশ, দূরের মাঠবন, সব যেন চলন্ত। এক অদ্ভুত ছন্দে দুর্নিবার বেগে ঘুরছে সব কিছু। পা পাতবার জায়গা নেই কোথাও। উঁচু উঁচু সব। কি করবে, কি করবে সে? ঘামে ভিজে উঠল সর্বাঙ্গ। মাথার শিরা লাফাতে থাকল দবদবিয়ে। শ্বাসপ্রশ্বাস ঘনীভূত হয়ে ক্রমে অসাড় হতে আসতে থাকল হাত-পা। হাত বাড়িয়ে সামনের ঝোপের ঝুঁটি ধরতে গেল। কিন্তু সে তো নাগালের মধ্যে নয়, বেশ খানিকটা দূরে, সুতরাং পারল না। অথচ একটা সুনিশ্চিত অবলম্বন তার

চাই-ই এই মুহূর্তে। সে খুঁজতে থাকল হাতড়ে হাতড়ে। অর্ধস্ফুট গোঙানিতে খানিকক্ষণ মোচড় খেয়ে, পরে একসময় জ্ঞান হারিয়ে ধুপ্ করে আছড়ে পড়ল মাটির ওপর।

তখন ভয় পাওয়াটা আবার শুধু সুধ্নার একার নয়। প্রেতিনী মাসুনের চেহারার মেয়েটিও যেন কেঁপে যায়। একজন মানুষ শিস্ শুনে ফিরলো। এগিয়েও এল খানিক, নিয়মের কোন ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে। তারপরই যে হঠাৎ কি হল, বিড়বিড় করে আপন মনে কিছুটা বকে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে ঢাঁই করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বিহারী কুলিবস্তির রেণ্ডী মেয়ে, এ যেন তার কাছেও অভাবনীয় রকম-সকম। সেই চরম মুহূর্তে আবার কোথায় বুঝি একটা পাগল খ্যাটখ্যাট করে অট্টহাসি হেসে উঠল। সমগ্র দিক্‌পট যেন অবলম্বন ছেঁড়া, ছিন্নভিন্ন হয়ে, বনে বনান্তরে লুটোপুটি হয়ে গেল।

নদীর পাড় ভাঙার সেই চকিত আলোড়ন ডাকা শব্দ আজো পুরোপুরি বন্ধ হয় নি। সঙ্গে খোনাস্বরের কান্না। তারপর বুরনের আকস্মিক মৃত্যু আরেক প্রস্থ ঘাই দেগে গেছে সমগ্র বাঁধ রেকা জুড়ে। প্রেতিনী মাসুনের বুঝি মনে হল, সারা দিক্‌প্রান্ত ঘিরে কিছু একটা অঘটন ঘটার আয়োজন চলেছে। ফলে, তার ভড়কানি কেমন বেড়ে গেল। এবং সুধ্নার মতোই কণ্ঠে কেবল একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করতে পারল। তারপরই পিছোলো পায়ে পায়ে। খানিক হেঁটে, শেষে পিছন ঘুরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করল।—ওগো, বাবা গো। দানো, ডাকাবুকো গ। মর্ গৈল। বাঁচাও।

তীব্র, তীক্ষ্ণ শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে পঞ্চানন এক সময় চোখ মেলল। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা, মাথা দুঃসহ ভার হয়ে আছে। মুখ তেতো-তেতো। ভাঙা-ভাঙা ঘুমের মধ্যেই টের পেয়েছে, রঙলা কাজে বেরিয়ে গেল।

এখন চোখ খুলেই বুঝতে পারল, অনেকক্ষণ হল দিন শুরু হয়ে গেছে। বাইরের উঠোন-অঙ্গন রৌদ্রধারায় প্লাবিত। গাছে গাছে তারই দৃপ্ত অঢেল সমারোহ। নিকটেই কোন বৃক্ষ শাখায় একটা কাক ডাকছে বুঝি। ডাকটা বড় কর্কশ, রুক্ষ। ভীষণ কানে বাজে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে পঞ্চানন উঠে বসার চেষ্টা করল। আর সেই মুহূর্তে তার গত ক'রাত্রির কথা মনে পড়ল।

রাত্রির কথা মনে হতেই, এই স্পষ্ট আলো ঝলমল সকালেও গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে যাবার দাখিল হয়। বস্তুত রাত্রিগুলোকে তার মনে হয়, যেন বিশাল শরীরের এক-একটা ময়াল সাপ। সময় গভীর হলেই, বজ্র মোড়কে তার গলা-বাহু-স্কন্ধ পেঁচিয়ে ধরে হেঁচ্কা টান হাঁকাতে থাকে। তরল এক টাটানিতে মেরুদণ্ড পর্যন্ত শির-শির করে উঠল পঞ্চাননের। আকাশ দেখল। বাইরের বন-বাদাড়ের দিকে চোখ ফেরাল। সর্বত্রই আলোর রাশি রাশি ফেলাছড়া। তবু অস্বস্তিটা তার কাটল না সহজে। বীভৎস কুটিল থাবাড়িতে রাত্রির আতঙ্কটা মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে বাজতে থাকল বহুক্ষণ ধরে।

অস্পষ্ট নিশীথালোকে বাওয়া মেয়ে তার পানে চেয়ে হাসে। হাত ধরে আশ্লেষ ভরা গলায় বলে, মরদ যখুন, লিচ্চয় ভালাই লাগবেক তুয়ার। বলে প্রায় তার গায়ের ওপর উঠে এসে বসে। রঙলার উদাম শরীরের সোঁদা গন্ধ বাউলের নাকে লাগে। ভারী বুকের যৌবন-কুণ্ড ছুঁয়ে যায় মুখের পাতা। এত অবধি তবু হয়তো কোন অসুবিধা হয় না পঞ্চাননের। সে এক রকম প্রায় দম চেপে ব্যাপারটাকে হজম করে। কিন্তু তারপর রঙলা যখন আরো ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে, ক্রমেই সে অস্থির হয়ে ওঠে।

রাস্তা দিয়ে গাবগুবি যন্ত্রে টংকার তুলে পঞ্চানন চলেছিল।

বাপ্‌ রাখুয়া ডেকেছিল, কে যায় গ? আয় লাই, ইখেনে। কে বটিস তু?

পঞ্চানন এসেছিল। বলেছে, বেশ, তবে টুকুন বসলাম তোমার ঘরের দাওয়ায়। এট্টুস জিরায়ে নি।

—হাই, তা' বসবি বৈ কি। ই আবার জিজ্ঞাসার কি আছিক, আঁ? বস্‌, বস্‌। বুড়ো উথলে উঠে বলেছিল।

এমনিতে ঠাওরে বিশেষ তেমন গণ্ডগোল নেই। শরীরটা তেমন মজবুত নয় বলে, কোন কামে-কাজে বেরয় না। কথা কওয়ার মানুষ একজন ঘরে ছিল, কিন্তু বাঁধ রেকার কাজে সে জুতে যাওয়ায়, দিনের অধিকাংশ সময়ই বুড়োকে একা-একা গুজরান করতে হয়।

বুড়ো সর্দার জানতে চেয়েছিল, আগে ত কুনোদিনও দেখি লাই কুটুমকে। তা, লয়া লিকিন গ হেথাকে?

পঞ্চানন স্মিত জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ।

—তা কেনে, হেথাকে কেনে? কামের চেষ্টায়? বুড়ো প্রায় উথলে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল।

—না। আমি কোন কাম জানি না। গান গাই।

—আঁ, গান? বুড়ো যেন আরো ধাঁধায় পড়ে গেছে। আদৌ বোঝে না পঞ্চাননেব কথা। বিস্মিত হাসে, তা, হেথাকে কেনে গ, ইটো কি গানের থান, আঁ? বাঁধ রেকা শেষে গানের থান হল?

আর কথা ছিল না পঞ্চাননের মুখে। কিন্তু সে চুপ থাকলে কি হবে, অনেকদিন পর বুড়ো তার একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁকে একজন কথা বলার মানুষ পেয়েছে, এখন তাই অনর্গল বকতে চায়। খুঁচোলে, তা, হঁ গ, ফুঙ্গি-টুঙ্গি লিকিন তু? হেরানাহড়?

পঞ্চানন কাশল, মন্দ ধরো নি। ঘর বলে আমার কিছু নাই। পথই, ঘর করেছি।

ব্যস, ব্যস! আর বলতে হবে না। খুটখুটিয়ে হেসে কুটোপাটি হয় পাচ্‌গি সর্দার। বলে, কেনে দাগা লিয়েচিস লিকিন কোড়ামে? ব্যথা পাওয়া বক্ষ। এতখানি বয়েস হল, মানুষঘর ছেড়ে বিবাগী বৈরাগী হয়ে নিরুদ্দেশে ভাসে কেন, তার কারণ কি আর অজানা আছে কিছু? বলে, আবার হাসে।

পঞ্চানন চুপ।

রাখুয়া একটু যতি দিয়ে পরে বলেছিল, বেশ, তবে একখান গান কর গ, গায়েন।

পঞ্চানন রাবাকে টুংটাং সুর তুলে, গলা ছেড়েছিল।

সর্দার প্রশস্তি করেছে, চমৎকার। এমনভাবেও মানুষ গাইতে পারে? জাদুকণ্ঠ গ।

—তোমার ভালো লেগেছে সর্দার, তবে আমার গান গাওয়া সার্থক! ধন্য আমি।

বাওয়া পাচগি সর্দার তখন যেন আনন্দাতিশয্যে পারলে পঞ্চাননকে জড়িয়ে ধরে। পরে, অনুরোধে ভেঙে পড়ে বলেছিল, ইখেন ছেড়ে তু আর কোথাও যেতে পারবি লাই গ ফুঙ্গ। তু মোদির মেহমান বটিস। পাকা হয়্যা গেল কথাটো।

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে গায়ের ব্যথাটা আবার মালুম হয়। আর সেই সূত্রে গত ক-রাত্রির কথা সহসা স্মরণে উদয় হল। অবশেষে রাত্রির প্রসঙ্গ ধরে রঙলার মুখ, তার অদ্ভুত আচরণ মনে পড়ল।

বহুদূর বনান্তর হতে যেন ডাক দেয় রঙলা, আয় গ। বলে তার হাত ধরে টানে। উঠবে না-উঠবে না করেও শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ায় পঞ্চানন। রঙলার শরীরের সোঁদা গন্ধ মাদকতাপূর্ণ মিষ্টি আঘ্রাণ ছড়ায় তার উষ্ণ মস্তিষ্কে। দেহে স্পর্শের আবিল মন্থর আবেশ আনে। রঙলা তখন ফিসফিস করে আবার বলে ওঠে, কি, দেখিস কি গ, তখুন থিক্যা তাক্যে তাক্যে।

পঞ্চানন যদি আকস্মিক বেফাঁস বলে ফেলল, তোমাকে রঙলা। রঙলা আরো ঘন হয়ে চেপে বসে। গুমগুম করে হাসে, আই, তবে যা ভাবছিলম, ফুঙ্গি মোর গুঙ্গাহড় লয় গ। বোবা নয়। বলে দুর্বার খ্যাপামিতে আরো মত্ত হতে চায়।

পঞ্চানন খাপচি কেটে ওঠার মতন ডাক ছেড়ে ওঠে, আঃ, করো কি, ছাড়। রঙলার ভুরু নড়ে। হাসে, তু মোর প্রথম পুরুষ। মিৎ মানওয়া গ—। ওই কথায় আরো ঝাঁ ঝাঁ করে বুঝি মাথা ঘোরে পঞ্চাননের।

শুয়ে শুয়ে এই মুহূর্তে পঞ্চাননের আরেকটি মুখ মনে পড়ল। সে-ও ছিল রঙলারই মতন মেয়েমানুষ। নাম, লক্ষ্মীদাসী। লক্ষ্মীদাসীও একদিন তাকে অমনি করেই ডেকেছিল। কাছে টেনে নিতে চেয়েছিল সঙ্গসুখের আশ্লেষে ডুবিয়ে। কিন্তু অপারগ সে—

এই ভাবনার প্রসঙ্গে পঞ্চানন সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বুকের নিভৃতে যে অতি সূক্ষ্ম গোপন যাতনাটা আছে, যে কারণে সে আজ বৈরাগী, এখন তা যেন হঠাৎ সোচ্চার হয়ে পড়ে। পঞ্চানন তখন আর বিছানায় বসে থাকতে পারল না। সূর্য ঝলমল সকাল তার চোখের ওপরে কেমন পাক দিয়ে ফিরল। বাইরের দাওয়ায় উঠে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দূর দিগ্‌-দিগন্তে দেখলে।

উঠোনের ওপর জাম্বীর গাছের ছায়া দীর্ঘ হতে হতে এক সময় এসে তার পা ছুঁলো। বোধহয় কোন একটা জানোয়ার লুকিয়ে রয়েছে সামনের বাদাঝোপের অরণ্যে। সেটা বার বার ঝোপ নাড়ছে। কিন্তু নিকটেই পঞ্চানন থাকায়, বেরুতে পারছে না সাহস করে। সে মনে মনে সাব্যস্ত করল, নিশ্চয় ওটা কোন গো-সাপ হবে।

দুপুরে একফেরী কাজের বিরতির মাঝে রঙলা এল। চোখা-চোখি হল চার চোখে। বাওয়া মেয়ে হাসল, কি, ঘুম হল?

পঞ্চানন কোন জবাব দিল না।

রান্না-খাওয়ার পাট মিটিযে রঙলা চলে যায়। পরে সন্ধ্যার মুখোমুখি সমযে ফিরল।

ফিরেই আবার পঞ্চাননকে নিয়ে পড়ে। পঞ্চানন হাই হাই করে উঠে, আঃ ছাড়। কেউ দেখে নিবে।

রঙলা ক্রুদ্ধ ঝামটা দেয়, এত ডর কেনে তুয়ার? রোগ লিকিন? মেয়া দিখলিই মরিস যি ডরে।

পঞ্চানন এক পলক থমকে যায়। এমনি ঝংকারে লক্ষ্মীদাসীও তাকে অষ্টপ্রহর ধমকাত। অতি নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন সেই মধুর সম্পর্কেও ফাটল ধরেছে। লক্ষ্মীদাসী তাকে ছেড়ে আশ্রয়ের হাত বাড়াল অন্যদিকে। পাশের গাঁয়ের আখড়ার, মোহন্ত মাধবদাস বাবাজীর সেবাদাসী হয়ে চলে গেল।

ফিরেবার রঙলা যখন একই প্রশ্ন করে, কি ভাবিস এত, আঁ? এত ডর পাশ কেনে? সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পঞ্চানন হঠাৎ ফুঁকরে উঠল, একটা কথা কব একটু দম নিয়ে গুনগুনিয়ে নিরুচ্চাবে পরে বললে, আমি এবার চলে যেতে চাই এখান থেকে।

রঙলা থতিয়ে গিয়েছে।—কুথাকে যাবি গ, আঁ?

—তার ঠিক কি? দু চোখ যেদিকে যায়। যেমন টানে একদিন ইখেনে এসেছিলাম।

জাপান দেশের সুন্দরী সুলভ হাসাহাসি করছিল রঙলা। তার চক্ষু সহসা ঘন হয়ে উঠেছে পঞ্চাননের কাঁধের পাশে।—ফুঙ্গি, এমুন কাথা বুলিস কেনে গ?

—কেন, যেতে তো হবেই একদিন। আজ কিংবা কাল।

—বেশ, তবে মোরেও সাথ্ নে চলিস।

—তাই কখনো হয়। পঞ্চানন ক্লিষ্ট হাসে আমি যে বাউল। ঘর নাই, ঠিকানা নাই আমার।

—উ কথা শুনতে চাই লাই—।

—না গো, মেয়া। তা হয় না।

—তবে তু-ভী যেতে লারবি। রঙলা সহসা উদ্দাম হয়ে চিৎকার করে বলে, হুঁ, তবে তু ভি যেতে লারবি গ। অবশেষে দুর্বার কান্নায় ভেঙে পড়ে দুই চক্ষু ভাসায়। পরে দৃঢ় মুঠিতে পঞ্চাননের দুই হাত চেপে ধরে উন্মাদিনীর মতো ঝাঁকি দিতে থাকল।

পঞ্চানন শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বললে, আঃ ছাড়।

—নেহী। আগে বল্, কথা দে। মোদির ছাড়্যে যাবি লাই কোথাও। কোনদিনও।

—তাই কি করে বলি এখুনি? কিছুই তো চিরস্থায়ী নয় দুনিয়ায়। পঞ্চাননের গলা এবার আর যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। বারেক ঠোঁট ও কাঁপল বুঝি।

রঙলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক্ষণে বলে উঠল, মো যি অনেক চেয়াছিলম গ, ফুঙ্গি। বহুদিনের কুশি সে-সব। বাসনা। কিছুই মিলবেক লাই তার, হাই গ! অতঃপর তীব্র যন্ত্রণায় যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে পঞ্চাননের কোলের মধ্যে।

তখন পঞ্চাননের চোখও আর বাধা বন্ধন মানে না। বুকের নিভৃতে যে অসহায় গুমোট ব্যথার মোচড়টা লুকিয়ে রয়েছে—তা' যেন শত সহস্র মুখে বিকট আওয়াজে ডেকে ওঠে। পঞ্চানন সেবার রঙলার মতোই হু-হু করে কেঁদে উঠল। দুপুরের সেই গো-সাপটাই যেন ডেকে ডেকে থমথমে সন্ধ্যার দিক কাঁপালো।

রঙলা বললে, কাথা দ্যে, যাবি লাই মোদির ছাড়্যে। আর লয়ত, মোকেও সাথ ল্যে যাবি। বলে তার কটিতট নিষ্পিষ্ট করল শক্ত সর্পিল মুঠোয়।

পঞ্চানন তখন অবাধ্য তাড়নে কান্না-ভাঙা কণ্ঠে বলে উঠল, বেশ যাব না। তারপর আর কোন বাক্য সরে না তার মুখ দিয়ে।

দু'জনে একসঙ্গে এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

শহরে যাওয়ার নেশা এখনো ঘোচে নি যতনের। এখনো সে কথায় কথায় শহরের ফলাও গল্প বলে। লেঙটির মতো ছোট বস্ত্র খণ্ড এখন আর কোন বাওয়া পুরুষই পরে না। যতন বাবু-মানুষদের মতন শার্ট-প্যান্ট পরে। প্যান্টের পকেটে হাত পুরে পা ফাঁক করে এক বিশেষ কায়দায় দাঁড়ায় সে। মুখে তখন সিগারেট জ্বলে। সেইভাবে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে চেপে সে শহরের বিশদ গল্প বলে যায়। আর আফসোস করবে: আজ পর্যন্ত শহরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারল না বলে।

ভাব তার মঙলি নামের একটা মেয়ের সঙ্গে। ভাসা ভাসা দুই সরল চোখে সেই মেয়ে যতনকে দেখে। আরণ্যক জগতে সে যেন একজন ব্যতিক্রম পুরুষ। যেমন চালেচলনে, পোষাক-আসাকে। তেমনি কথাবার্তায়। একেবারে মারাং বাবু। প্রায়ক্ষণই মঙলির কানে গুনগুনিয়ে সে মধু ঢালে, হুঁ, হুঁ, দেখিস গ। যিদিন শোহুর যাব, কেমুন মজা হবেক। তু বাওয়ানী মেয়া থিক্যা, বিবি বনবি।

আজ আর প্রেমের কারণে, জাদান দেশ ছেড়ে পালানোর কোন প্রয়োজন নেই। প্রাচীন দিনের সনাতন জীবন-ভাবনা ইদানীং-কালে আমূল বদলে গেছে। কেউ আর এখন ওই সব স্থূল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, হৈ-চৈ বাধায় না। অজাতিয়া ঘোষণা করা, অথবা পঞ্চায়েত আসর ডাকার রেওয়াজও উঠে গেছে। মুরুব্বির মতন মানুষ পর্যন্ত অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। সেই উৎকট দাপাদাপি আর নেই। বুরনের আকস্মিক মৃত্যুর পর সমগ্র বাঁধ বেকা জুড়ে যখন কিছুদিন ভয়াল বিচিত্র এক আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিছুটা অবশ্য সরব হয়েছিল ডমরু। তারপরই আবার যে-কে-সেই ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে। যতনের কাছেও ও-সব কোন প্রতিপাদ্য সূচী নয়। শহরে যাবে সে আসলে, মানুষের মতন বেঁচে থাকবার জন্য।

অতশত বোঝে না বাওয়ানী মেয়ে। সে জানতে চায়, শহরে গেলে খুব মজা হয় বুঝিন?

—নয়ত কি? যতন খিলখিলিয়ে হাসে আর বলে, মজা বলে মজা। খু-উ-ব মজা।

প্রকাশ্য দিবালোকেই মঙ্‌লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলে যতন। কোন ঢাক-ঢাক গুড়গুড় ব্যাপারের মধ্যে সে নেই। লজ্জা-সরম তার লাগে না কোন কিছুতেই। হাসে, হুলাড় করব, তার আবার অত চাপাচাপি ঠাসাঠাসি কিসির লেগে রে, বাবা? কারো পইসায় ত আর কবি লাই। হুঁ-হুঁ। আপ্‌না গতরে করি, আপ্‌না ট্যাকে করি গ, হাঁদে।

বাওয়ানী মেয়ে ছড়া বলে, হঁ, মবদ ভারি মোনাউতরে হেলাকি ছোম্। একখানা দারুণ কর্মবীর আমার মালিক।

যতন তাইতেই আবাব খুশি হয়। কিন্তু স্বভাবমতো মুখে ঝামটানি দিতে ছাড়ে না।—মোর সাথ্ দিল্‌লাগী করচিস লাই ত? তবে কিন্তুন একুবারে খতম কব্যা ফেলাব।

কাজের মধ্যেই যতন গান গেয়ে ওঠে। হাত মুখ নেড়ে নানান মুদ্রা করে সুরের তালে তালে। রুমাল উড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনের সঙ্গে মঙ্‌লির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ফস্ করে হয়ত ওর কিচ্‌ড়ির আঁচলটা টেনে দেয়। তারপরই হা হা করে হেসে খুন হয়।

মঙ্‌লি খোঁটা দেয়, ধুত্তোর, সবেতেই বাড়াবাড়ি তুয়ার।

যতনের হাসি তখন বুড়ো ব্যাঙের ডাকের মতন শোনায়।—নিরালা খুঁজবে উকর দল। গুবরে পোকাবা। মো কি তাই লিকিন ঘোড়ার কলা, সরমে মরব যি।

– না, সর‍্যে যা। সর্বদা এত্ত বাড়াবাড়ি ভালাই লাগেক লাই বাপু।

এই কথা যদি বলল, যতনের মেজাজ অমনি বিগড়ে যায়। বেদম চটে উঠে, আরেক চেহারা ধরে।—বাড়াবাড়িটা কি দেখলি, রেণ্ডী মাগী। জেবনে কটা মরদ পেছিস, মোর মতুন, আঁ? বলে মুরুব্বির

কায়দাতে এমন লাফ-ঝাঁপ হাঁকাতে থাকে, মনে হবে, এখুনি বুঝি দু'ফালা করে কেটে ফেলবে তাকে।

অবশ্য ঝগড়ায় এক তরফা যতন জিতবে, সহজ নয়। খেপলে, বাওয়ানী মেয়েও তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। ঝামটা মারে।—চোখের মাথা খেয়ে, দেখেচিস লিকিন মোরে, কুনো ছিনাল বৃত্তি করতে ?

যতন তখন লাগ-সই কথাখানা হাতড়ে বেড়ায়।—তবে উ বাত্ বুললি কেনে ? ভালাই লাগেক লাই।

—তাই বলে মোরে রেণ্ডী ক'বি ?

—বেশ, আর কুনোদিনও ক'ব লাই। এক কথাতেই সহজ আত্ম-সমর্পণ করে।

—নিজে পাজী হলে, দুনিয়ার সকলরেই পাজী মনে হয়।

যতন সেবার আরো চুপসে যায়।

এমন আকঞ্চিৎকর তুচ্ছ প্রসঙ্গ ধরে কলহের সূত্রপাত হয়, ভাবাও যায় না। আর রোজই একবার না-একবার এইভাবে তাদের ঝগড়া হবেই। তখন যতন ও মঙলি উভয়ে উভয়ের প্রতি চরম অবহেলাভরে এমন সব কটূক্তি প্রয়োগ করতে থাকে, যার পর বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, একটু পরেই আবার তারা পরস্পরে নিবিড় ঘন সান্নিধ্য রচনা করে সুখস্বপ্নে বিভোর হবে।

পুঁটুলিতে বেঁধে খান কয়েক বজরার রুটি, আর যা হোক একটা কিছুব তরকারি নিয়ে আসে মঙলি। বাওয়া পাড়ার অনেকেই ওই বকম আনে। এক ফেরী কাজের মধ্যে কিছু একটু মুখে না দিতে পারলে, মন লাগে না কাজে। মাটি কাটা এবং বওয়া-বয়িতে দৈহিক শ্রম কম হয় না। ফাঁকা প্রান্তরে মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে গনগনিয়ে। ধারে কাছে ছায়া বলতে কিছু নেই। ঘামে সর্বাঙ্গ জবজবে হয়ে থাকে। কিছু • কটু খেয়ে নেবার পর আবার কাজে মন বসে। নইলে উড়ু উড়ু ভাবটা কাটতে চায় না।

বাঁধ রেকার জলে হাতমুখ ধুয়ে এক ফাঁকে নাস্তা সেরে নেয় সকলে। বিহারী রেজা মুণ্ডা ও তেলেঙ্গী কুলিরা বেশী আনে আমানি পান্তা ভাত। বাওয়ারা যেখানে সেখানে ভাত খাওয়া পছন্দ করে না। বিহারী রেজা মুণ্ডারা আবার আরেক রকম নাস্তা নেয়। আহিজুল মিঞা এবং পিয়ারীলালের খুপ্‌রি খানা-দুকানে তৈরি হয় সেই সব ভাজি পদার্থ। ডালের বেসনে মেখে, আলু, কুমড়ো, ঝিঙ্গুর, সুন্নুমে ভেজে তোলা হয় গরম-গরম। পরে মুড়ীতে মিশিয়ে জলের ছিটে দিয়ে মাখা চলে ভালমতো। অতঃপর লাফা লাফা গরসে মণ্ড খাবার নিঃশেষ হয়।

যতন এসবের কোনটাই দু'চোখে দেখতে পারে না। বজরার রুটি চিবোতে পারে না, বড়ো শক্ত। আর কেমন ভূষির মতো আস্বাদ, দাঁতে লেগে যায়। তারপর, যত্রতত্র হাত ধোয়া নেই, ভালো করে গুছিয়ে বসা নেই, অমনি গোগ্রাসে খেতে আরম্ভ করে দিল—ওই ইতরামিটা আরো অসহ্য মনে ঠেকে। বিহারী রেজাদের খাওয়ার ভঙ্গিমা দেখলেই শরীর আপসে ঘুলিয়ে ওঠে। শহরের বাবুরা কখনো ওইভাবে, কিংবা ওই সব নোংরা খাবার খায় না। এই প্রসঙ্গ ধরেও কমদিন মঙ্‌লির সঙ্গে তার কুট্টাকুট্টি বাঁধে নি।

যতন নাস্তা খেতে বাবু মহল্লায় গোপাল কিষণের দোকানে যায়। তার পরিহিত লঙ্‌ প্যাণ্টের পকেটে সর্বদাই অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটা চামচ থাকে। সেই চামচেয় কেটে কেটে শহরের মানুষদের মতন খানা খায় যতন। যখন যা কিছুই খাক্‌, হাত দিয়ে খায় না সে। বলে, তাফিন্‌ করব, হাতে কি গ? আদপ জানি লাই লিকিন?

সুপ্‌সুপ্‌ করে উত্তপ্ত এক রকম রঙীন পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয় যতন। চুমুক দেয়, আর আঃ-আঃ ধ্বনিতে খুশিয়ান চরম আমেজের ভাবটা প্রকাশ করে। বাওয়া মানওয়ারা সেই উত্তপ্ত তরল পানীয়ের নাম শোনে, 'চায়' না-কি বলে যেন! যতন

খ্যালখেলিয়ে হাসে, হঁ-হঁ, ই পাচন বস্তির দাওয়াই গ। এক ঢক্কর খেলেই চাঙ্গা।

জাদান দেশের পট্টিবাসী ঘরের তৈরি কোন রান্না ব্যঞ্জন আজকাল আর মুখে তুলতে পারে না সে। বিদ্ঘুটে স্বাদের জন্য তো বটেই, তারপর গা ঘিনঘিন করে আরেকটা কথা ভাবলে। গিদরা-পিদরারা হয়ত মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কখন রুটির বাটিতে হাত পুরে দিয়ে যথেচ্ছ ছানাছানি করেছে। অথবা, ধুলোবালি সমেত হাতে এক খাবলা চোখা তুলে নিয়েছে, পাত্রে কব্জি পর্যন্ত ডুবিয়ে। ছোটবেলায় যতনও অমন কত করেছে। আয়ু ঘরের কাজে হয়ত এদিক ওদিক গেছে, দেখ্ না-দেখ্ একবার চেটে নিয়েছে সব রান্না সব্জির ওপরে।

ফিট্ফাট্ যতন পট্টির উদোম ন্যাংটো ছেলেমেয়ে দেখলেই ঢেলা ছুঁড়ে মারে।—এঁহে, সভের ঝারিরা। যা, পাছায় কিছু চড়া গা জলদি। পরে ফুঁক্ফুঁক সিগারেট ফোঁকে আর বিরক্তি প্রকাশ করে।—ধেত্তেরি, এমন এট্টা জাতে জনম্ নিলম্ শালা, সব মাল এক্কবারে জংলি গ, হাঁদে।

মঙ্লিকে খাস শহুরে করবার চেষ্টায় সেই কারণেই আরো বেশী করে যত্নশীল হয় যতন। ওপারের গঞ্জের বাজার থেকে—বাবু মানুষদের মেয়েরা কাপড়ের নিচে যেমন রাউজ-কাঁচুলি পরে - এনে দিয়েছে। মঙ্লি অবশ্য সেই সব ঠিকই পরে, কিন্তু চাল-চলনটা এখনো ভালমতো রপ্ত করতে পারল না। সবেতেই বোকা বোকা কৌতূহল আর পাগ্লা ঝোরা হাসির ধারা।

যতন যদি বকলো, মঙ্লিও অমনি পাল্টা উত্তর দেয়, মো কি আখুনি বিবি হয়্যা যেছিন লিকিন, আঁ?

যতন ফোঁসে, তাই বল্যা, আজও হাটুক আছিস?

মঙ্লি ছড়া দেয়, গুতি হোয় কিষাঁড়, নোলে ঝুম্ সেকা। চাকর হল প্রভু, গান ধরেছে বোবা।

যতন তখন একটু যেন অস্বস্তি বোধ করে।

সেদিন কাজের ফাঁকে মঙ্‌লির কাছে এসে পকেট থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের কাগজের ঠোঙা বের করল যতন। নানান রঙ-বেরঙে ছাপানো। তেলতেলে কাগজের উপর রঙের ছবিগুলো ফুটে আছে সুন্দর। হেসে অতঃপর বাওয়ানী মেয়ের কাছে জানতে চাইল, বল্‌ ত ইটো কি?

মঙ্‌লি ইতিপূর্বে ওই ধরনের ঠোঙার মোড়ক আর দেখে নি। ঠোঁট ওলটালো।—কে জানে। তারপরই কৌতূহল ভরে মোড়কটা টেনে নিতে চাইল দেখবার জন্য।

যতন দিল না। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। পরে, স্বভাবমতো সবজান্তার কায়দায় হেসে উঠল খলখলিয়ে। বললে, হেঁ-হেঁ, বাবা! দেখে ত সকলেই বুলতি পারবে গ। আগেই ক' দেখি, কি আছিক ইর মধ্যি।

মঙ্‌লি এবারো ঠোঁটের সেই একই ভঙ্গি করলে।—জানি লাই। দেখি লাই কখুনো, কি কর‍্যা কব।

যতন সেবাবে তার অভ্যস্ত বাহাদুরী ঢঙে ঠোঙার মুখ ফাঁক করে কি একটা জিনিস যেন টেনে বের করল। তারপর সেটা তার চোখের ওপর তুলে ধরে কলকল করে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ইবাবে দেখে ঠিক কর‍্যা বল্‌ দেখি। দেখি, কেমুন পারিস।

মঙ্‌লি এইবারও পারল না। ভুরু কুঁচকে প্রবল আগ্রহ ভরে বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই বুঝি সক্ষম হল না। মাথা নাড়ালে।—লাই রি, বুলতি লারলাম। দেখি লাই কখুনো--

যতনের এবার যেন সহসা ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। খেঁকিয়ে উঠল, বিকুট (বিস্কুট) খাস্‌ লাই লিকিন কুনদিনও, ঢেমনী কাঁহিকা। এট্টা যদি কিছু শিখে গ।

—আই, বিকুট বাঁধা হয়েছে ঠোঙার মধ্যে! তাজ্জব কারবার যত।

বিস্কুট-কেক কিছুই চিন্‌তো না আগে মঙ্‌লি। যতনই তাকে দোকানে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে চিনিয়েছে সব কিছু। কিন্তু সে-সব বৈয়ামে ভর্তি করে রাখা অবস্থায় দেখেছে। অনেকদিন পরখও করেছে হয়ত কোনটার স্বাদ। কিন্তু এমন সুন্দর কাগজে মোড়ক বাঁধা বিস্কুট, ইতিপূর্বে আর কোনদিনও দেখে নি।

যতন বললে, ই বিকুটের নাম, কেক গ। বড় উম্‌দা চিজ, হঁ। বলে মঙ্‌লির পানে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরে ডাকলে, নে, খা। দেখ্‌, কেমুন জিনিস। এতক্ষণে তার রাগ কিছুটা নরম হয়। মুখখানা আবার হাসি হাসি হল।

মঙ্‌লি হাত বাড়িয়ে জোমের বস্তুটা নিল। খাওয়ার জিনিসটা। নিয়ে, টিপে টিপে দেখল, বেশ নরমই বলতে হয়। পরে নাকে ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকলো। মিষ্টি আবেশময় একটা আস্বাদ।

অনেকদিন আগে যতন তাকে শহর থেকে 'বাক্স লাড়ু' এনে খাইয়ে এমনি ভড়কে দিয়েছিল। চিরদিন শালপাতার ঠোঙায় খেয়ে অভ্যাস। যতন লাড়ু নিয়ে এসেছিল অদ্ভুত মোড়কের এক বাক্স করে। গাঁওইয়া প্রত্যেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।—লাড়ু বাক্সে থাকে লিকিন?

যতন ভাবিক্কি চালে জবাব করেছিল, থাকে, থাকে। ই লাড়ু বাক্সেই থাকে।

—তবে ত ইর নাম 'বাক্স লাড়ু' গ।

—তা, তুয়ারা যা বুলিস।

মঙ্‌লির সেই ঘটনা মনে পড়তেই, কেক-বিস্কুটে নাক ঠেকিয়ে আরেকবার ঘ্রাণ নিল। গন্ধটা অনেকক্ষণ ধরে স্নায়ুতে হামা দিয়ে বেড়ালো। পরে ফিক্‌ করে হেসে ফেলে। বাস্তবিকই যতন তাকে খুবই ভালবাসে। শহরের বাজার থেকে নতুন কি বস্তু চালান এল জাদান ঘরে, অমনি তার কেনা ই। তারপর তড়িঘড়ি নিয়ে আসবে মঙ্‌লির জন্য।

মঙ্‌লি ঠোঙাটা ফাড়তেই, যতন নিজের লঙ্‌ প্যাণ্টের পকেট হাতড়ে নিজস্ব চামচখানা বের করে ধরল।—এই নে, এটা দিয়ে কেটে কেটে খা।

মঙ্‌লি আমল দিলে না সেই কথায়। আল ধারেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে কামড় লাগাল কেক বিস্কুটের ওপরে।

মুহূর্তে যতন আবার অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। কিছুতেই আর ওকে শহুরে আদপে তৈরি করা গেল না। হুংকার দিল, কি রি, স্বভাব বদলালি লাই কিছুতে?

মঙ্‌লি সেবার রহস্যময় গলার আওয়াজে সেই একই উত্তর করে, তবে কি, আখুনি মো বিবি হয়্যা যেছিন লিকিন?

যতন তখন আরো জ্বলে ওঠে। পা দিয়ে ধাঁই করে শুক্‌নো ধুলোর ওপরে ক্রুদ্ধ লাথি মারে। তারপর ক্রোধ ভরে তার সঙ্গ ছেড়ে হাঁটা ধরল।

—হাই, মারাং বাবু গ!

পিছনে মঙ্‌লি হেসে যেতেই থাকল। কখনো কখনো যতনকে শহুরে বড়বাবু বলে রাগাতে ওর মন্দ লাগে না। যতন চলে গেলে মঙ্‌লি ওর গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। যা গরম পড়েছে আজ কিছুদিন হল, বাইরে যেন বেরোতেই ইচ্ছে করে না। রোজই সাজ হয় আকাশের, মনে হয়, এই বুঝি পাগল উছল ধারায় সারা ত্রিভুবন লুটপাট হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কি, কিছুক্ষণ পরই সব পরিষ্কার। আকাশ আবার যে কে সেই আগুনঝরা। ঘাম জমেছে কপালে, চোখের কোলে। মঙ্‌লি আঁচল চেপে চেপে তাই মুছল। তারপর যতন যে দিকে গেছে, সেই পথে চলা শুরু করল। খেয়ালী লোক নিয়ে কোন শান্তি নেই। যা বলবে, যা করবে, সবই ঝোঁকের বশে। রাগিয়ে দিয়েছে, এখন কি করে বসে ঠিক কি! মঙ্‌লি তাড়াতাড়ি পা চালাল।

বৃষ্টি যেদিন এল, প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই এল। যদিও মেঘের সাজ আরম্ভ হয়েছিল সকাল থেকেই। মোটা কালো চাদরে যেন সারা দুনিয়াখানা ঢাকা হবে, আয়োজন তাই সমগ্র দিক্‌ভূমি জুড়ে। অবশেষে বেলা গুম করে বৃষ্টি নাবল দুপুরের পর থেকে। এমন অঝোর ধারায় বৃষ্টি অনেককাল এদিকে হয় নি। এদিকে বৃষ্টি সহজে হয় না, কিন্তু যখন নাববে, দুনিয়া ভাসিয়ে ছাড়বে যেন। সহস্ররেখায় মেঘের হিলিবিলি আঁকা পড়ল। তারপর সন্ধ্যা ঘনঘোর হলে, শুরু হল, দুর্যোগ কাকে বলে। সৃষ্টি রসাতল পাওয়া যোগাড় হয়। কড়াৎকড় মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কুটিল শাণিত ফাটলে। সেইসঙ্গে সুতীব্র বাতাসের ডাকানি। গাছগাছালির বনে প্রলয় নাচনের মত্ত হিল্লোল। অতএব অচিরেই রঙ্গিণী পাহাড়ী-নদী দুহিনা তার মাতঙ্গিনীরূপ ধরল। উতরোল ঢেউয়ের দোলায় দুলে উঠল তাথৈ তাথৈ ছন্দে।

মাটি পড়ে-পড়ে একটু-একটু করে বাঁধের উচ্চতা বাড়ছে। দু'পাশে কংক্রিটের দেওয়াল গাঁথাও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। মূল বাঁধের আগে ছোট এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেণ্ট তৈরির কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। স্ল্যুইস দরজা বসে গেছে। নদীর ক্ষুধিত আগ্রাসীর মুখে এখন পশ্চিম পাড়। এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেণ্ট পশ্চিম পাড় ধরে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হলে, দু'দিক বাঁচোয়া। ভাঙন রোধ হবে নদীর। অত্যধিক জলের চাপ এসে আর আঘাত হানতে পারবে না মূল বাঁধের স্পিলওয়ে দরজার ওপরে। তাছাড়াও, মূল প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার ব্যাপারেও বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নদীর স্রোত ভিন্নমুখী করতে না পারলে রিভার বেডের শেষ ঢালাইয়ের কাজ কোনমতেই সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর নয়। এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেণ্টের স্ল্যুইস দরজা পথেই, প্রয়োজনের সময়ে জল

ঢুকিয়ে দেওয়া হবে রিজার্ভয়ের ট্যাঙ্কে, অথবা নতুন কাটা খালের রাস্তায়।

বিরাট কাজে অঘটন আছেই। সকল শাসন মানার বাইরে তার কারিকুরি। তবু নদীর অবস্থা দেখে দ্বিতীয় দিন বিকালে সর্তক করে দিল কর্তৃপক্ষ, যে কোন সময়ে রাক্ষুসে ক্ষুধায় তুহিনা দুই তীর ছাপিয়ে উঠতে পারে। জল এখনই বিপদ সীমার সাত ডিগ্রী ওপরে। সেই সঙ্গে পাড় ভাঙছে বিপজ্জনকভাবে। তারপর, সদ্য গাঁথা ছোট-বাঁধের দরজার ওপরই যেন রোষটা বেশি। মুহুর্মুহু ধাক্কাচ্ছে ভীমবেগে। সু রাং কখন কি হয়, বলা যায় না। সাবধান সকলে!

সাবধান তারা ঠিকই হয়। পট্টির ঘরে ঘরে দিনরাত্রি সমানে চলে বঙ্গার পায়ে মাথা কুটোকুটি কান্না।—হেই মা, ই কি কাথা শুনি গ। তু শেষ্যে খাবি লিক্কিন মোদির?

হারাম বুড়োবুড়ি চেঁচাল, বল্ত, মোরা আপন আর্মায় জিন্দা ঝাঁপায়ে পরি তুয়াব ঠাঁইয়ে।

গতবছর এই রকমই বৃষ্টির এক সন্ধ্যায় পট্টির এক মেয়ে, লাছলী নদীতে স্নান করতে গিয়ে ভেসে গিয়েছিল। বুনো ঝোরা নদীতে সেদিন ভয়ংকর ভয়ের মার নাচছিল--নিচে চোরা স্রোত, ওপরে দুরন্ত ঘূর্ণি। ফলে, ধরেই নিতে হয়, মায়ের স্বেচ্ছা প্রণোদিত কৃপাবলেই সে সেদিন ফিরে এসেছিল। নাহলে, সুধ্নার মতো মরদের কর্ম ছিল না, ওই অজগরী স্রোতের মুখ থেকে লাছলীকে ফিরিয়ে আনা।

এই সঙ্গে হঠাৎ আবার এতদিন পর খাড়ি পাড় দলিত করে নাকি সুরের কান্নাটা প্রবল হল। সঙ্গে পুরাতন সেই অবিশ্রান্ত হাঁকাহাঁকি। কি যেন গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে জলে পড়ছে।

এমনিতেই বর্ষা এসে পড়লে আর কাজ হবে না। নতুন করে কাজ শুরু হতে হতে সেই দেওয়ালী উৎসব এসে যাবে। গতবছর কাজের অগ্রগতি তেমন ভাল হয় নি। এবছর সেটুকু পূরণ করে দেওয়ার

কথা। ইত্যকার ভাবনায় কিছুটা বুঝিবা বিক্ষিপ্ত ছিল কর্তৃপক্ষের মন। এমন সময় বর্ষণ মুখরিত তৃতীয় দিনের রাত্রে সংবাদ এল, নতুন গড়া এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেন্টের একধার নাকি পুরো ফেটে গেছে। এবং সেখান দিয়ে জাঙ্গাল ভাঙা জল হু-হু করে ভিতরে ঢুকে এরই মধ্যে আশেপাশের বেশ খানিকটা জমি ভাসিয়েও দিয়েছে।

বৃষ্টি-ঝরণ রাত। আকাশ ফুঁড়ে বিদ্যুৎ-পাখার প্রমত্ত হিলবিল নাচছে। তার পাখ্‌নায় আগুন বরণ মেঘের চমক। সব দেখেশুনে বাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়ে গিয়েছিল ম্যানেজার সাহেব। সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে। পরে, আরেক বিপত্তি।

সাহেব নির্দেশ দিয়েছিল শিশিরনাথকে, জনাকয়েক সাণ্ডি জোয়ান ছোকরা জুটিয়ে নিয়ে কাজটা সমাধা করতে। সেইমতো এগুচ্ছিল সব কিছু। হঠাৎ বেধে গেল গণ্ডগোলটা। কথাটা চট্‌ করে উড়িয়ে দেবার নয়, দু' দুটো জলজ্যান্ত তাগ্‌ড়া জোয়ান প্রায় এক রকম চোখের ওপরই হাওয়াই বাজীর মতন নিপাত্তা হয়ে গেল।

কাজটা অবশ্যই ছিল অসমসাহসের। বাঁধের কাজে, দেওয়াল গাঁথার সঙ্গে লোহার সরু সিঁড়ি নিচ থেকে ওপরে বেঁধে যাওয়া হয়। যাতে প্রয়োজনে অনায়াসে জলস্তর পর্যন্ত নামা যাচ্ছে। গভীর গাঢ় অন্ধকারে নিচের কিছুই আজ পরিষ্কার দেখা যায় না। তারপর, জলে জলে সেই সিঁড়ি আবার ভয়ংকর পিচ্ছিল ও শেওলাধরা হয়ে আছে। পা পাতবার উপায় নেই। তবু ওই সিঁড়ি পথেই মাথায় সিমেন্ট-বালির বস্তা নিয়ে নিচে নেমে যেতে হবে। গিয়ে, ফেলতে হবে একেবারে ঢেউ আছড়ানির মুখে। জলের দুর্বার ধাক্কা এসে জমাট বস্তার ওপরে লাগবে। খ্যাপা আঘাত হতে রক্ষা পাবে সদ্য-গাঁথনি করা এম্‌ব্যাঙ্ক্‌মেন্টের দেওয়াল, দরজা, পিলার। পাড়ের ওপর থেকে ফেলে কোন লাভ নেই। ঘন অন্ধকারে নজর যেহেতু ঠিকমতো চলছে না, হয়তো আসল জায়গায় না পড়ে ঢেউ-আছড়ানির মুখ হতে দূরে সরে গিয়ে বস্তা পড়বে। সুতরাং ঝুঁকি

আগাগোড়াই বহুল পরিমাণে ছিল বৈ কি। এ-ও তো শুধু মাত্র কিঞ্চিৎ সাময়িক ঠেক্‌নো দেওয়া। আসল মেরামতির কাজ যা কিছু, আগামীকালের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

এমনিতেই সকালে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জা-কেলেঙ্কারীর অন্ত থাকবে না। সকলের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জীবন জেরবার হয়ে যাবে। পিল্লাই সাহেব ছুটে আসবেন। রাজিম থেকে প্রোজেক্ট্‌ ইঞ্জিনীয়ার কোঠারী সাহেব দৌড়ে আসবেন। ওদিকে পত্রিকাওয়ালারা পরিত্রাহি চেঁচানো শুরু করবে, একি কাজের নমুনা? কমপক্ষে দেড়শ' বছর যে বাঁধের পরমায়ু জোর গলায় ঘোষিত হয়েছে, তা কিনা পুরোপুরি তৈরি না হতেই ধস্‌তে আরম্ভ করে দিল। বেড়ে কাজ দেখি! অবিলম্বে এর মালমসলা খাঁটি কিনা, ভিতে কোন গল্‌তি আছে কিনা—যথাযোগ্য তদন্ত হওয়া উচিত।

পরিকল্পনা মতো মাথায় সিমেণ্টের বস্তা চড়িয়ে দুজন মানুষ ঠিক রাস্তা ধরেই এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি বুঝি হয়েছে নিচে, কোন সাড়া নেই তাদের, উঠেও আসছে না। একটা নিদিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পর, পাড়ের ওপরে দাঁড়ানো রেজা মজুর এবং মিশিরনাথের চোখ সশঙ্ক আতঙ্কে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, কি রি, তুয়াদির সাড়া লাই যি। তারপরও সত্যি যখন কোন সাড়া এল না, ঝড়ো আঁছড়ানিতে চাপা নৈঃশব্দ্য একই মতো ছিঁড়ে-ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল—তারা জলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিকারগ্রস্ত অস্থিরতায় সমস্বরে ডেকে উঠল, তুয়ারা আর লাই লিকিন, আঁ? কাথা বুলিস লাই কেনে গ?

এরা আসতে চায় নি। মিশির তাদের নানা প্রকার প্রলোভন, ইজ্জত নষ্ট করা কথাবার্তা বলে উত্তপ্ত করে নিয়ে এসেছে। প্রথমে বলেছিল, প্রত্যেককে ই কামের লেগে দশ-দশ রূপেয়া করে আলখ্‌ মজুরি দিব, হাঁ। নগ্‌দা কামাই। লেগে লোট। দশ-তুলকা।

তারা তবু রাজী হয় নি। নদীর যা মার চেহারা এখন। অবশ্য

বেশী পরিমাণ টাকার তাদের সর্বদাই প্রয়োজন আছে। ঘর-সংসার আছে। আছে একজনা মনের মানুষ। আপন খুশদিলে নানাভাবে সাজাতে তাকে বাসনা হয়। তার পছন্দমতো কিছু সওদা কিনি করতে। তা সত্ত্বেও তারা সপাট 'না' বলে দিয়েছিল।

মিশির তখন ক্রুদ্ধ স্বরে খিঁচিয়েছিল, কিরে শালো, তুরা মরদ লয়? সিনায় রক্ত লাই?

এই তিন কথা সইতে পারে না জাদান দেশের জোয়ান সন্তান। কারো নামে মিথ্যা বদনাম। তার জোয়ানীর ওপর কটাক্ষ। এবং তাদের খিজামের খুন সম্পর্কে কিছু বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। তখন উত্তর হয়েছিল, বেশ, চল্ তবে। মরব, মরব। লেকিন দিখাব, তুয়ারে।

সেই এসেছিল। শেষে ওই অঘটন।

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে এখনো। থেকে থেকে কড়াৎকড় ডাকে মেঘের চমকানি চলেছে। মিশির তুকুবুকু করল। তার পানে সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। স্থির শাণিত চাহনি। দেহাতী মানওয়ার নজর এক সময়ে সে ধাঁধিয়েছিল নানান ক্রুর ব্যাখ্যানে। এখন যেন সবাই জবাব চাইছে, প্রতিকার কী হবে?

তারা মুখে বিশেষ তেমন কোন কথা বলে নি। তুমুল জল-ঝড়ের মধ্যেও মিশির তাদের চোখে পড়ল ওই কথা। এ দশা তাদেরও হতে পারত! ওই ঢেউ-জলে মিশে অবিরাম হয়তো আছড়াতে হতো লৌহ-কপাটে মাথা কুটোকুটি করে। নিতান্ত অদৃষ্টের জোরেই নামে নি প্রথমে, তাই রক্ষা পেয়ে গেছে।

মিশিরের হঠাৎ মনে হল, এই মুহূর্তে এই দলের মধ্যে তার একলা থাকা আর মোটে উচিত নয়। বাওয়া পুরুষ খেপলে বনের জানোয়ার। তাছাড়াও, খবরটা অবিলম্বে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া দরকার।—আসছি, তুরা দাঁড়া। বলেই আর কথা কওয়া নেই, পিছন ঘুরে উর্ধ্বশ্বাসে সে কুঠিবাড়ির পথে দৌড় হাঁকাল।

ভিজে কাদায় পা জোরে চলে না। হোঁচট খেতে খেতে

সে দৌড়তে থাকল। সত্বর এর কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে, সমগ্র জাদান ঘর জুড়ে যে শেষ পর্যন্ত কি তোলপাড় উঠবে, কারো জানা নেই।

কিন্তু মজাটা হল, সব শুনে ম্যানেজার সাহেব কাঁধ নাচিয়ে হোহো করে হেসে উঠল। ঘরে তখন মদের জবর প্লাবন চলেছে। রূপসী যোগাড় হয়েছে একজন, সাহেব তাকে নিয়ে লুটোপুটি খেলছিল। মিশিরের মতো হুঁদে বদ্‌মাইশ মানুষের অবধি তখন মনে হল, সাহেবের মুখখানা অদ্ভুত কতকগুলো কুৎসিত দাগে ও বর্তমান আকাশের বুকে বিদ্যুৎ পাখার হিলিবিলিতে, ভয়ংকর রকম রেখাকীর্ণ।

সাহেব কোলের ওপর রঙ্গিণী মেয়েকে তুলে ধরেছিল। সেই অবস্থাতেই দমকে হেসে চলে যেন স্নেহের গালি দিল তাকে।—একটা আস্ত গাধা, দেখছি তুই। এতদিন আমার কাছে থেকেও বিন্দুমাত্র মানুষ হলি না। ননসেন্স্।

মিশির নিরুত্তরে থাকে।

বাঁধ রেকার কাজে এ-তো কোন খবরই নয়। আখ্ছার ঘটে থাকে।

সন্দীপ রায়ের জীবনে এমন কত পরিস্থিতি এসেছে, ফুঁ দিয়ে পার করে দিয়েছে সেইসব সংঘাতময় দুর্যোগের দিন। বছর দুয়েক আগেও, লালকুঁয়োয় আসার আগে, যে 'সাইটে' কাজ হচ্ছিল, একটা রেজার আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জল ঘোলা হবার উপক্রম হয়েছিল। সেবার সন্দীপ রায় রাত্রির অন্ধকারে নিজে বুলডজার চালিয়ে একটা গোটা মহল্লায় যত ধাওড়া ছিল, পিষে দিয়ে এসেছিল। তারপর মরার গাদা, অদূরে বর্ষার ঢল নামা দরিয়ায় বড় বড় পাথরে বেঁধে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

দেখে-দেখে আর করে-করে এসব তার মনে কোন রেখাপাতই করে না। অতঃপর সাহেবের লঘু নরম গলা ক্রমেই কাঠ-কাঠ হয়।

যেমন সে সচরাচর ভাষা বলে।—ইডিয়ট। মিশিরের বুকে তখন গুরগুরিয়ে অমঙ্গুলে নানান ধ্বনি বাজল।

—লাশ পাওয়া গেছে?

—না।

—খবরদার। চোখ বড় বড় করে আবার পাকালে সাহেব, পাওয়া গেলেও যেন ভুল করেও না ওপরে তোলা হয় কাউকে। ঝটপট পাড়ের নরম কায়দায় পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু থেমে পরে জিজ্ঞাসা করল, শ্রীকান্ত কোথায়?

শ্রীকান্ত হল মিশিরের পয়লা নম্বরের শাগরেদ। লোকটা হেন ভুষ্কর্ম নেই, করতে পারে না হাসতে হাসতে। এদেশে এসেছিল মজুর খাটতে। মিশিরের জহুরী চক্ষু রত্ন বিবেচনায় তাকে চ্যালা বানিয়ে নিয়েছে। এখন সে কোন কাজ করে না। দিনরাত্রি মিশিরের পাশে পাশে ঘোরে আর মাতব্বরি করে।

মিশির আস্তে আস্তে জানালে, আছে। বাইরের দাওয়ায় অপেক্ষা করছে।

সাহেব কাশলো, হ্যাঁ, সর্বদা ওকে সঙ্গে সঙ্গে রাখবে। আর—। বলে, তারপর শুধোলো, ক'টা কুলি ছিল সবসুদ্ধ?

—আঠারোটা।

মিশির এই উত্তর জানালে, সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করল, দু'টো গেছে। তাহলে—?

—ষোলটা আছে।

—বেশ। সাহেব বিষাক্ত হাসল এবার। এক কাজ কর। তার গলার আওয়াজ হঠাৎ যেন মেঘ ডাকার শব্দে ঘরঘর করে উঠল এরপর। বললে, ষোল দশকে একশ' ষাট। প্রত্যেককে আরো দশটা করে টাকা বেশী দিয়ে দে। দরকার বুঝলে, আরো কিছু বেশীও খরচ করতে পারিস। আর, ওই সঙ্গে একবোতল করে মা-কালী মার্কা ধরিয়ে দিবি হাতে। মনে হয়, এতেই সব ল্যাটা চুকেবুকে যাবে।

টের পাওয়া গেল, বাইরে এখনো অকরুণ ঝরণ ধারার খ্যাপা খ্যাওটা বইছে। দুড়দাড় এলোপাথাড়ি ভাঙছে মাঠপ্রান্তর। কোথায় আকস্মিক বাজ পড়ল একটা বুঝি। সমগ্র ধরিত্রী থরথর করে কেঁপে উঠল।

লাশ পুঁতে ফেলার কথায় না চমকালেও, দ্বিতীয় প্রস্তাবে মিশির কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়। একদিন হারুলোরকে প্রায় এই রকমই এক টোপে, গাঁ-ঘরের জাদান সুন্দরী ধরে আনতে সে মন্ত্রণা দিয়েছিল। কিন্তু তা হল অন্যকথা। দু'টো জলজ্যান্ত তাগ্‌ড়া জোয়ান চিরতরে ভোজবাজীর মতন চোখের ওপর থেকে উবে গেল, সহজ ব্যাপার নয়। হেলাফেলা করে তাকে কোনমতেই বুঝি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন সাহেবের দেয় ওই হিসাব, তার মতো হৃদয়হীন মানুষের কাছে পর্যন্ত বিস্ময়কর ঠেকে। ম্যানেজার সাহেবের নিকট মানুষের প্রাণের মূল্য সামান্য ক'টা টাকা মাত্র, অথবা তার বেশী কিছু নয়—এই তথ্য উদ্ধারেও হয়তো আদৌ চমকাত না মিশির। কিন্তু বরাদ্দ কত করে ধরা হল? মনে মনে গুণ ভাগ কষলো সে, আগের দশ টাকার সঙ্গে এখন বাড়্‌তি আরো দশ ধরলে ষোলজনের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে তিনশ' কুড়ি টাকা। তাকে দুভাগ করলে, ওই একশ'.ষাট করেই হয়। তাহলে জনপ্রতি রেজা মজুরের প্রাণের দাম দাঁড়ায়, সাকুল্যে ওই অর্থ! এবং তা-ও আবার মৃতের কোন নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয় কিছু পাচ্ছে না। ঘুষ দেওয়া হবে কেবল সেইসব মানুষদের, যারা ওদের ভেসে যাওয়ার খবরটুকু শুধুমাত্র জেনেছে, অথবা কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ করেছে। একই পট্টির গেরস্ত—টাকা ও মদের বিনিময়ে তারা মৃত ব্যক্তির উৎকণ্ঠিত আত্মীয়-পরিজনের কাছে শোক সংবাদটা চেপে যাবে। যাতে করে শক্ত-পোক্ত মানুষ দুটোর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার কোন সুলুক-সন্ধান আর করা না যায়।

সাহেব যেন বুঝতে পারে মিশিরের অস্বস্তি।—হোয়াট্

হ্যাপেন্‌স্? দুর্ঘটনার খবর প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে যেমন হেসেছিল, সেইরকম গলা চড়িয়ে হাসল। তারপর ভোগের সামগ্রী সেই রেজা মেয়েকে আরেক দফা পিষ্ট করল। পরে বললে, যা বললাম, কর্ গিয়ে। না মিটলে, কাম এগেন। আমি নিজে যাব।

তিনশ' কুড়ি টাকা দুভাগ করলে, একেক দিকে একশ' ষাট করে পড়ে। মিশির আরেকবার মনে মনে হিসাবটা ঝালিয়ে নিল।

বাইরে বৃষ্টিধারার তাণ্ডব অব্যাহত আছে। আলো:চমকে আবার একটা বাজ পড়ল। এবারও বাজটা খুব কাছেই ফাটলো। থরথর করে সমগ্র মেদিনী কেঁপে উঠল। একটু থেমে মিশির আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। তারপর পায়ে পায়ে হাঁটা আরম্ভ করল কম্পাউণ্ড পেরিয়ে সামনের উৎরাইয়ের পথে। রেজা দলের কাউকে প্রথমে হাত করতে হবে। শেষে তার মারফত প্রস্তাবটা পাড়তে হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত রাজী সকলকেই হতে হবে। নাহলে—। ভিন্ন ব্যবস্থার কথা সাহেব মুখে না বলে দিলেও, মিশিরের বিলক্ষণ বোঝা আছে কি করতে হবে। তবে সাহেব যতই কেন না হাল্‌কাভাবে কথাগুলো বলে থাকুক, তার খুব ভাল ভাবেই জানা, আসলে কাজটা অত সোজা নয়। পিছন ফিরে একদফা ডাক দিয়ে নিল শ্রীকান্ত।

—হ্যায়। চলিয়ে।

—চাকু লায়া দোঠো? জরুরত হো সাকৃতা।

—লায়া জী।

—বহুত খুব।

নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে তো দরকারই। প্রস্তাবে রাজী না হলে, ষোলজনের ওই রেজা দলটাকে এই চাকু দিয়েই মেরে-মেরে নিকেশ করতে হবে।

শ্রীকান্ত চাপা হাসল।—ফিকর নেহী। হো যায়ে গা।

মিশির বিড়ি ধরাল। শ্রীকান্তকেও বাড়িয়ে দিল একটা। দু'জনে একসঙ্গে টান কষিয়ে, শেষ-সলাহ্‌টা তারপর সেরে নিল।

শ্রীকান্ত চাকুটা বের করে মেঘ চমকানো আলোতে একবার দেখে নিল। মিশির এখন আর কোন উত্তর করল না। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ার আওয়াজটা হল কেবল।

পঞ্চানন শেষ পর্যন্ত আর যায় না। সকলের অনুরোধে থেকেই যায় সেখানে।

বাওয়া সমাজে 'চেটিয়ার' কোন অস্তিত্ব নেই। প্রথমে অনেকেই আশংকা করেছিল, এই নিয়ে বুঝি আবার নতুন করে একটা হট্টগোল বেঁধে উঠবে বাওয়া সমাজে। শাদী হওয়ার আগেই রঙলা প্রকাশ্যে তার মনেব মানুষ পছন্দ করে ঘরে তুলেছে। এবং তা-ও আবার এমন একজন মানুষকে, যে বাওয়া জাতের নয়, এক রাখের নয়। একেবারে ভিন্ পারসী। দেকোপুসি।

রাখুয়াই ভয় পেয়েছিল বেশি। এককালে সে-ও পাড়াঘরের মুরুব্বি-মাতব্বর ছিল। অনেক বিধান-অনুশাসন বাত্‌লেছে। এখন নিজ আত্মজার বেলায়, নিয়ম-লঙ্ঘনে নীরব সম্মতি—অনেকেই হয়তো সহজে স্বীকার করে নেবে না। কৈফিয়ত চাইবে এসে।

আর ভয় পেয়েছিল লাছলী। রঙলার হৃদয়ের বান্ধবী সে। সে-ই ফুসলিয়ে তার প্রাণে কুসুমিত প্রেমের মুকুল ধরিয়েছে।

ভয় তাদের বেশী ছিল ডমরুকে নিয়ে। সে হয়তো চেঁচিয়ে সমস্ত পাড়া মাতিয়ে বেড়াবে। মৃত পঞ্চায়েত ডাকবে। সেখানে রঙলাকে বিজেৎ করার প্রস্তাব নেবে। শেষে ঘাড় ধরে হয়তো পঞ্চাননকে তাড়িয়েও দিতে পারে বাওয়া পট্টি থেকে। পিটোতে পাবে দমাদম। খিস্তি দেবে, আণ্ডিয়ার বাচ্চা বলে। এক তুলকালাম কাণ্ড হয়তো নিমেষে বাধিয়ে তুলবে।

কিন্তু কি অদ্ভুত! সব আশংকাকে একদিন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে মুরুব্বি নিজেই। প্রথমে অবশ্য গটমট করে এমনভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাননের মুখোমুখি, সকলের বুকে ধড়পড়ানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বুঝি লঙ্কাকাণ্ডটা জমে ওঠে। এমনিতেই একটু ভীরু স্বভাব পঞ্চাননের, তার মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে যাওয়ার উপক্রম ঘটেছে। মুরুব্বি এসেই আচমকা শুধিয়েছিল, তু কৌন রি হারামজাদ্?

তার কর্কশ রুক্ষ ভাষায় আরো ভড়কে গিয়ে পঞ্চানন জবাব করেছিল, আমি ফুঙ্গি গো পাচ্গি সর্দার।

—সেরিং গাস্? গান করিস? যেন ধমকে জানতে চেয়েছে সে সেইবারে। তারপর একভাবে তাকিয়ে থেকেছে তার চোখে চোখে। পরে আবার শুধিয়েছিল, ভালো সেরিং ত?

—কি করে জানব, নিজের ক্ষমতা কতখানি। অনেকে তো প্রশংসা করেছে।

—বেশ। এট্টা কাম পারবি?

—কি কাজ কর্তা?

—তুয়ার গানা থে মোদির ই নীলবান ভুঁইয়ের তাবৎ মানওয়া-টোরে মলকেৎ কর্যা দিতে হবেক। শেষ করে দিতে হবে। সাকেঙ্গে? পারবি?

এ রকম উদ্ভট প্রশ্ন হবে, পঞ্চাননের কোন ধারণা ছিল না। আরো থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

মুরুব্বি বলে চলেছে, আর সব শালো ভিন্ গাঁওইয়ারে পাগল কর্যা দিতে হবেক। এত্ত পাথর আছে মোদির ই জাদান দেশে, তখন একেকটার মাথায় একেকটা ভেঙে, সিগুলানের সদ্গতি করব গ।

সকলে তাড়াতাড়ি চোখ টিপেছিল পঞ্চাননের দিকে। এই প্রলাপের উত্তরে সে যেন ভালোমন্দ কোন মন্তব্য না জানায়।

অথবা নিজের অক্ষমতা। একটা ভয়ংকর কাণ্ড বেধে যাবে তবে। ইংগিত বুঝে পঞ্চানন বিশুষ্ক মুখে জবাব করেছিল, আদেশ করলে, সে চেষ্টা নিশ্চয় একবার করে দেখব। যতখানি সফল হই।

—আচ্ছা, আদেশ করলম্। তু কর্। ডমরু বলে উঠেছিল। হুঁ, মো দেখব। বলেই আর দাঁড়ায় নি, ধেয়ে চলে গিয়েছিল।

সেই থেকে এই আরণ্যক নীলবান গাঁয়ে পঞ্চাননের থাকা আরো যেন পাকা হয়ে গেল।

পঞ্চানন ইতিমধ্যেই গ্রামের প্রায় সকলকে চিনে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে হাসে। বসে। কথা বলে। এমনভাবে, সে-ও যেন এই গাঁয়েরই একজন মানুষ। তাদের সকলের সঙ্গে সকল সুখ-দুঃখ ভালোমন্দের সমভাগী। তারাও তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়। খাতির-সম্মান করে। যেন নিজেদের পরিজন।

রাবাকের তারের মীড়ে মীড়ে বিচিত্র ভাষা। সেই ভাষা বোঝে না দেহাতী মানওয়া। কিন্তু তারের আলাপনে টের পায়, মানুষটার অন্তঃস্থিত কান্না যেন কথায় নয়, সুরে রূপ পেয়েছে। পঞ্চানন যখন হেসে তাদের গান শুনতে চাওয়ার প্রত্যুত্তরে ডাক দেয়, কি গান শোনবা, বলো? দিনমান কিংবা আঁধারময় রাত্রি—যাই হোক, ওপরের পরিব্যাপ্ত আকাশটা যেন সেইক্ষণে আলো ছড়িয়ে হাসতে থাকে।

গায়েনের সঙ্গে তখন কদর বেড়ে যায় রঙলার। শ্রোতারা নির্বাক বসে শোনে। গর্বে তাদেরও বক্ষ প্রসারিত হয়। এমন একজন গায়ক আছে তাদের পট্টিতে। সুর গুপী-যন্ত্রের তার মুক্ত হয়ে মিষ্টি আবেশে বাতাস মথিত করে। সেই হিল্লোলিত বাতাস ক্রমে একটু একটু করে ছড়ায়। মনে হয়, দূর ধূসর দিগন্ত পর্যন্ত সেই সুরের ঝংকার তরঙ্গিত ছন্দে বয়ে যাবে।

রঙলা হাসে। পাড়াঘরের কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে সে যেন নব-জীবনের আস্বাদ পায়। সকলকে শুনিয়ে পঞ্চাননকে আদেশ

করে, আরেট্টা গানা গা' ফুঙ্গি। পঞ্চানন আদেশ অমান্য করে না। রঙলা পুলকিত চাঞ্চল্যে মুদ্রিত নেত্রে বসে সেই গান শোনে।

শেষ প্রহর রাতে উঠে গাঁয়ের মাঙ্গলিকী গেয়ে ফেরে পঞ্চানন। নিশ্চুপ শান্ত তখন বাওয়া তল্লাট। ধাওড়ার কুলিপট্টিও নিস্তব্ধ। বাঁধের পারের কর্ম-মুখরতাও আরম্ভ হয় নি। পঞ্চানন কুলিপট্টি পেরিয়ে বাবু-মহল্লার পাশ দিয়ে ঘুরে আসে।

গৌররূপে আলো করে সুরধুনীর কূল
আয় নাগরী দেখবি যদি শিকায় রেখে জাতিকুল।

পঞ্চানন হেসে বলে, তোমরা সারা দিন-মাস খেটে জল হও। আমি কি করব? আমার সামান্য যা সম্বল আছে, তাই দিয়ে বরং তোমাদের মন ভরাই। সেই হবে আমার বড় পূজা। মহৎ পূর্ণতা প্রাপ্তি।

লাছলী টেপা দেয়, কিন্তুন আরেট্টা পাওয়া? তার নাম ক'লা লাই, কেনে গ হাঁদে? বলে অর্থপূর্ণ হাসে।

—কেন, সে তো সর্বদাই বলি। তোমাদের এই গাঁয়ে এসে, বিবাগী মন আমার ঘর পেল। তার বাড়া আর কি বা চাইবার যোগ্যতা আছে আমার মতন মানুষের?

—উ কাথা বুলিস কেনে গ?

—কেন, এ-তো সত্য কথাই।

—লাই গ। বুলিস লাই, উ কাথা।

পরিচয় তাদের রঙলার সূত্রেই গাঢ় ও গভীর হয়েছে। তখন লাছলীর হাসি হাসি মুখ সহসা অশ্রুতে ভারী হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস কণ্ঠে বলে, ঘর পাওয়ার কাথা বার বার বুলতে লাই গ, তা-লি পাওয়াটো আর থাকে না।

রঙলা পাশে থাকলে বোঝে, লাছলী কেন ওই কথা বলল। ঘরের কথায় লাছলীরও পাঁজর ভেঙেছে বুঝি মটমটিয়ে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন, তার চোখেও দুকূল উপছোনো দরিয়া। তরী ভেসেছে অনেক

দিন। অথচ আজো নোঙর করতে পারল না নাইয়া মাঝি-মেঝেন দুজনে।

পঞ্চানন বলে, ঠেক্ না থাকলে, ভেসে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। আর, যে ভাসতে জানে, সে একদিন কূল পাবেই।

লাছলীর গণ্ড প্লাবিত করে অশ্রু গড়ায়। বলে, অঁন্য কাথা বল্ গ ফুঙ্গি।

পঞ্চানন স্মিত হাসে, হ্যাঁ, সে-ই ভালো।

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হয় না। পরে এক সময় পঞ্চাননই আবার প্রথম কথা বলে, জীবন কি, জানো?

তারা চুপ করে থাকে।

ওদের নীরবতায় পঞ্চানন খুঁচোয়, কই, উত্তর দিলা না?

তখন লাছলী যদি হেসে ফেলল, তার অশ্রুদগ্ধ মুখে সেই হাসি বিচিত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে।—মোরা কি ফুঙ্গি লিকিন গ, মেলা-ই লিখা-পড়া শিখ্যেচি? উ সব জানব কুথা থিক্যা?

পঞ্চানন অতঃপর জীবন-তত্ত্ব শোনায়।—তবে শোনো। ফুল ফুটে আবার তা সন্ধ্যেবেলায় ঝরে যায়। জীবনও তাই। ফুটে, বেলাশেষে ঝরে যাওয়া। আর, ওই দু'য়ের মাঝের ক্ষণিক সময়-টুকুকেই আমরা হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের পৃথিবী রূপে গড়ে তুলি।

পঞ্চানন কথা আরম্ভ করলে, এইভাবেই বলে। কিসের একটা পীড়ন চলেছে যেন বক্ষ জুড়ে, কথা তাই বেদনার অক্ষরে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে কণ্ঠ, চোখের মণি থেকে। রঙলার কাজল কালো দৃষ্টি সহসা অশ্রু টলমল হয়ে যায়।

—আমার জীবনও একদিন অমনিভাবেই ঝরে যাবে নিশ্চয়। তবে তার জন্য আমার কোন আক্ষেপ নেই। পেয়ে হারানোয় ব্যথা যেমন আছে, পরিতৃপ্তিও আছে। এ জীবনে অনেক পেলাম, হারালামও অনেক।

—ই কাথা তু ভাবিস্ কেনে গ সব সময়, আঁ?

—এ-তো ভাববারই কথা গো, সখীরা।

—মোদির ত কুনো চিন্তা হয় লাই উয়ার লেগে।

—ছি-ছি। তোমাদের হবে কেন এখুনি? এই তো মাত্র বয়েস। আমার কথা স্বতন্ত্র। পঞ্চানন বলে ওঠে, আমি বাউল। গাঙের পানি। আজ এ গ্রামে, কাল আরেকখেনে ধেয়ে বেড়াই। আমার সাথে কি কারো তুলনা হয়?

নদীর জল হে, নদীর জল জীবন।
অকূল পাথার, নাই যে দিক কিংবা ঘাটসা
পারাপারের ভাবনা নাই তবু, কষিতেও নাই পয়সা
হারাব কি রতন।......

পঞ্চাননের কোমল কণ্ঠ লতিয়ে ফেরে। গান শেষ হলে বলে, শুনলে? আর তখুনি লক্ষ্য হয় উভয়ের, কখন পাশ থেকে রঙলা উঠে গেছে শব্দ না করে।

প্রাণের সই রঙলা। পরস্পরের শুভাশুভের ভাবনা চিরদিন উভয়কে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। লাছলী আর্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, অমন করে কয়ো নি গ, ফুঙ্গি। মোরা বাওয়ানী মেয়া।

পঞ্চানন হাসে, আর আমি বাউল একজনা।

মধ্য রাত্রির নিঝুম অন্ধকারে রঙলা আলুথালুভাবে আবার আসে পঞ্চাননের কছে। গানে গানে ভেঙে দেবে জাদা: :দেশ, ডমরু হুকুম করেছে। পঞ্চানন তাইতে সায় দিয়েছে। রঙলা বলে, শেষে উ কাম তু-হি করবি গ ফুঙ্গি? মোদির বাইরী হবি, আঁ?

ঘরের ভিতরে রাখুয়া সর্দারের ঘুমিয়ে থাকার লক্ষণ স্পষ্ট। নাক ডাকছে ঘড়ঘড় করে। রঙলা পরে সহসা পঞ্চাননের মুখ টেনে নিয়ে নিজ বক্ষে ঘষলো। তখন তার চোখের কোল বেয়ে টপটপিয়ে লোনা জলের ধারা ঝরে অঝোরে। চিত্তবনে নিত্যকার হাওয়ার ডাকানিটা আছে, হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে এইবারে।

পঞ্চানন আঁকপাঁক করে ওঠে।

রঙলা শান্ত ধমক দেয়, আঃ। পরে বলে, উ সব কাথা আর ক'বি লাই ত কখুনো ?

পঞ্চানন নিশিতে-পাওয়া মানুষের স্বরে সেবারে উত্তর আউরোয়, —বেশ, ক'বো না আর কখনো। তিন সত্য করলাম।

—আর, আমারে ছাড়্যে যাবি না ত ? কখনো। কোথাও।

—ঠিক আছে, যাব না। বলতেই সেই অস্থিরতাটা বুঝি আবার চাগান দেয়, পঞ্চানন সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।— আমারে ছেড়ে দাও গো বাওয়া মেয়া। আমি বাউল, আমার ঘর বাঁধতে নাই। আমি পথের টানেই চলতে জানি শুধু। আমি যাই।

রঙলা মৃদু দাবড়ি দিল, আঃ, হছে কি ফির্ ইসব ?

উত্তরে পঞ্চানন আকুল কেঁদে বললে, আমায় ধরে রেখো না, আমি তাহলে বাঁচব না। আমি যাই। আমায় চলে যেতে দাও।

—আচ্ছা, সি বোঝা যাবেক। অবশেষে রঙলা আলিঙ্গন মুক্ত করলে, পঞ্চানন কিছুটা যেন স্বস্তি পায়। পরে রঙলা যখন ডাক দিলে, এট্টা গানা গা গ, ফুঙ্গি। তখন আরো খানিকটা সহজ হয় সে। রঙলা তাড়া দেয়, নে আরম্ভ কর্। পঞ্চানন বলে, রাত হল মেয়া, এখন ঘরে যাও। কে কোথায় দেখে নিবে। তারপর সারা মহল্লায় দুর্নাম ছড়াবে।

—ছড়াক। এত্ত ডর কেনে তুয়ার ? গান ধর। রঙলা আবারো পুনরাবৃত্তি করে নিজের কথা।—মোর লেগে কিছু ভাবতে হবেক লাই তুয়ারে।

অগত্যা পঞ্চানন গান ধরে। এই সঙ্গে রঙলা নিজেও খানিক স্বাভাবিক হয়।

কেন দেখবি না চাবি খুলে
অনুরাগের বাখুলে,
সেথায় কে করে পাট, পড়ল না ঝাঁট
জান্দা কুলুপ তায় ঝুলে।...

গানের সুর বাতাসে কাঁপে। পঞ্চানন ঈষৎ কুঁজো হয়ে তারের বাজনাটা এক হাতে বাগিয়ে বগলে চেপে, অন্য হাতে বাজিয়ে যায়। গুপীযন্ত্রে ভাষার বোল যেন খলখলিয়ে খেলা করে বেড়ায়। রঙলা তখন অভিভূতের মতন তাকিয়ে থাকে গায়কীর মুখের দিকে। মন কোন্ অজানা অচেনা অন্ধকারের পথ হাতড়ায়। ক্রমে আচ্ছন্ন চৈতন্যে একসময় গায়কীর কণ্ঠস্বর, তার সুমধুর মিষ্টি সুরের তান—কিছুই আর কানে যায় না। এমন কি, গায়েনের মুখও কেমন ধূসর অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে তার দৃষ্টিরেখার মধ্যে। অপ্রাসঙ্গিক আবোলতাবোল কোন ভাবনা মাথায় আসে না, তবু বাস্তব পরিবেশটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

শ্রোতার বিভোরতা দেখে পঞ্চাননও বিভোর। সে নেত্র মুদ্রিত করে হেলে দুলে গান গেয়ে যেতে থাকে। ক্রমে তার মনে আর কোন সংকোচের জ্বালাই অবশিষ্ট থাকে না। গান শেষ হলে স্মিত হাসল।

রঙলা তারপরও অনেকক্ষণ এক ঠায় বসে রইল।

লালটেনের সংসারে নিদারুণ অর্থাভাব। ঘরে পোষ্য এক কাঁড়ি বউটা তারমধ্যে আবার অথর্ব।

এখন বাঁধ রেকায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে খাটার রেওয়াজ। না খাটলে, চলেও না সত্যি। জমি-জেরাত, চাষ-আবাদ করা চুকে গেছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁওইয়া মেয়ে-পুরুষ এখন ছোটে বাঁধ তল্লাটে। যা কিছু রুজি-রোজগার ওই নোকরীটুকুকে অবলম্বন করেই।

বড় ছেলে ঝড়ুর বয়েস বছর বারো হবে। খুব একটা দুবলা পাত্‌লা গড়ন নয়, এই বয়েসে অনায়াসে সে কাজে লেগে যেতে পারত। কিন্তু কি যে হয়েছে ছেলেটার, কেমন ন্যালাখ্যাপা ভাব

সর্বক্ষণ। কোন কথা বোঝে না ভালো করে। কোন কাজও করতে না। আবার ভালো ব্যাপার নেই, মন্দ ব্যাপার নেই, অকারণে হু-হু করে কেঁদে ভাসাবে। নতুবা ভয় পাওয়ার মতন এমন ভাব করবে, যেন লাঠি-সোটা নিয়ে কেউ ওকে পিটিয়ে মারতে এসেছে। পাগলের মতো হুড়্দাড়্ করে দৌড়তে থাকবে ইতিউতি। আর পরিত্রাহি ডাক পেড়ে কাঁদবে। কখনো আবার, হাবাগোবার মতন রকম-সকম। যেন কিছুতেই কোন চৈতন্য নেই। অনেকবার কন্‌ট্রাক্টর বাবু.দর হাতে পায়ে ধরে ওকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে লালটেন, কিন্তু দু'দিন যায় নি, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে বসেছে।

লালটেন যদি ধমকাল, কি রে, কাজ করবি লাই ?

সে অমনি হুতোশে ফুঁপিয়ে ওঠে।—মর্‌য়ে যাব গ আপুং। মো আর বাঁচব লাই।

—কেনে, হছে কি তুয়ার ?

বাপের হাজার প্রশ্নেও তখন আর কোন জবাব দেবে না ছেলে। হেঁচ্‌কি তুলে তুলে এক নাগাড়ে কেবল কেঁদে যেতে থাকবে।

অনেক ঝাড়ফুঁক করিয়েছে লালটেন। কোন ফল বর্তায় নি। অগত্যা, ইদানীং হাল ছেড়ে দিয়েছে।

এখন সে সারাদিন বাঁধের পাড়ে একলা বসে থাকে। বসে বসে লোকজনের গতায়াত দেখে। সম্প্রতি আবার পঞ্চাননের ন্যাওটা হয়ে উঠেছে। কি নেশা ধরিয়ে দিয়েছে ফুঙ্গি তার মাথায়, প্রায় সারা দিনমান তার পিছু পিছু ঘোরে। ঘোরে, আর গুনগুনিয়ে ফুঙ্গির সঙ্গে গলায় সুর দেয়। ওইভাবে ঘুরে ঘুরে অনেক গান সে শিখে ফেলেছে। একলা মনেও অনেক সময় গান ধরে ঝড়ু। তারস্বরে গানের কলি গেয়ে চলে।

পঞ্চাননেরও যেন দেখে দেখে কেমন মায়া পড়ে গেছে ছেলেটার ওপরে। দিনের অনেকখানি সময় নির্বান্ধব কাটাতে হয়। ও

থাকলে তবু যা হোক প্রলাপ বকে দিব্যি সময়টা কেটে যায়। ফলে, ঝড়ুর সঙ্গে কবে থেকে একটা সখ্য সম্পর্ক স্থাপন হয়ে পড়েছে, তারও আর খেয়াল নেই। তারা পথ চলতি, একত্রে বসে গল্প করে। এটা-ওটা ভাগ-ঝোক করে খায়। কোনদিন বা আবার নিজে না গান ধরে, ঝড়ুকেই গাইতে বলে পঞ্চানন। ঝড়ু গান ধরে। পঞ্চানন তখন ঝোঁকে ঝোঁকে মাথা নাড়ে, আর বাজনা বাজায়। পরে খলখলিয়ে হেসে বলে, হুঁ-হুঁ, তোমারে একখান গাইয়ে বানিয়ে তবে ছাড়ব আমি গো, ছোট রাজা।

ঝড়ুর নাবালক চক্ষু বিস্ফারিত হয়।—মো গায়েন হব, আঁ? তুয়ার মতুন লিকিন?

পঞ্চানন হাসে, কেন, ইচ্ছে করে না? চাও না হতে?

ঝড়ু এবারে বিকশিত মুখে সারা অঙ্গে লাল-ঝোলা মাখাবার দাখিল করে।—হঁ. চাই ত। দে কর‍্যা। তারপরই বুঝি কি খেয়াল হয়, বলে ওঠে, মো শোহুরে গ্যে আনেক তুলকা ছে, হুই একুখান কল কিন্যা গ্যে আসব গ। তারপর তাইতে চড়্যা জিৎ সিংয়ের মতুন মাটি কাটব, আর গান গাইব। কি মজা হবেক।

জগজিৎ সিং একটা পাঞ্জাবী ছোকরা। ট্রাক্টর অপারেটরের কাজ করে। সর্বক্ষণ খুব শৌখিন সাজ-গোজ করে থাকে। তারই কথা বলে লালটেনের ছেলে।

কোনদিন আরেক মাত্রা জোড়ে হাঁকে, উয়ার মতুন রাজা মারাং বাবু হয়্যা যাব। মাথায় ওহি রকুম ছুলি (পাগ্‌রী) বাঁধব, হঁ।

পঞ্চানন কৌতূহল ভরে শুধোয়, বড়লোক হয়ে আর কি করবা?

--জিৎ সিংয়ের মতুন খানা খাব। উয়ার মতুন লম্বা পাতলুন্ পিনহ্‌ব। ঘড়ি বাঁধব হাতে।

জগজিৎ সিংকেও বুঝি একদিন ওইকথা নিজেই ডেকে বলেছিল ঝড়ু। শুনে ছোকরা হোহো করে হেসে নেমে এসেছিল স্ক্রাপারের

ওপর থেকে।—ক্যয়া, ক্যয়া বোলতা? শহরসে এক ট্রাক্টর খরিদ লে আয়েগা?

—হুঁ গ। মুখ ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ঝড়ু বলে চলেছে। তখুন মো ভী তুয়ার মতুন বস্তে বস্তে ওইভাবে মাটি কাটব, আর গান গাইব। হুঁ, দেখিস।

জগজিৎ সিং তাকে খাবার দিয়েছিল।

ঝড়ুর জিহ্বা মুহূর্তে লালাভ হয়ে উঠেছিল। তারপর আর থমকে থাকে নি।

ওর কথা শুনতে শুনতে পঞ্চাননের চক্ষু অশ্রুভার হয়ে আসে। লালটেনের সঙ্গেও তার প্রগাঢ় পরিচয় আছে। ভীষণ অর্থকষ্ট ওদের। বাঁধ রেকায় রেজা মজুরকুলে এখন আর দারিদ্র্যভারে কেউ তেমন পীড়িত নয়। ব্যতিক্রম বোধহয় কেবলমাত্র ওরা। একার রোজগারে পোষ্য সাতজন, লালটেন কত আর পারবে?

ঝড়ুর ওই সব ব্যাখ্যান শুনলে, পট্টির মধ্যে কেবল রেগে যায় যতন। বাচ্চাদের মুখে পাকা কথা তার মোটে বরদাস্ত হয় না। ছোট, ছোটর মতো থাকবে। অত জ্যাঠামি কেন, বাবা? একদিন খিঁচিয়ে বলেছিল, যা না শালা শোহুরে। বড়লোক হয়ে আয়, দেখি। যতন তাকে দেখতে পেলেই, কোন কারণ-বেকারণেই দমাদম গাঁট্টা চালায় মাথায়। 'আগুিয়ার গোবর' বলে খিস্তি দেয়।

ঝড়ু কুঁদে বলে, হুঁ, যাবই ত।

আবারো সাঁই সাঁই গাট্টা কষিয়ে যতন বলে, তা, যা' না কেনে। তুয়ারে মানা করল কে?

ঝড়ু যত মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করে, যতন ততোই সুবিধামতো এদিক-ওদিক সরে গাঁট্টা হাঁকায়। এক সময় সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলে, তখনই কেবল রেহাই দেয় যতন।—যা শালা পুঙ্গির ছানা, আজ ছাড়্যে দিলম্। বকেয়াটো আরেক রোজ লিবখনি।

ঝড়ু তখন আর না দাঁড়িয়ে কষির কাপড় টানতে টানতে দৌড় লাগায়।

পঞ্চানন তালিম দেয়। বলে, লেগে থাকলে, হবে তোমার। তারপর আর পাঁচ-সাত-দশদিন হয়তো কোন খবর থাকে না ছেলেটার। যেমন যাওয়া, আসাও তেমনি। কোন দিনক্ষণের মানামানি নেই। ফিরে এলে পঞ্চানন রহস্যভরা শুধোয়, এতদিন কোথায় ছিলা গো, জুড়িদার? কানাই বিনা বৃন্দাবন যে অন্ধকারে ডুবে ছিল।

ঝড়ুর গলায় চট্ করে কোন বাক্য ফোটে না। মুখ গোমড়া করে বসে থাকে।

পঞ্চানন তার মানসিক গড়ন-পেটন চেনে। দ্বিতীয়বার আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। এখুনি হয়তো ঝরঝরিয়ে ফুঁকরে কেঁদে উঠবে ক্যাবলাকান্ত। নয়তো, অন্য কোন রকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধাবে। পরে পঞ্চানন যখন তার আশ্চর্য কোমল কণ্ঠে কোন গানের সুর ধরে, ঝড়ুর মনের মেঘ আস্তে আস্তে আপনিই কেটে যায়। এবং ক্রমেই খুশির আমেজে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পঞ্চানন ঠেলা মারে, এতক্ষণে বেভাব মিটলো বাবুর?

ঝড়ু হাসে, জুবুলি হয়্যাছিলম লিকিন, যাঃ।

—বেশ, তবে ধ্যানস্থ হওয়া নয়। অভিমান হ'য়েছিল হপন্ সদারের।

ঝড়ু এবারে হি হি করে হেসে ওঠে।

মধ্যে-মধ্যে যতন তাকে দীক্ষা দেয়।—আর গাঁট্টা কষাব লাই, মন থে কাজটো কর্। ভালো কর্যা গা টিপে দে।

ঝড়ু ভয়ার্ত যতনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—শোহুরে যাবি লাই? যতন শুধোয়। তারপর আমেজে চোখ বোজে।

—হুঁ, যাব ত।

—ত, তৈরি হয়্যা থাকিস। মো যাব শিগ্‌গীরি। ল্যে যাব তুয়ারে।

—হয় লিকিন? ঝুটা কাথা ত লয়?

—ত, তুয়ার সাথ্‌ মাজাকি করছি, সেতার বাচ্চা?

তবু শেষ পর্যন্ত ঝড়ুর আর যাওয়া হয় না। কি করে কথাটা লালটেনের কানে চলে গিয়েছিল। সশংকিত বাপ ছেলেকে বুঝিয়েছে, খ্যাপা হছিস লিকিন তু? শোহুরে কুথাকে যাবি গ? আপ্‌না আদমি কে আছিক সিখেনে তুয়ার? মো থাকব লাই, তুয়ার আয়ু থাকবেক লাই। কার কাছে যাবি গ?

—কেনে, মো শোহুর গ্যে হুই এট্টা কল্‌ কিন্যা ন্যে আসব। তারপর -। ঝড়ু জিম্বা টকর টকর করে।

লালটেন ছেলের মুখ চেপে ধরেছিল।—মোদির উ ত্থে কুনো জরুরৎ লাই, বাপ্‌। ভুলে যা উ-সব কাথা।

—কেনে, তা'লি জিৎ সিংয়ের মতুন খাসা মাটি কাটতে পারব, আর গান গাইব।

লালটেন সেবারে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়েছিল। অন্য কথা বলে প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেয়েছে।

ঝড়ু যায় নি। কথাটা আবার চাউর করে দিয়েছিল ঘরে-বাইরে বিভিন্ন জায়গায়, যতনই নাকি তাকে যাওয়ার জন্য পেড়াপীড়ি করেছিল। শহর থেকে গ্রামে ফিরে এসে একলা বাগে পেয়ে একদিন তার উশুল তুলেছে ফের যতন। ধাই ধপাধপ গাঁট্টা কষিয়েছে ছোকরার মাথায়। এমন সময় পঞ্চানন সেখানে এসে পৌছলে, তবেই রেহাই মিলেছিল।

ক্রুদ্ধ যতন অবশ্যই সহজে থামবার পাত্র ছিল না। তখন ঝড়ুকে ছেড়ে পঞ্চাননকে নিয়ে পড়েছিল —এঁহে কিষাঁড় গ মোর। একটু থেমে তারপর বলেছিল, গাড়োল কুথাকার। শোহুর থিক্যা সাধ কর্যা কেউ বাদায় আসে গ। জানোয়ার শালা।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। বিহ্বল পঞ্চানন গোবেচারার মতন জানতে চেয়েছে।—শহরে বাড়তি কি আছে ?

—কেনে, তুয়ার ইয়ে আছিক, জানিস লাই ? অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে এবারে প্রায় নেচে উঠেছিল যেন সে।

ঝড়ু সেইদিন থেকে আরো বেশী ন্যাওটা হয়ে ওঠে পঞ্চাননের। আড়াল মতো একটা স্থানে গিয়ে প্রস্থানোদ্যত যতনের উদ্দেশে জিব দেখিয়ে, লাথি ছুঁড়ে, 'খচ্চর শালা' বলে খানিক গালি দিয়ে, শেষে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল। তারপর পঞ্চাননকে জড়িয়ে ধরে ডাক দিলে, আজ তু লাই এল্যে, মোরে শেষ কর্য়া ফেলাত গ, উ দানোটো। ব্রহ্মদৈত্য শালা।

পঞ্চানন তার হাত ধরে বলে।—চলো, তোমারে আর কেউ মারবে না।

অবশেষে একটা উঁচু টিলার প্রান্তে নির্জন স্থানে পৌঁছে দুজনে একত্রে গায়ে লাগালাগি করে বসে। বসে পঞ্চানন গান ধরল। ক্রমে সুর জমে এলে, ঝড়ুও গলা দেয়। বাঁধের সীমানা শেষের নিঝুম শব্দহীন চৌহদ্দি, অতঃপর এক বিচিত্র শব্দ মুখরতায় যেন তরঙ্গময় ঠেকে।

গান থামলে ঝড়ু এক সময় পঞ্চাননের হাত ধরে বলে উঠেছিল, মো শোহুর যাব লাই গ গায়েন, কুনোদিন যাব লাই।

পঞ্চানন তার মাথায় হাত বুলোলে, হ্যাঁ, তুমি যেও না কখনো। শহরে জাদা কিছু নাই। তোমাদের এই দেশটা একটা বন সন্দেহ নাই। শহর হল আরো গভীর বন। এই বনে যেমন সাপ-বাঘ আছে, শহরে পাবা মেলা মানুষ। দুদলেরই দাঁতে সমান ধার, সমান বিষ।

ঝড়ু ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পঞ্চাননের মুখের দিকে। পঞ্চানন কাশে, আরেট্টা কথা। তবু জঙ্গলের জানোয়ারদের সড়কি-বল্লম দিয়ে সামলানো যায়, শহরের মানুষের

লাগুড় পাওয়া ভার। বনের জানোয়ার শুধু শরীলেই কামড় বসায়, শহরের মানুষ দেহ খায়, আবার মনটারেও খায়।

ঝড়ু এসব কিছু বোঝে না। তার স্বভাবমতো হৈ হৈ ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

পঞ্চাননকে সেদিন যেন কথায় পেয়েছিল। শ্রোতার প্রস্তুতি দেখে না। বললে, তাই তো বলি, আমি সুখের প্রত্যাশী নই, এট্টু শান্তি চাই শুধু। বনে অসুবিধা আছে, কিন্তু আবার শান্তিও আছে। না থেমে আরো অনেক কথা বলে চলেছিল পঞ্চানন।

ঝড়ু নির্বাক বসে থাকে অশ্রু লাঞ্ছিত চোখে।

অবশেষে এম্‌ব্যাঙ্কমেন্টের ভাঙন ঠিকই কবলায় এল কর্তৃপক্ষের। তুহিনারও রাগ পড়ে জল কমতে থাকল একটু-একটু করে। পাড়ের ডুবে যাওয়া গাছ-গাছালি, নয়ানজুলির জমি-জেরাতের মাথা আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠতে আরম্ভ করল ওই সঙ্গে।

বাবু পাড়ার নোটিশে জানানো হয়েছিল, নদীর যেমন চরম মার অবস্থা, যে কোন মুহূর্তে ভয়ংকরী নাচনে দশদিকের সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দিতে পারে। সুতরাং সাবধান!

জলের ফোঁসানি কমতে, এখন দেহাতী বাসিন্দারা তাদের চিরদিনকার রেওয়াজে এই প্রশান্তির ব্যাখ্যা করল, হাজার হোক্‌ দেওতা কি তার সান্তানের কোন অসুবিধা দেখতে পারে? কু-হুপন্‌ হতি পারে গ, কিন্তন কু-আয়ু কখুনো লয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা চেঁচাল, হেই মা, মোদির রক্কা কর‍্যাচিস। মোরা যি তুয়ার বালবাচ্চা সব।

তবে তার আগে সেই গণ্ডগোলটা মিটোতে কম বেগ পেতে হয় নি মিশিরকে। প্রবল বর্ষণধারা মধ্যে গুটিগুটি আবার গিয়ে

দাঁড়িয়েছিল সেই উত্তপ্ত মানুষ ক'জনের মধ্যে। তারা পলকহীন চোখে দেখছিল তার মুখের দিকে। সেই চাউনিতে যেন বাওয়া বাসলার ধার। ঘোৎ ঘোৎ করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। মিশির চুপ। হাতে খোলা চাকু। অর্থাৎ তৈরী। আক্রান্ত হলেই, ধড়াধড় এলো-পাতাড়ি চালিয়ে যাবে হাতের মুঠি এবং কব্জি। পাশে একই মূর্তিতে বিরাজমান শ্রীকান্ত।

অবশেষে বিস্তর হুমকি-হাম্‌কা, কথা কাটাকাটি, শাসানো ইত্যাদি অনেক ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পোহানোর পর তবে একটা সন্তোষ-জনক রফায় পৌঁছুতে পেরেছিল মিশিরনাথ। ভাগ্য প্রসন্ন, পট্টির মাতব্বর শ্রেণীর কোন মানুষ ওই দলে ছিল না। থাকলে কি যে ঘটত, বলা মুশকিল। তারপর, খবরটা যথেষ্ট চাউর হলেও নানান হুজ্জত বাধার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং অত্যন্ত চুপেচাপেই সব কিছু সারতে হবে। ওদিকে আবার ধমকের থাবাড়িটাও থাকা চাই। ভয় না ধরাতে পারলে, উল্‌টে বাওয়া পুরুষই তোমার গর্দানা ছিঁড়বে।

মিশির চাকু তুলে নাচিয়েছে, আর মুখে খোনা খোনা হেসেছে।—বুঝলি, তোরা হলি এই বনের মালিক। কিষাড়। আমরা কে রে শালা? দুদিনকা সওদাগর ছাড়া তো অন্য কিছু নয়।

তারা চুপ করে থেকেছে।

মিশির মিষ্টি হেসে আবার বলেছিল. বেশ কিছুদিন হল একসঙ্গে কাজ করছি আমরা। আজ আর আমাদের মধ্যে মালিক-ভৃত্য কেউ নেই। বন্ধু আমরা সবাই। এখন কথাটা হল, ব্যাপার যখন দৈবক্রমে একটা ঘটেই গেছে, কি আর করা যাবে? কারুর তো হাত ছিল না এর পিছনে। মধ্যে থেকে আত্মীয়তার সম্পর্কটা নষ্ট করা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বল্? একটু যতি দিয়ে মিশির আরেক সুরে বাকী কথাগুলো শেষ করেছিল।—এটা তো ঠিকই, তুই আমার সাথে দুশমনি করলে, আমিও তখন তোকে

ছেড়ে কথা কইব না। বরং যতখানি পারি, খত্‌রা করারই চেষ্টা করব, নাকি রে?

এরপর মিশির একত্রে বসে হাম্‌ডি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের। এবং সেখানেই ঘুষের টাকাটা লেনদেন হয়।

মিশির বিরক্তি ভরা বলছে, আরে, ধর্‌ না ছাই। রেণ্ডী মাগীদের মতুন রকম-সকম করিস কেন, মাইরী। ভালো লাগে না ওইসব পীরিতেব ন্যাকামি।

তথাপি যখন গ্রহীতার-দলের উৎসাহের মাত্রা চড়ল না, মিশির প্রত্যেকের কোঁজেয় একটা করে দশ টাকার নোট নিজের হাতে গুঁজে গুঁজে দিতে থাকল। আর মুখে রসিকতা ভরা ধমক দিয়ে বললে, আরে, আমি কি তোদের নাগর নাকি, অ্যাঁ? ফেলো কড়ি মাখো তেলের খদ্দের? অযথা তবে মেলা কেল্লা করচিস কেন, ধন?

শেষে গলার পর্দা কয়েক মাত্রা নামিয়ে আরেক প্রস্থ লোভের ধূরি ছিটোলো, এখন এই দিচ্ছি, খুশি হয়ে ধর্‌। আগ্‌লি হপ্তায় 'মজুর কামাই'য়ের সাথ্‌ আরো মোড়ে টঙ্কা করে ধরতা দিয়ে দিব, দেখিস। ফিকির নাই। নে, ওঠ্‌ এবারে। ঘরে যাওয়া যাক। সেই সন্ধ্যা থেকে সমানে বর্‌খামে গিলা হচ্ছি, বড়ি জুখাম লাগতেছে এখন।

দলের মধ্যে বুঝি একজন ঠিক ধরে ফেলেছিল মিশিরের চালটা। অর্থাৎ, এই দল তাড়িয়ে মিশির এখানে আরেক বেগানা নতুন দল নিয়োগ করবে। একবার যাদের সঙ্গে কারবারে চিড় ধরে গিয়েছে, তাদের দিয়ে, বার বার রগড়ানো যেমন ম্যানেজার সাহেব আদৌ পছন্দ করে না, মিশির তার সুযোগ্য শাগির্দ, সে-ও সম্ভবত ওই সিদ্ধান্তেই বিশ্বাসী। ওইতে কাজ নাকি কখনো ভালো হতে পারে না। টেপা হেসে সেই লোকটা জানতে চেয়েছিল, আর হুই, গেট মুখে বস্তা ফেলার কি হবেক গ? লিকিন, আর জরুরৎ লাই উ কামের, আঁ?

—না, তা কেন, আছে বৈ কি। মিশির অপ্রস্তুত হয়েছে।

—তবে? হি-হি। তবে?

মিশির চাপা ধমক দিয়েছে।—আঃ, চুপ কর।

লোকটার হাসি তবু বন্ধ হয় নি। বলেছে, বুঝেছি। মো বুঝছি গ, তুয়ার খেলটো।

যাহোক্, শেষ পর্যন্ত আর নতুন দল নিয়োগ করতে হয় না মিশিরকে। এদের দিয়েই কাজটা সম্পন্ন করে। এবং সিঁড়ি বেয়ে নিচেও আর কাউকে নামতে বলে না। ওপর থেকে ছয় সেলের টর্চ জ্বেলে ঝুপঝাপ বস্তা ফেলা হয়। তাইতে কিছু বস্তা অবশ্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে এদিকে-ওদিকে ছিট্‌কে গিয়ে পড়বে, কিন্তু কি আর করা যেতে পারে। ওই ক্ষতিটুকু স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চরম মুহূর্তে এইভাবে গণ্ডগোলটা মিটে গেলেও, অচিরেই আবার আরেক ব্যাপার ধরে দুহিনার পাড় সাঁতরানো স্বচ্ছ শীতল বাতাস ঝড়ের ডাকানি তুলল।

পাড়াঘরের রীতিনীতি ভেঙে কিছু করতে পারবে না, অথচ মিশিরের উপদেশাবলী নিত্য ঢেউ এঁকে যাচ্ছে বুকে। ফি মেয়ের জন্য এক বোতল করে পাউরা ও একখানা টাট্‌কা পাঁচ টাকার নোট। সাধারণ কথা নয়। দুদিন ঘুরলেই যা কিনা দশরূপী এবং দু' বোতল করে পাউরাতে দাঁড়াবে। তেমনি তিন দিন ঘুরলে—। আর, এসবই হবে কিনা নগদ বিদায়ের কারবার। হাতে হাতে পাওনা। উঃ! একসঙ্গে এত কথা ভাবতে পারে না হারুলোর। মাথার ঘিলু-হাড়ে তালগোল পাকিয়ে যাবার উপক্রম হয়।

কঁদিন বেঘোরে জ্বরে পড়ার ফলে যৎসামান্য যেটুকু উপার্জন হয় বাঁধের কাজে, গত হপ্তায় তাও হয় নি। অথচ টাকার দরকার। নাহলে, এ হপ্তায় বাকী চারদিন নির্ঘাত উপোস দিতে হবে। সুতরাং

খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা হ্যাচকা দাঁও মারার ভাবনায় কদিন থেকেই তক্কে তক্কে ফিরছিল হারুলোর। এমন দিনে মিশিরের সঙ্গে বাঁধের এক নির্জন চত্বরে আবার তার দেখা হল।

মিশির প্রথম সম্ভাষণেই ডাকলে, ওরে এই, হারুলোর না গুলিখোর, কি যেন নাম।

হারুলোর বিকশিত দন্তে হাসল, পাহিকটো এঁজ্ঞে গ, হাজরাবাবু।

—আচ্ছা যা বুঝলাম। এরপর মিশির সোজাসুজি জানতে চাইল, পারলি কিছু কাজ ফাঁসাতে? নাকি, বেমালুম ঝিমরা মেরে গেলি। ভুলে গেছিস কথাটা।

হারুলোর সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর করতে পারে না। অনেকদিন পর মাথাটা আবার এক দমকে ঝাঁ করে ঘুরে যায়। অতঃপর দোমনা উড়ু উড়ু চোখে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

--একটা আস্ত গাধা নিকি তুই? মিশির তার পিঠে সজোরে স্নেহভরা চাপড় কষাল। রোজগারের এমন সাদাসিধা মওকা পেয়েও, উশুল তুলতে পারলি না। দূর হ।

এবারে হারুলোর বুঝি গুনগুনিয়ে কিছু বলাব চেষ্টা করল।

মিশির তাকে কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে আবার শুরু করে, বুঝ্‌লি, এখনো মওকাটা হাত ফসকে একেবারে বেরিয়ে যায় নি। পারিস তো, এই বেলায় কিছু করেকম্মে নে। এই সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার পাবি না, মূর্খ।

একজন মেয়ের জন্য, একবোতল করে পাউরা ও একখানা পাঁচ টাকার নগদ নোট। দু'জন আনতে পারলেই দশরূপী ও দু'বোতল পাউরা। এবম্বিধ একখানা প্রস্তাব যে একসঙ্গে ভাবা সত্যিই কষ্টকর হারুলোরের পক্ষে। তার মাথা ঘুরতে থাকে বনবনিয়ে। হাতে পায়ে একটা অদ্ভুত রকমের খিল মারা অবস্থা। প্রথম শোনার পরদিন থেকে আজ পর্যন্ত কম বার কথাটা কানে এল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, যতবারই শুনেছে, ততোবারই এই একরকম নাড়াখাড়া

হাল হয়েছে তার। প্রস্তাবটা হুট্ করে ফেলেও দিতে পারছে না, আবার যেন ধাতস্থও হবার নয়।

মিশির গলা নামিয়ে, ভুরুতে কুঞ্চন জাগিয়ে, একইমতো বলে যেতে থাকল, মেয়ের তো ফুরান নাই রে বাঁধ রেকায়। কিন্তুক কথাটা হল, সাহাবের সবসে জাদা পসন্দ, লালকুঁয়োর রাঙা বাওয়ানী সুন্দরী। তাই তো বলছিলম, সুযোগটা কাজে লাগা। বেহুদাব মতন করিস নাই।

হেই আয়ু গ, আপুং গ! পাগল করিস লাই তুয়ার কুঙ্গা হপনটোরে।

বাওয়া পুরুষের খিজামের রক্ত ক্রমেই ছলাৎ ছলাৎ নেচে উঠছে ভিতরে, টের পাওয়া যায়। হাতে পায়ে একটা দম চড়ানো সুড়সুড়ি ভাব। মাথার মধ্যে হুড়ুস-ধড়াস আছড়ানি কিছুর। অতঃপর যেন আর কিছুতেই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারল না হারুলোর। একসময় আকস্মিক কাঠফাটা চিৎকার করে উঠল। এবং সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে থাকল, হেই, হাজরা মালিক গ, চুপো যা। চুপো যা, ক'ছি। মো বাওয়া মরদ বটিস। উ বাত্ মোর শুনতে লাই গ।

সে চেঁচিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়লে, মিশিরও তৈরি ছিল। কিন্তু উল্টো রকম দেখে, একটু যেন থতমত খেল। হারুলোর তার পা' জড়িয়ে ধরল। তারপর হুতোশে হাউহাউ করে ডেকে উঠল। পরে কান্নার দমক কিছুটা মন্থর হলে তার জানুতে মুখ ঘষতে থাকল। মিশির তার পিঠে স্নেহের করস্পর্শ রাখল। অতঃপর পিটিয়ে পিটিয়ে জ্ঞান দেওয়ার মতো বললে, আহাম্মুক কোথাকার। বাওয়া মরদ তো কি, বাওয়া মানষের খিদা পায় না? রূপেয়া কামানোর জরুরৎ নাই? তো, সকাল হলে সবাই বেড় পাড় ছুটিস কেন পড়ি মরি?

হারুলোর চুপ। গহিন গাঙে পড়া আর্ত মানুষ।

মিশির আবার তার পিঠে স্নেহভরা থাপড় মারল।—রূপেয়া কামানোয় কোন দোষ হয় না রে, উজবুক। যে পথেই তুই কামা। দেখিস না, তুলকায় সেজন্য কখনো মরচে পড়ে না। রূপেয়ার ধরম আলখ্, তোদের বাওয়া ধরমের মতো ঠুনকো নয়।

হারুলোর এরপর গোত্তা মেরে চলে যায়।

কিন্তু ফিরে এল আবার কিছুক্ষণ বাদেই। মিশির তখন একটা টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে রিভার রিসার্চের জলবাবুর সঙ্গে জলের বাড়া-কমা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। জলবাবুর কাছ থেকে প্রত্যহ এ সম্পর্কে পাকা তথ্য সংগ্রহ করে ম্যানেজার সাহেবকে সরবরাহ করার দায়িত্বটা মিশিরকেই বহন করতে হয়। তাই রোজই এসময় এখানে একবার আসতে হয় তাকে। বাঁধের কাজে জলের বাড়া-কমা সম্পর্কে খাঁটি তথ্য পাওয়া অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই নদীর মর্জি পূর্বাহ্ণে বুঝে নিতে হয়। এবং সেই অনুপাতে জল আটকানো বা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। বোধহয় ছুটতে ছুটতে এসেছে হারুলোর, বড়ো বড়ো হাঁপ ফেলল। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে, অদূরে দাঁড়িয়ে মিশিরের চোখে চোখে চেয়ে হঠাৎ বিরক্তিভরা ঝাম্‌টা দিলে, আনছি তুয়ার জুমা। এদিকে আয়।

জুমা! বাওয়া ভাষায় এর অর্থ, খাদ্য।

—হা-হা। মিশির হেসে উঠল অট্টরবে। বলিস কি কথা রে পাগল। এট্টা বাওয়ানী শরীল একজনার পক্ষে খেয়ে ফুরানো সম্ভব নিকিন এক রাত্তিরে, হাঁ?

—মাজাকি মৎ কর। কথার সঙ্গে হারুলোরের মুখমণ্ডল সহস্র কুঞ্চনে বেঁকে উঠল।

হারুলোরের সমগ্র মুখমণ্ডলে এমন ঘৃণার চিহ্ন বুঝি আর কোনদিনও ফুটে উঠতে দেখে নি মিশির। তার সঙ্গে কথা বলতেও যেন জাদান পুরুষের বমি ঠেলে আসছে। তবে কিনা এসব লক্ষ্য

করতে নেই তাদের। এত সব সামান্য ব্যাপারে নজরে ফেরালে, কোন ফুর্তি আমোদই আর করা হয় না। সেখানে বরং আরেক ব্যাপার ঘটে যায়। মারপিট, দাঙ্গা বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ, কে কার চেয়ে ছোট হবে? বাওয়া পুরুষ লড়বে, তার মাটির দাপে। এদিকে মিশিরও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়, কোম্পানীর হাজরাবাবু—মেলাই তার সাঙ্গপাঙ্গ। সুতরাং মিশির ওইসব না দেখে, হাসি হাসি মুখে যেমন বলছিল, এগিয়ে গিয়ে সপ্রশংস হারুলোরের কাঁধে হাত রাখল। সাবাস। তার পিঠ চাপড়ালো, এই তো বুদ্ধিমানের মতুন কাম-কাজ। বলে আবার তার পিঠে ঠোকা দিল।

হারুলোর যেন এক্ষণে বাস্তবিকই পাকা ব্যবসায়ী। চেনা-জানার কোন সম্পর্ক নেই, যেমন ফড়েরা হাটে এসে কথাবার্তা বলে, সবেতেই লেনদেনের প্রসঙ্গ। হিসাব পরিষ্কার করতে ঘাড় পাথালি করে বলে উঠল, মোর পাওনাটো লগদে আগে মিটায়ে দিবি ত? লিকিন—

—হা-হা। ওর দুর্ভাবনাখানা বুঝতে পেরে মিশির ফের গলা তুলে হেসে উঠল। তারপর সান্ত্বনার স্বরে জানালে, আরে, ন'-না ভয় নেই। তাই হবে'খন। তোর পাওনা, তুই আগেই পাবি।

হারুলোর গজরালো, হুঁ, উধার-বাকী রাখা চলবেক লাই। যা কথা ছিল। সোঝে বাত্।

তারপর তার পিছু-পিছু ঢাল পেরিয়ে নিচের সমতলে নামতেই মিশির দেখতে পেল, যথার্থই একজন মেয়ে এদিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে নখ্ কামড়াচ্ছে। পড়ন্ত দিনের আলো-আঁধারিতে মুখ স্পষ্ট নয়। তবু সে চিনতে পারে, ঝুমনি।

শনিচারীর দিনান্তে হপ্তা নেবার জন্য রেজা মজুররা তার চবুতরায় এসে ভিড় জমায়। হেদমা বেড়া। ফুর্তির বেলা। রেজা কুলি-কামিনের হাতে সেদিন ট্যাকের গুছি মেলে।

মানুষ ভিড় জমিয়ে সেই বিকেল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে দাওয়ার ওপরে। সন্ধ্যার অনেক পরে এসে মিশির ঘরের দরজা খোলে। অলস হাতে লণ্ঠন ধরায়। অতঃপর হাতের টুকিটাকি কাজ সারে। ফুঁক ফুঁক বিড়ি টানে। তবু কাজে বসার কোন লক্ষণ পরিস্ফুট হয় না। ক্রমে উপস্থিত কুলির পালে উসখুসানি শুরু হয়। অবাধ্য কৌতূহলে বার বার উঁকি দেয় তারা ঘরের ভিতরে। তখনো মিশিরের কোন আগ্রহ কিংবা তাড়া জাগে না। সে দেওয়ালে হেলান-পিঠ হয়ে বিড়ি টানতেই থাকে। অথচ এই ছলনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার হক্ কারোর নেই। নাস্তানাবুদের একশেষ হবে তবে সে। সকলের শেষে হয়তো তন্‌খা মিলবে তার। কিংবা হয়তো আদপেই সেদিন মিলবে না। শুনবে, তোর হিসেবে একটু গণ্ডগোল রয়ে গেছে রে অমুক, পরে আসিস। হিসাব কিতাব করে দেখে রাখবখন।

নেহাতই কোন বিচ্ছু মানুষ না হলে বলবে না, কই গ মিশিরজী, ঠেইক্যে রাখলি যি বড়। মিটায়ে দে লাই বাপ্, চল্যা যাই। ঝুটমুট কোন দিক্কৎ দিস গ?

মিশির তার উত্তরে ঘর থেকে খিঁচোয়, কেন রাজকার্য ছিল কিছু, ফস্কে গেল? হাবামি কোথাকার।

আরো অনেক পরে মিশির ওঠে। এসে আঁটসাঁট হয়ে বাগিয়ে বসে পুনরায় বিড়ি ধরায়। একটু-একটু করে টেনে-টেনে একসময় নিঃশেষ করে সেটা। এরও বহু পরে হাজিরা খাতা খুলে আসল কাজে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময় রেজা মজুরের চোখে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় মিশিরকে একটা ভুতুড়ে জানোয়ারের মতন লাগে। চোখ জ্বলছে চিকচিকিয়ে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। শিরাতোলা দুই হাত সারসের পায়ের মতো সরু এবং লম্বা। বুক পর্যন্ত ঝোলানো চাবড়া ভাঙা মুখ। কপাল ওঠানো, ঈষৎ বাইরে ঠেলে আসা গোছের। আর এসব ছাপিয়ে, বসাতেও কেমন একটা ভয়ংকর পশুর ভাব ফুটে

থাকে। যেন ঝিমোচ্ছে, কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে প্রবল গর্জনে ফুঁসছে। এখুনি বুঝি কারো ওপরে চড়াও হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তারই তাক্ করছে রয়ে রয়ে।

সেদিন কায়দা করে এই ঝুমনিকেই সকলের শেষে তন্‌খা দেওয়ার সূত্রে একরকম দল ছুট করিয়ে একলা করে ফেলেছিল মিশির। বাইরের দাওয়া তখন জনশূন্য।

তবে আগে যেন দেখে নি, হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, এমনি বিস্ময়ের ভাব চোখে তুলে মিশির স্মিত হেসেছে, আরে ছো, আর তুই বাকী আছিস শুধু? বলে তার প্রাপ্য বাড়িয়ে ধরেছিল সামনে।

ঝুমনিও তেমনি। মেয়ে ছেলে একবার নষ্ট হলে যা হয়, বারো বাসরের মেয়ের মতোই তখন তুঙ্গে চড়া তার ছোবল। এবং অকুতোভয় চলাফেরা। বুরন মারা যাবার পর কিছুদিন তবু সে একটু ঝিমিয়ে ছিল, কম কথা বলত, হাসি আনন্দেও ছিল একটা শান্ত স্থিরতা। পাড়া-ঘরের অনেকে আশ্বস্ত হয়েছিল, বুড়ো রাঁড়ি বিধবা ঝুমনি এতদিনে বুঝি সত্যি সত্যি বিধবা হল। কিন্তু অচিরেই সব জল্পনা-কল্পনাকে নস্যাৎ করে সে আবার তার সহজ রূপ প্রকাশ করলে। সামান্য কথাতেই চেনা-অচেনা মানুষের গায়ে সেই হেসে হেসে গড়িয়ে পড়া। উচ্ছল চপলতায় চোখ ঠারা। বুকের ধাসা বের করে দেখানো। মাঝে মেতেছিল আরেক সর্বনাশা খেলায়। যদিও সে পর্ব এখন কিঞ্চিৎ মিটেছে। বুরন গিয়েছে, তার জায়গায় এসেছিল নতুন এক মুখ। তাও বাওয়া পাড়ার কেউ নয়, বিহারী রেজা এক ছোকরা। এবং সম্ভবত তার চেয়ে বয়েসে সে কিছু ছোটই ছিল।

মিশির গলা খাঁকারী দিলে, ঝুমনি চোখ মটকে আদুল গায়ে হিল্লোল তুলে হেসে উঠেছিল, হাই গ, এতক্ষণে দেখলি লিকিন, আঁ? দেখো কাণ্ডখান, পোড়া কপাল তবে মোর। বলার ফাঁকে একসময় আঁচলে গিট বেঁধে টাকার পুঁটুলিটা ঠিকমতো গুছিয়ে নেয়।

মিশির লণ্ঠনের ম্লান আলোয় আবার খোলা-গা ঝুমনির দিকে

চায়। ঝুমনি তার চোখে চোখে চেয়ে অর্থপূর্ণ টিপে টিপে হেসেছে। মিশিরের খ্যাশখেশে কণ্ঠ সেবারে আরো মোলায়েম তরল তুহিন হয়ে গিয়েছিল।—তোর রাত হয়ে গেল খুব, না ?

—হল লিকিন ? কছিস গ ? হি-হি! ঝুমনির ফুরফুরে হাসি তখনো গতিময় থাকে।

—হ্যাঁ, একটু ভুলই হয়ে গেল। একেবারে খেয়াল করি নি।

—লিকিন ? হি-হি! ঝুমনির হাসি এইবারে আরো কয়েক মাত্রা ওপরে বেজেছিল।

ধামসা গতরের ঝুমনি এমনিতেই দারুণ এলোথেলো। এখন জঙ্গুলে হাসির ঝর্ণায় সম্মুখ ভাগের কাপড় স্থানচ্যুত হয়ে পরিপূর্ণ উদ্বেল বক্ষ দৃশ্যমান। হারিকেন লণ্ঠনের তির্যক পাণ্ডুর আলোয় পিছল মুখ তার জ্বলছে ঝকমকিয়ে। মনে হয় যেন সে ই কোন আলোর উৎস। লণ্ঠনটা জ্বলছে, তার প্রতিবিম্বের ছায়া পড়ে।

কঁ-কঁ-ক্যাঁচ। মাঠের উঁচু-নীচু অসমতল পথে গরুর গাড়ির চাকা দাবে-ওঠে। মিশির আর যেন সহজ চোখে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। যেমন ভিতরে লপলপিয়ে বুক নাচছে, ওপরের দেখাতেও পূর্বাপেক্ষা আনচান করা অস্বাচ্ছন্দ্য। অতঃপর সে সহসা খ্যাপার মতন তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল।

ওদিকে, ফাজিল ঝুমনি আগেই যেন বুঝেছিল মিশিরনাথের মতলবখানা। এবং সেইমতো তৈরি ছিল। চট্ করে সে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা উলটে দিয়েছিল, তারপর পলকমাত্র সময় নষ্ট না করে সরে গিয়েছিল ঘরের অন্যপাশে। শেষে খোলা দরজা পথে সুট্ করে বেরিয়ে পড়েছিল বাইরে। মিশির কোন হদিসই করতে পারলে না। চোখের ধাঁধা সইয়ে নেবার আগেই, সব কর্ম সমাধা।

পরে, সামলে নিয়ে উন্মুক্ত দরজা পথে দাঁড়াতেই ছায়াবিনী ঝুমনিকে সে দেখতে পেল, বাইরের টিলার পাকদণ্ডী ধরে প্রায় ছুটে নেমে চলেছে। মিশির পিছনে ডাকল। কিন্তু সে ডাকে কোন

আমল দিল না সে। একবার পিছন ফিরে তাকালও না। মিশিরের তখন কেন যেন ছুটে গিয়ে তার পথ রোধ করতে ভয় করল। ঝুমনির দৌড়নোর ধরন দেখে মনে হয়, সে যেন কোন কু-দৃষ্টির নাগাল এড়াতে চায়। তাই চকিত সন্ত্রস্ত, অথচ প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে।

পরদিন মিশির তাকে একলা বাগে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে। তক্কে তক্কে ফিরেছে সারাটা সকালবেলা। হাজিরা-ঘরে চাকতি জমা দেবার সময় সেদিন আবার কি খেয়ালে ম্যানেজার সাহেব এসে কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, সুবিধা করা গেল না। খাদানে জোবা করা গেল না, মেলাই মানুষজনের ভিড়। পথে ধরবার জন্যেও কম কোসিস করে নি। মেওয়ালালের চায়ের দোকানে ঝাড়া একটি ঘণ্টা নিষ্কর্মা বসে কাটিয়েছে, আর গ্লাসে গ্লাসে চা খেয়েছে। এক গ্লাস চায়ের দাম তিশ নয়া। মিশিরের বেলায় রেট যদিও কিছু কম, বারো নয়া করে নেয়। ছ' গ্লাসে সুতরাং ঝুটমুট বারো আনা পয়সা খসে গিয়েছিল। অথচ তাকে ধরা গেল না। কোন্ পথে যে সেদিন পালালো, কোন হদিসই হল না। বিকেলেও পাওয়া গেল না কায়দা মতো। দল ছেড়ে এক পা এল না আড়ালে। মিশির চোখ মটকেছিল ঝুপ্ করে। কিন্তু সে কোন প্রত্যুত্তর দিলে না।

তারপর আজ সরাসরি নিজেই এসে হাজির হয়েছে '

ঝুমনি আঙুল কামড়াল। ইতিমধ্যে হারুলোর কখন সরে পড়েছে।

মিশির একটুক্ষণ হকচাকয়ে যায়। পরে জিহ্বায় ছক্ছক্ একটা আওয়াজ তুলে বুড়ো শেয়ালের ভঙ্গিতে তাকে ডাকলে, কি রে, তুই যে বড়ো?

ইদানীং পট্টিবর একাই প্রায় রাত্রিদিন গুলজার করে রেখেছে ঝুমনি। মুচকি হেসে কিচ্ড়ির আঁচল চাপল মুখে।

শেষবেলার সূর্য এখন বিচিত্র বর্ণে আকাশকে ফালাফালা

করছে। গাছের লম্বাছায়া দূরের পাহাড়-চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। দিগন্তরেখা স্লেটের ওপরে অস্পষ্ট খড়ির টানের মতন মেটেলী আভায় অঙ্কিত। সেই পাণ্ডুর দিক্‌চক্ররেখা ও চিত্রিত আকাশের রঙের ছায়া পড়ে, বোতলের কাঁচের মতো ঘষা লাগছে বাঁধের নিচের জলাধার।

মিশির নিম্নকণ্ঠে ফের জিজ্ঞাসা করল, কি রে, হঠাৎ এমন সুমতি হল যে? যাবি নাকি আমার সঙ্গে? মান্‌জার সাহেবের সাথ্‌ দোস্ত্‌-আশনার মোহব্বত হবে, কত মজা।

ঝুমনি এবারও মুখে কোন সাড়া না দিয়ে একই মতো ঠোঁটের প্রান্তে আঁচল চেপে হাসল।

এই এক ভুজরুঙ্‌ মিশিরের। মেয়ে ফুসলোবার বেলায় কখনো সে নিজেকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু বলবে না। সর্বদা ম্যানেজার সাহেবের নাম করে কথা বলবে। এমন কি, নিজের জন্যে শিকার টোপে গাঁথবার সময়ও ওই চালেই এগোয়। সাহেবের জন্য জোটানো পণ্য সামগ্রীতেও এক-আধটু ঠোক্কর না দিয়ে, এক পক্কর না চেখেই, একেবারে হুঁজুর-সমীপে পেশ হয়, এমন নয়। ঝোপ বুঝে সেখানেও এক হাত দাঁও মেরে নেয় ঠিকই। বিস্রস্ত কাপড়ে হাঁচা-বাঁচা করে সেই পণ্য মেয়ের শরীরে কি খুঁজবে, ওদিকে ভেক্‌টুকু ঠিক আছে। সমানে ম্যানেজার সাহেবের গুণকীর্তন করবে মুখে। আর সেই সঙ্গে. ওই মেয়ের সঙ্গে সাহেবের ভালবাসা হলে মানাবে খাসা—এই আজগুবি বয়ান বলে যাবে। এবং বর্তমানে রত ক্রিয়াকর্মটাও যেন সে নয়, সাহেবই করছে।

লালকুঁয়োর বাতাসে এখন বহুবিধ গাওনা। বাওয়া মেয়ের পায়ে আগে কখনো রুপোর মল উঠত না। যদিও তাদের চলাতেই একটা ঝমঝমানির আওয়াজ আপ্‌সে বাজত। এখন গলাতেও চৈতী চকোর হাঁসুলি জ্বলে দাগ বেলার আলো ছড়িয়ে। এবং দরিয়ার ঝুমুর নাচের ছন্দ শোনা যাবে বাওয়ানী চিংড়ির কথার ঢঙে।

পুরুষদের হৃদয়ও আজ মনখ্যাপা বিচিত্র ডাকে সরব দিনরাত্রি। সন্ধ্যায় আলোকিত মণিহারী দোকানে থরে থরে সাজানো বিপণী দেখে বেড়ায় কেউ। কেউ আবার বিহারী-তেলেঙ্গানা রেজা মহল্লায় সুন্দর করে সাজা, ফিকিরে ফেরা মেয়ে দেখতে বেরয়।

তার বুকেও আছে তুহিনার গহিন টান। এবং এখানে যখন উপযাচক হয়ে এসেছে, মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি করেই তবে এসেছে। এ জায়গা তো আর মঠ, দেউল, অথবা বঙ্গার থান নয়। জাদান মাগুকির দেহে রূপের সল্‌মা-চুম্‌কি তুলবে। বাঁধরেকার সবচেয়ে হুজ্জতি সাজ। অপর মেয়ের চোখে তুহিনার পাড়ের বালি কিচ্‌কিচানি খেলবে।

মিশির অতঃপর সজাগ হুঁশিয়ারীতে, তার চিরদিনকার প্রয়োগ কায়দায় আরম্ভ করলে, অবশ্যই আমার সাথ্‌ গেলে কোনদিনই কারো কোন ভাবে লাভ ছাড়া লুকসান হয় না। নাকি বল্‌, ঝুট্‌ বুলছি? সবই তো জানিস।

ঝুমনি চুপ। মুচকে হাসল আবার একটু। পরে বললে, হুঁ, তুলাড়ের ফাউ মিলবিক, জানি।

বোকাটে মুগ্ধ চাহনি সরে এখন মিশিরের স্বাভাবিক নিজস্ব ক্রূর সর্পিল ছায়াটা একটু একটু করে ক্রমেই ডানা মেলে ফুটে উঠছে। নাকের পাটা ফুলে উঠতে থাকল ঘন ঘন। একটু দম নিয়ে, ঝুমনিকে এক পলক স্থির চোখে নিরীক্ষণ করে ফের আরম্ভ করল, হাঁ, অন্যায় করি হয়তো। লেকিন এটো বলতে পারা যায় জোরসে, আমুরা কভি লুঠেরা নেহী। জাদান মেয়া লিয়ে এট্টুস ফুর্তি-ফার্তা করি ঠিকই, তেমুনি প্রতিদানে দিয়েও থাকি আবার বহু চিজ। সব ব্যবসাতেই যেমুন লেনদেন আছে। বলে এক মুখ বদান্য-ভরা হাসল। আবার বললে, নাকি বল্‌, ঝুট্‌ বুলছি কিছু? সবই তো জানিস।

একথা ঠিকই, মিশিরের মালিক ম্যানেজার সাহেবের দিল

ওপর আসমানের মতোই দরাজ। যে তার রাত সঙ্গিনী হয়, পরদিন সে রূপের ঝলকে-চমকে পট্টির রানী। অঙ্গে গহনার রোশন-চৌকী। এবং কিচ্‌ড়ির সে কি জেল্লা-চটক।

এখনকার দাঁড়ানো, কথা বলার ঢঙে-চমকে ঝুমনি যথার্থই বাঁধরেকার পাড়বাসী মেয়ে। মিশির এবারে স্বচ্ছ দেখল, তার পরিধেয় বসনের নিচে সজাগ বুনো ঢেউটা ঠিকই অক্ষত আছে। এবং সমগ্র শরীর সাপ্‌টে বাওয়া ঝুমকোর চোরা হাতের খুনিয়ার ঝিলিক চমকাচ্ছে। এইতেই সে যেন নাগিনী নয়, বাওয়ানী হয়েছে।

চতুর্দিকে টিলা আর জানা-অজানা গাছের বন। শেষ বিকালের শূন্যতা পেয়ে জলাশয়ের কাছাকাছি ব্যাঙ্‌ ডাকছে। এরপর রাত্রি হবে, তারপর আবার সকাল। মিশির কয়েক সেকেণ্ড আবোল-তাবোল নানা প্রলাপ ভাবল। অবশেষে কি ভেবে হঠাৎ বললে, খাসা মানাবে কিন্তুক তোদের দোজনায়। যেমন মান্‌জার সাহেবের শরীর। তুইও দেখছি কম্‌তি নয় কিছুতে। পাক্কা দোস্ত্‌-আশনার মোহব্বত হবে রে তোদের।

ঝুমনি অল্পে বলল, বাজে কথা ছাড়। বঙ্গার দোহাই।

—তোর বঙ্গার গুষ্টির ইয়ে করি। দেশোয়ালী ভাষায় অশ্লীল খিস্তি দিয়ে উঠল মিশিরনাথ।

বন্য সাপিনীর মাথায় বুঝি সহসা পায়ের আঘাত লাগবে। লহমার মধ্যে সাপিনী একবার ফোঁস করে ফণা ধরে উঠে দাঁড়াতে চাইল। তারপরই চট্‌ করে কি মনে পড়ে যেতে, তাড়াতাড়ি ফণা নামিয়ে আবার সহজ শান্ত হয়।

মিশির পরিষ্কার বুঝল, পায়ে পায়ে শিকার ক্রমেই এসে তার হাতের মুঠোর মধ্যে ঢুকছে। শংকিত, ভীরু চলনে এই আগমন, তথাপি এর গতি অপ্রতিরোধ্য। কোন বাধাই আর সংযম ফিরিয়ে আনতে পারবে না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ঝানু চোখে বুঝতে এতটুকু ভুল হবার কথা নয়।

মিশির জিজ্ঞাসা করল, রসগুল্লা খেয়েছিস কোনদিনও? দেখবি চল্, কি বড়িয়া খানা।

ঝুমনি ভুরু তুলে চুপ করে একদণ্ড দেখল মিশিরের মুখের দিকে।

মিশির এবার সাফ-সটান প্রস্তাবটা বলল, আমার সাথ্ আখুন গেলে নয়া কাপড় পাবি এট্টা। ওহি সাথ্ এ্যয়সা খানা খিলাব, যা তুই কখুনো খাস নাই। উম্‌দা খানা সে-সব। আর, তিনরোজ না-হাজিরা কামের মজুরী মিলবে। বলে সে গলা খাঁকারি দিল। দর-দাম প্রথমেই পাকা করে নেওয়া ভাল, নাকি বল্?

আদিবাসী মেয়ে মনের বহুতর লান্দা এবম্বিধ অসামাজিক নিমন্ত্রণেই মেলা-সম্ভব। সে শুনল, থম খাওয়া-খাওয়া একটা ভাবে। বুক কাঁপল বুঝি তার অজানিত কোন শীতল শিহরণে। অতঃপর সহসা ঝুপ করে জিজ্ঞাসা করে উঠল, ভাগে শাড়ী ত? শাড়ীটা ভাল কিনা?

—নয়? হাতের নাগালে টোপে-বেঁধা শিকারকে লক্ষ্য করে বনবিড়ালের মতো গোঁফ মুচড়োলো মিশির। হাসল, আমুরা কুনদিনও কাওরে কুন বুরা চিজ দিই না, জানবি, হাঁ। পরে আবার বলল, আমাদের জিনিস একদিন পড়ে দেখিস, ঝাড়াই-বাছাই সমুদা মাল সব।

ঝুমনির উচ্চারিত গলায় চটাৎ-চটাৎ ঢেউ। আরক্তিম দেখাচ্ছে এখন তার মুখমণ্ডল। কাপড়ের বাঁধের নিচে প্রমত্ত তিনবাহিনী তুহিনার ধারা। সে যেন কোন গোপন কথা কইছে। স্বর নামিয়ে র-র করে অনতি স্পষ্ট গলায় পরে জানতে চাইল, আরো কিছু দেবে কিনা? অন্তত বেলুজ এট্টা। জিহ্বার আড় ভেঙে বাওয়া মেয়ে ব্লাউজ বলতে পারে না। বলে, বেলুজ।

মিশির এতক্ষণে সামনে খোলা রাস্তা দেখে ঈষৎ চড়া গলায় কথা বলল, আচ্ছা, বেশ, বেশ। পাবি।

ঝুমনি কি এই প্রস্তাব শুনে অধীর, উৎচপল হবে? কিন্তু কই,

পারছে না কেন তেমন করে? অন্তর-নিভৃতে যে গুঞ্জনই চলুক, জাদান দেশের সকল পুরুষ-নারীই যে ইতিমধ্যে যাবতীয় সংস্কার বিসর্জন দিয়ে বসতে পেরেছে, এমন নয়। এ বুঝি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনের ওপরে শিকড় গাড়া সেই জরদ্গব পাষাণ ভারটা এখনো যেন রয়েই গেছে। আজো বাওয়া ধিজ্গা'মর রক্ত বহমান তাদের শরীরে। ভালবাসাবাসিতে নয়, দেহ বিক্রি করে ওই সব সওদা কিনবে, শত প্ররোচনাতেও সে বুঝি কিছুতেই স্বাভাবিক উচ্ছলতার অতিরিক্ত তরঙ্গ-সঙ্কুল হতে পারছে না।

ঝুমনি বাদে রেজাপাড়ার আর যে সব মেয়ে বাঁধরেকার বারো বাসরের পাকা খাতায় নাম লিখিয়েছে, তাদের মধ্যে সুরসুতিয়া একজন। বিহারী ছাপড়া বস্তির জেনানা।

ঝুমনির মতো কড়ে বিধবা নয় সুরসুতিয়া। ঘরে ওর তাগ্ড়া জোয়ান স্বামী আছে। লেণ্ডী-গেণ্ডীও একপাল। কিন্তু কি ওর নেশা, গতরের জ্বালা যেন আর মেটে না। বেটাছেলে দেখলেই ঘনিয়ে কাছে যাবে, তারপর চোখের লেনদেন যদি কিছু হল, অমনি নিরালা জায়গার সন্ধান খোঁজো। বয়েসের কোন বাছ-বিচার নেই। জাতি-ধর্মেরও বিশেষ তোয়াক্কা করে না। একটু ভদ্র রকম-সকম হলে তো আরো আহ্লাদ। পিছনের কোন টান নেই, তড়িঘড়ি ভিড়ে পড়ে। শরীর ওর অদ্ভুত রকমের রসবস্তু, ভরা-ভরা। উন্নত বুক। পুরুষ্ট সবল মাজা পাছা। হেঁটে গেলে ঝুমঝুমিয়ে কোমর-কাঁখাল দোলে। যেজন্য বাঁধরেকার অনেকেই বলবে, মাগীর শরীলে এত রস আসে কোত্থেকে রে, বাবা। বিৎকিল যিন। মহিষ যেন।

মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে সে গিয়ে সাহেব বাংলোয় হাজির হয়। খাদানে একদিন ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলে, সাহেব তাকে পরে দেখা করতে বলেছিলেন। সেইমতো ঘনিষ্ঠতা এখন নিবিড়তার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফাঁক-ফোঁকর দেখে, নিরালা সময় বুঝলেই, গিয়ে হাজির হয়।

যদিও অন্যান্য রেজা মেয়ের চেয়ে বাওয়া মেয়েই সাহেবের বেশী পছন্দ, গায়ের রঙ ফর্সা বলেই শুধু নয়, পোষাকে-আসাকেও অপরাপরদের চেয়ে বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। প্রত্যহ স্নান করে। কাপড় পালটায়। যত্ন করে চুলের খোঁপা বাঁধে। খয়ের গাছের ছাল পুড়িয়ে চমৎকার এক প্রকার শুভ্ররেণু বেরোয়, হাতে-মুখে-বাহুতে তাই ঘষে ঘষে ছড়িয়ে মাখে। তাই বলে ভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে তিলমাত্র অনুদার নয় সাহেব। সেদিক থেকে বরং সন্দীপ রায় যথেষ্টই.নরমপন্থী। নারী মাত্রই তার চোখে সুন্দরী। তবে ভোগের আগে তাকে শোধন করে নেওয়া দরকার। এবং সে-কথা সে প্রকাশ্য বলেও।

সাহেব তাকে একখানা রুপোর গহনা তুলে দেখায়। জিজ্ঞাসা করে, কি রে, পসন্দ্ হোতী ? দেখ্, ভাল করে।

কম বেশী এসব পাওয়া তো সকল ক্ষেত্রেই আছে। সুরসুতিয়ার ক্ষেত্রে হয়তো আরো কিছু বেশী পাওনা জোটে। ঘরে মজবুত জোয়ান স্বামী, তথাপি চিংড়ি আ-ছেচা পরাণ-তার। বুক কাঁপে-ল-ল করে। চোখ না-তোলা, বন্ধ পল্লব হয়। যেন আবেশে সমগ্র অন্তরাত্মা বিভোর হয়ে পড়ছে। ঠোঁটের পাতা নড়ে, কিংবা কণ্ঠ-নালী। ম্যানেজার সাহেবের হাতের স্পর্শে বাস্তবিক যেন কোন জাদু আছে। কোমল আবিল তার আবেশ। এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চময়তার স্বাদ এনে দেয়, উপলব্ধিকে ফুল-গন্ধী করে। গায়ে গতরে জবর পালোয়ান বেজা কুলি যেমনটি কিছুতেই পারে না, এবং বোধহয় জানেও না কাকে বলে।

ম্যানেজার সাহেব জানতে চায়, তুই যে এলি, তোর মরদ দেখে নি তো ?

অমনি বাঁধরেকার রেজার মেয়ের মুখ শুকিয়ে যায়। ঘরের বউ, তাগড়া জোয়ান স্বামী থাকতে পর পুরুষের সঙ্গ পেতে অভিসারে এসেছে। সে আরো মুখ নামিয়ে রাখে মাটির দিকে। মাথা নাড়ে

না। দেহে তারও জাদান দেশের মেয়ের মতো কাড়া-নাকাড়ার বুলি। অহোরাত্রি তুড়িও ধ্বংসা বাজছে। সে সহসা বলে ওঠে, আমি যাই তবে। বলে হ্যাঁচকা টানে বসন গায়ে জড়িয়ে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হয়।

সাহেব তখন হাসে, আরে, যাবি কেন? আচ্ছা পাগল দেখছি তো তুই। বলে তার গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়। দিতে দিতে আবার বলে, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম, নাহলে ওই কি কোন প্রশ্ন? আহাম্মুক কোথাকার।

সুরস্থতিয়া এবারে সলজ্জ এগিয়ে আবার পাশে বসে। আর কোন ঝামেলা পাকায় না। সাহেব ওকে বাথরুম দেখিয়ে, শোধন হয়ে আসতে বলে। অতঃপর সেই মতো এলে, একেবারে গায়ে তুলে নেয়। ও চুপ করে থাকে। সাহেব ওর শরীরের এখানে সেখানে হাত রাখে।

পরে একসময় সেই রেজা মেয়ে যদি অনুচ্চ শুধোল, কি খুঁজো, গো?

সাহেবের ভুরু নড়ে কেবল। মুখে কোন বাক্য ফোটে না।

—হুস্। মেয়ে তখন ঝাঁকি মেরে শব্দ করে গলায়। যেন কোন নেশার আগমনী রস খেয়েছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করে, কি ওড়াচ্ছিস? মনের গুমোট বাতাস?

মেয়ে খিলখিলিয়ে হাসে, যা বুঝিস গ।

সাহেব অতঃপর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে জমিয়ে বসে ওর সঙ্গে। তাকে একবার কোলে বসায়, আবার হাতের ওপর তুলে ধরে।

মন্ত্রগুপ্তির ব্যাখ্যানে এ যেন এক নতুন ডাক। স্বামী ভাগনও তাকে ডাকে। কিন্তু কই, এমন মাতাল করা আহ্বান তো তাইতে থাকে না। নয়নপত্রে পালক বুলিয়ে খুব লঘু টানে মদির স্বপ্ন-টিপ পরিয়ে দেবার মতন এর অনুভব।

সাহেব তার বুকে, গলায় মুখ পাতে।—সুন্দর দিন আজ। তোকে দেখাচ্ছেও বড় খুবসুরত রে।

জলটুঙির মিঠেল গতিছন্দে ঝড়ো হাওয়ায় রেজা মেয়ে হাসে সেই প্রশংসার প্রত্যুত্তরে।—ওহো, ওহো। মানজার গো, কি অদ্ভুত গলায় তুই বুলিস গো।

মহিলা মহলে সুরসুতিয়া খুব খোলা মনেই এসব গল্প করে। অত লুকোছাপা কারবারের মধ্যে সে নেই। শুনে অপরাপর মেয়েদের মধ্যে ঝুমনি কেমন যেন আনচান করে ওঠে। চোখের পিচি নড়ে ফরফর করে। বুকের নিভৃত প্রদেশে যে ঠাঁই ঠাঁই আঘাতটা রাত্রিদিন গড়িয়ে চলেছে, দীর্ঘ পুরুষ সঙ্গেও মনের মানুষটি আজো মিলল না।

সুরসুতিয়া ঠাট্টা করে, তা গেলেই প্যারিস উখেনে। বলে উঠ্‌তি ছুকরির কোণ মারা চায়।—আর্মাটো পুরা হয়্যা যেত। বলে, হেসে হেসে পুনরায় বলে, বঙ্গার থান রে, বঙ্গার থান। যার যা কোয়েদা, গিয়া দাঁড়ালেই পেয়া যায়। কোয়েদা হল চাওয়া।

ঝুমনি চুপ করে থাকে। আর কি কেবল চিন্তা করে।

না, তবু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয় নি।

তারপর এতদিনে ভরসা করে মিশিরের মুখোমুখি হয়েছে।

মিশির এবার সম্ভাষণ করল, হাতে বুঝিন কোন নাগর নাই এখন, তাই পয়সার খাক্‌তি পড়েছে?

ঝুমনি নখ্ কামড়ালো।

দিগন্তের বর্ণ ক্রমেই আরো ঘোলা হয়ে আসছে। বাঁধের পাশে ধূসর মাঠে অস্বচ্ছ আকাশের ছায়া পড়ে গাঢ় তামাভ দেখাচ্ছে ঘাস-পাতার রঙ। গাছগুলো যেন ব্যাঙের ছাতা।

ঝুমনির হঠাৎ কি হয়, হাসির ঝঞ্চনায় হেলেদুলে একেবারে অস্থির হল। ঢলানি কণ্ঠে সুর টেনে, শেষে বললে, জেকা লে ইমা ইল্‌কা। ভাগ্যিস, মোদির মেয়াছেলা কর‍্যাছিল বঙ্গা।

মিশির বুঝল, দারুণ ভয় পেয়েছে আদিবাসী বউ। তাই ভয় কাটাতে অমনি হাসছে। আবার চোখ গেল তার পরিধেয় বসনের নিচে বুনো সজাগ ঢেউয়ের প্রতি। ঢেউ যেন লক্ষ-কোটি শিখরে নাচছে। না, অত কাঁচা মর্দানা মিশিরনাথ নয়। এত তাড়াতাড়ি মাথা গরম ক'রে এই খোলা মাঠের ওপরে হাঁপাঝাঁপি করতে যাবে না। নিজের দাঁও মারার কথাও এখুনি কিছু বলার দরকার নেই। সময়ে সবই হবে। শিকার একবার ভাল করে গেঁথে নিয়ে ঘরে তুলতে পারলে হয়। তারপর সেদিনকার চালাকির হিসাবটা পরিষ্কার করা যাবে। ঝুটমুট বারো আনা পয়সা চায়ে গলে গেছে, তারও উশুল তুলতে হবে। কিন্তু মাথা যে কিছুতেই ঠিক থাকতে চায় না। সেদিন যেভাবে সে ভোগা দিয়ে পালিয়েছিল, তার চরম কামনার মুহূর্তে—সেই থেকে মনে মনে একপ্রকার বিজাতীয় ক্রোধে ঝুমনির ওপরে ফুঁসেছে মিশির। একবার গুছিয়ে বাগে পেলে কি আর একপ্রস্থ না চেখে ভাল মিষ্টি কথায় সহজেই নিস্তার দেবে তাকে। তাহলে তো এই বেড় বাঁধের চাকরি করতে আসাই চরম মূর্খামির কাজ হয়েছে। কি ভেবে সাহসে ভয় করে এগিয়ে তার চিবুক তুলে ধরল।—খুব দোহান চিঁড়িয়া তুই, না? সেয়ানা পাখি? ভাবছিস, আমরা কিছু বুঝি না? পেটে খিদে, মুখে লাজ খালি। তারপর একটু যতি দিয়ে ভরসা দেবার মতন গলায় আবার বললে, কিন্তু বলি, অত ফিকির করবার কি আছে? ডর কিসের তোর?

থেকে থেকে দৈহিক কাঁপুনি ঠিকই চলছিল ভিতরে ভিতরে। এখন আরো যেন হালভাঙা অবস্থা হয়। ঝিমঝিমিয়ে কাঁপিয়ে নেয় সমস্ত অন্তর-মন। এ যেন এক অদ্ভুত কষান। বিচিত্র একরকম দুর্বলতার আবেশ ক্রমেই এমন বজ্র আঁটুনিতে চেপে ধরছে দম-নিঃশ্বাস, মনে হচ্ছে, এর পর সে বুঝি আর সটান সতেজ থাকতে পারবে না। আবার কেঁপে উঠে তাড়াতাড়ি মিশিরের হাত ঠেলে

নামিয়ে দিল চোয়ালের ওপর থেকে। দিয়ে ঝামটে বলল, খপর-দার, হুট্-হাট কখুনো গায়ে হাত দিবি নাই।

—কেন, দিলে কি হবে? মিশিরও সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভেংচে উঠল।

ঝুমনি অল্পে বলল, দিয়া দেখতি চাস ত, দিস্ হাত। তারপরই বুঝবি, কি হয়।

মিশির আস্ফালন করল, এহে, রহব যে ভারী। ঝাড়ু মার মুখে! তার গলা কাঁপল হাওয়ায় ভাসা চিলের সঙ্গে। চিলটা এতক্ষণ বসেছিল অদূরের একটা জারুল গাছের শীর্ষে। এখুনি পাখা ভাসাল নদী ধরে উত্তর বরাবর।

এতক্ষণে ঝুমনির যেন চমক ভাঙে। সে এখন ঋজু, টান-টান। কাঁচা-বয়সের বুনো ঝোড়ার দামাল মেয়ে। বাঁকা চোখে তাকাল। মিশির জানে, ওই ঝামটানিতে পিছিয়ে গেলে চলবে না। যদি বুঝে থাকো টোপে গাঁথা পড়েছে শিকার, জানবে, চোখ মুখের ওই ভাবভঙ্গিই আবার আকর্ষণ করার আরেক ছল বাওয়ানী তরুণীর। ঝামটাবে, ততোই আরো পা টানবে ঘন বন পথের দিকে।

মিশির তাকাল নিচের দিকে। রঙ্গিণী তুহিনা লঘু চপল কল-কণ্ঠে বয়ে চলেছে লালমাটির পাড় ছুঁয়ে। পাড়ের পাথরে শ্যাওলা জমে মজা দয়ের মতো ছোট ছোট জলঘূর্ণি উঠছে।

মিশির যদি এইখানে সামলাত নিজেকে, ব্যাপারটা তাহলে বাঁধরেকার একটা মামুলি ঘটনা হতো। অহরহ যেমন ঘটছে এই পাহাড়-বনের দেশে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝি আর কামনা চেপে রাখতে পারলে না। ভড়ংটাও টুটে গেল। ঝুমনি সরে যাচ্ছিল পথের একপাশে, মিশির এক ঝাট্‌কায় তাকে সামনে টেনে এনে ধরল। তারপর বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, এত অল্পে চটে যাস কেন? যাদের এত্তালায় খাস পরিস তাদের টুকুন সম্মান দিয়া কথা বলতে

পারিস না? আমরা কি তোদের শত্রু! বলে ম্যানেজার সাহেবের নাম করে ক্রমেই তার দেহ সংলগ্ন হতে থাকল।

কি বলবে এই বোকা পুরুষকে? বাওয়ানী মেয়ের কাছে এই লুকোচুরি খেলার চেয়ে কৌতুকপ্রদ, লঘু আনন্দের ব্যাপার—আর কিছুতে নেই। ঝুমনি ফস্ করে হেসে ফেলল।

আদিম ইশারায় বন-দুহিতার পূর্ণায়ত চোখ বুঝি কয়েক দণ্ডের তরে আলো ঝিলমিল দেখাল। পরক্ষণে ঝুমনি হঠাৎ কেমন কেঁপে উঠল। মিশিরের লোভী হাত এর মধ্যে তার মেয়েলী শরীরের কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গের পথে হাঁটা ধরেছে। পরে আরো এগিয়ে পরিধেয় কিচ্‌ড়ির শেষ-বাঁধন ধরে টানাটানি শুরু করে দিল।

তবু ধীরভাবে সে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল। সেইসঙ্গে নিস্তেজ চাপা কণ্ঠে হুঁশিয়ারী দিলে, মো আখুনো পুরা বাওয়ানী মেয়া কিস্তন গ হাজরাবাবু। ইয়াদ রাখিস—

কিন্তু মিশির যে এখন আর নিজেতে নেই। চোখ জ্বলছে ধকধকিয়ে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। ততোই আরো খ্যাপার মতো ঘাড় মাথা ঝাঁকিঝুঁকি দিতে থাকল। বেহুঁশ উন্মত্তের দশায় মানুষ যেমন বেঘোরে থাকে, তেমনিভাবে ক্রমাগত ঝুমনিকে সে হাতে টানতে থাকল।

বন্য সাপিনীর মাথায় বুঝি এবারে সত্যি সত্যি পা পড়ে যায়। বাওয়ানী মেয়ের মন চায় তো ভালো, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর জুলুম করা চলে না। তা-ও আবার ভিন-পারসী যদি হল। এই বনবাসী মেয়ের নিয়মই হল, যদি মনে ধরল তোমাকে, তোমার জন্য সব করতে পারবে। আবার প্রয়োজনে পেটে খুনিয়া ভরে দিতেও কার্পণ্য নেই।

প্রথমে ঝাপটানি দিয়ে নিজেকে কবল-মুক্ত করল ঝুমনি। তারপর বুকের উপর মিশিরের পাকালো খামচি বসানো হাতটা

মুচড়ে মুচড়ে একসময় ছাড়িয়ে নিলে। ঝুমনির মতন বারোয়ারী ভোগের মেয়ের পক্ষে এ সকলই অভাবনীয় একটা কিছু।

লালকুঁয়োর মেঘভারে আকাশ থমথমে। রাত্রি নামছে। অরণ্য মাটির হিজল-পলাশবনে পত্র মর্মরে, অতীতের মানুষের আর্তশ্বাস। ঝুমনি কি তাই শুনল? বাঁড়িয়া মহাজনদের হাতে যারা এককালে বলিদান হয়েছে। লালমাটির ইতিহাসে তাদের নাম বেদনার আখরে রঞ্জিত হয়ে আছে। পরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, একুবারে খতম হয়্যা যাবিন কিন্তুন, শেষবার কয়্যা দিচ্ছি। তু যদি হাজরাবাবু লাই হতিস, এতক্ষণে বুঝতিস—। কেটে কেটে কথাগুলো বলে 'থুঃ থুঃ' করে থুতু ছিটিয়ে দিল তার দিকে।

কিন্তু উন্মত্ত মিশিরের তখন কোনদিকে দৃক্‌পাত হয় না। হাত বাড়িয়ে তাকে ফের ধরতে সচেষ্ট হয়ে বললে, তু সোন্দরী। মানজার সাহাবের সাথ্‌ দোস্ত-আশনার পেয়ার-মোহব্বত হবে দোজনার—।

সব সাজানো হয়েছিল যথা নিয়মে। তবু শেষ রক্ষা হল না।

চোখে আশংকার মলিন মেঘ মেখে ঝুমনি তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল। দিন বুঝি এবারে একেবারেই চুরি হবে পাহাড়ের ওপিঠে ভেঙে পড়ে। কোথায় বন-কাদর একটা ডাকল। পিহু, পিকু-পিকু পি-উ-উ।

কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে হাসনা। মিশিরের জামার কলার চেপে ধরে প্রথমে সে গর্জে উঠল, শালা নংপানা। বাইরী হড়। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে পুনরুচ্চারণ করলে, বাওয়ানী মাওকিরে ফুসলানো হচ্ছে, অাঁ? শালা বজ্জাত কাঁহিকা। মাজা একুবারে ভেঙে ফেলাব, কসবীর কুক্কোস।

ঘটনার আকস্মিকতায় মিশির একটুক্ষণ হকচকিয়ে গেল। তারপরই সিধে হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। সে হাজিরাবাবু। পশ্চাৎ ঘুরলো। সপিল প্যাঁচ কষে চেঁচাল, শালা খচ্চর, ছাড় শিগ্‌গীরি।

হাসনা সেই চেপে ধরে থেকেই গজরালো, দুশমন, এঁড়পা হড়।

অবশেষে ছাড়া পেয়ে বিক্রমী পুরুষের মতো টান টান হয়ে দাঁড়াল মিশির। শিমুল-ফুল রঙ চাউনি বিঘূর্ণিত করলে একবার চারিধারে। সটান সিধে চুলের রেঁায়া। গোঙা স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে পরে হুংকার দিলে, বড়ী মস্তান বন্ গয়া তু, নাহি রে? শের? আচ্ছা, দেখেঙ্গে।

হাসনা তখন গলা চড়িয়ে হেসে ওই জিজ্ঞাসার জবাব করলে, নেহী, তুয়ার বাপ হুঁ মো। দেখ ল্যে ভাল কর‍্যা।

মিশির এবার পুরোমাত্রায় ঝাঁজিয়ে কোঁতানি পাড়লে, রেঁ, দেখব নিশ্চয়। আমি বাপ, কি তুই বাপ।

তারপর, তখনো হাসছিলই হাসনা, হঠাৎ মিশির তেড়েফুঁড়ে একটা বেপরোয়া ঘুষি চালালে। ঘুষিটা আচম্‌কা গিয়ে একেবারে হাসনার নাকে পড়ল। অপ্রস্তুত হাসনা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। নিকটেই আবার কয়েকটা চাঙড় পাথর ছড়িয়েছিল। সেই পাথর-স্তূপে প্রচণ্ড আঘাত লেগে মুহূর্তে নাক-মুখ-কপাল ফেটে তাজা রক্তধারা স্রোতের মতন কলকলিয়ে ছুটল।

এতটার জন্য কেউই তৈরী ছিল না। তবু মিশির এতেও ক্ষান্ত হতে চাইল না। হাসনা কষ্টক্লিষ্ট উঠে দাঁড়াতে যাবে, সে দ্বিতীয় বিষাণ হানলো। হাসনা এবার আর টাল ধরে রাখতে পারলে না। একেবারে খেলনার মতো লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপরে।

এতক্ষণ ঝুমনি একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ত্রাস-ভরে সব প্রত্যক্ষ করছিল। খানিকটা যেন বিসম্বিতও হয়েছিল। পুরো দৃশ্যপটটাই ছিল আকস্মিক। ফলে এক বিচিত্র শিহরণ দোলায় সে স্তব্ধ হয়েছিল। এবার ডুকরে চেঁচিয়ে উঠল। একই পট্টির মরদ।— খুন কর‍্যা ফেলাছে গ শকুন। তুয়ারা সব ইদিকে আয় জলদি। ঝুমনি চিৎকার করল।

বাসি দাড়ির ছায়া পড়ে ঘন কালো দেখাচ্ছে মিশিরের মুখ-মণ্ডল। তার ওই শুক্‌নো পোড়া তালপাতার সেপাই চেহারাতে ভয়ংকর আসুরিক ভাবের প্রকাশটা যথাযথই মনে হয়। তাই অমন

একখানা হিংস্র আচরণের পরও অবিচল নির্বিকার থাকে। পরন্তু, চোটপাট করে ঝুমনিকে ধমকে উঠল, মেলা চেঁচাবি তো, তোর চেহারার ছিরিও কিন্তু এই রকম করে দেব।

প্রথম খেপে তাকে গায়ে টানার চেষ্টার পরও তবু যেটুকু তরল ভাবনা মিশির সম্পর্কে ছিল, এখন আর তার তিলার্ধ অবশিষ্ট নেই। সুতরাং ঝুমনি মিশিরের ধমকানিকে কোন গুরুত্বই দিলে না। সে যেমন চেঁচাচ্ছিল, চেঁচাতে থাকল।

মিশির ঝুমনির হাত ধরতে গেল। ঝুমনি খিঁচিয়ে উঠল, দেখবি সেতা-এংনামু? আয় তবে তুয়ারে দেখাই, বাগুয়া মেয়া কারে বুলে?

মিশির তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল। দেখল, বাগুয়ানী মেয়ের চক্ষু এখন স্থানীয় জঙ্গুলে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। যেন আগুন লেগেছে শাল-পিয়ালের বনে, দাউদাউ করে জ্বলছে। মুখখানা অদূরের হেলানো কার্নিশের তির্যক রোদ পেয়ে ঈষৎ তেলতেলে, তাইতে মুখের কাঠিন্য আরো থম ধরা। আর, সেবার সে যা করে নি, কোমরের ভাঁজ খুলে চকচকে একখানা খুনিয়া বের করে এনেছে। শক্ত মুঠিতে ধরা সেই খুনিয়ার ফলাতেও আগুনের ছড়াছড়ি। এখন আওতার মধ্যে মিশিরের মতন শয়তানকে যেন আর একদণ্ড সহ্য করতে পারছে না।

সেবার যেমন ঝুমনি অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে গিয়েছিল, মিশির পিছনে হটে এল। এত ঘটাপটার পরও কিছু হল না। কায়দা করে বাগানো গেল না। শুধু তখন যেটুকু নগদ বিদায় হয়েছিল। কেন কে জানে, এখন তাকে ঘাঁটাতেও আর কোনমতেই সাহস হচ্ছে না মিশিরের। কিছু নয়, তবু যেন উৎসাহের ফানুসটা কেমন ফেটে গেছে। সে আর্তভাবে তাড়াতাড়ি চারিদিকে একবার চাইল। ঝুমনির দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে গিয়ে তার সমস্ত শিরদাঁড়া ধরে যেন তরল একপ্রকার শিহরণ স্রোত বইতে শুরু করেছে।

ওদিকে ঝুমনি তখনো তাকে সমানে আহ্বান করে চলেছে, কই আয়, ডাংরা। হিম্মতখানা দেখা দেখি তুয়ার। এখুন পিছাস কেনে? বলছে আর খুনিয়াটা নাচাচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে সমানে থু-থু করে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মিশিরের সহসা লক্ষ্য পড়ল, ঝুমনির চিৎকারে ক্রমেই একজন দু'জন করে মানুষ আশপাশ হতে দুরদাড় দৌড়ে এসে এক জায়গায় জমায়েত হচ্ছে। যত নোংরাই হোক, ঝুমনি এখনো এই নীলবান দেশেরই মেয়ে। সেখানে ব্যাপারটা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। হাসনা তার সাক্ষী। আবার হাসনার ওই অবস্থা ঘটেছে!

কোম্পানীর বিচারে হয়তো হাজিরাবাবুর কাজের ওপর খবরদারী করতে যাওয়ার এই পরিণাম হওয়া উচিত! কিন্তু এই মুহূর্তে মিশির একলা এইভাবে এখানে আর দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করল না। বাঁধের কাজে কিছু নতুন বহালী লোক নয়। আগের-আগের কাজের ভিত্তিতে অনেক রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতা আছে। জঙ্গুলে মানুষগুলো সময়ে সময়ে যে সত্যি বনের জানোয়ার হয়ে উঠতে পারে, বিলক্ষণ জানা আছে। তখন তাদের দাঁড়ানো, কথা বলাতেও—সেই উচ্ছল নাচন। ভয়ে বুক শুকিয়ে যাবার কথা। কিন্তু তাই বলে মিশির আদৌ ছেড়ে দেবে না। অতঃপর এক পলকে মনে মনে সিদ্ধান্তটা পাকা করে নিল, ঝুমনিকে সে ক্ষমা করবে, কিন্তু হাসনাকে কোনমতে নয়। হ্যাঁ, কোন মার্জনা নেই। বরং আজকের এই দৃশ্যপট রচনার জন্য সমুচিত শিক্ষা সে তাকে দিয়ে ছাড়বে। এমনিতেই হাসনার ওপরে সে আগাগোড়াই রুষ্ট ছিল, রাস্তাঘাটে দেখা হলেই হারামজাদা তাকে 'মালিক মালিক' বলে উল্লেখ করে কৌতুক করে। বলে আর মুচকে মুচকে হাসে। আজকের ক্রিয়াকাণ্ড তাইতে যেন আরো ইন্ধন যোগাল। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে বললে,—এ কিছু নয়। আরো ভালো করে তোকে মজা দেখাতে চাই রে, হার্মাদ। তার গলা ভীষণ জোরে চড়ে

গেল যেন মুখস্থ রাখা বয়েৎ আবৃত্তি করছে। সে আবারো সেই একই পংক্তি বলে খিঁচিয়ে উঠল, নেহী সাক্‌তা ত হম্‌ তবে মিশিরনাথ নেহী, হুঁ।

কিছুদিন আগে খোদ ম্যানেজার সাহেবও এই রকম এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল। এবং বুদ্ধিমানের মতো 'পলায়তেঃ স জীবতি' পন্থা অবলম্বন করে বেঁচেছিল। যদিও মিশির সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না, পরে বিবরণটা জেনেছিল। তবে সাহেব ওই নিয়ে আর কোনপ্রকার মাতামাতি করে নি পরে। ফলে বিরোধও দানা বাঁধে নি। কিন্তু সে তাই বলে মোটেই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়।

এখান থেকে নদীর তরঙ্গ-বিক্ষোভ ঠিক শোনা যায় না। তবু মিশির উৎকর্ণ হল। তারপর বড় বড় পা ফেলে গতি বৃদ্ধি করল।

ক'দিন পরেই এইরকমই আরেক ঝুলন্ত সন্ধ্যায় নির্জন বনের পথে মিশির তাকে একলা ধরেছিল।

তবে সেদিনও কোন সুবিধা করতে পারে না।

ঝুমনি প্রথমেই বলেছে, সিদিন চল্যা যেছে গ মিশিরজী। হিসাব কর‍্যা কাম করিস। পথ ছাড়।

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করবে কেন মিশিরনাথ। তাহলে তো অনেক আগেই সভ্যভব্য হতে পারত। খিঁচিয়ে জবাব করেছে, নে, নে, হয়েছে। মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস নি। বলে প্রথামতো এগিয়েছে।

টান টান সবল বুক তুলেছে বাওয়ানী বাওসি মাওকির। আবরণ-শূন্য সুডৌল নধর বাহুলতা বাঁশের কঞ্চির মতো দৃঢ় দেখিয়েছে। বলেছে, ফির কছি, বৃথা কুনো লোভ দিখাস লাই গ। মোদির ধরমটো আজও এক্কুবারে যেছে লাই।

সারা শরীরে ঝাড়া দিয়ে মিশির তথাপি আরো এগিয়েছে। —জানি, জানি, হঁ। বহোত দেখেছি। নে ওঠা গতর।

তখন ঝুমনিও আর সংযত থাকল না। সেদিনকার সেই ঘটনার পর কি এক বিচিত্র অনুভূতি জেগেছে তার মনে, কেউ কিছু বদ্‌লে না থাকুক, আমূল পালটে গেছে সে। সেই ঝুমনিই নয় যেন। সপ্তমে গলা তুলে সেও একই ঝামটানিতে চিৎকার করে উঠল, মো খারাপ হয়্যাচি সাচ, কিন্তুন ইয়াদ রাখিস গ, মো আজ্ঞও বাওয়া মেয়া বটিস। হুঁ, ইয়াদ রাখিস। মিশিবকে বার বার মনে করিয়ে দেবার ফাঁকে যেন বিশেষ কোন ইঙ্গিত জানাতে চায় ঝুমনি। অতঃপর শেষবারের মতন বুঝি বললে, হুঁ, মো শেষ কিসিম বুলছি গ, ইয়াদ রাখিস—।

সে আর এখন সন্ধ্যার পর ভুলেও পট্টিঘর ছেড়ে বাঁধের দিকে যায় না। রেজা মহল্লার কোন ধাওড়ার দিকেও চকিত ত্রস্ত গতায়াত নেই। অবসর সময়ে আপন বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে ঘরে বসে জোরে হাততালি দিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া গান গায়। আজকাল কেবলই গুণিনের কথা মনে হয় ঝুমনির। মাঝে কিছুদিন একেবারে ভুলে গিয়েছিল বুড়োর মুখ। মাঝে মাঝে ঝোরকার কথাও মনে পড়ে। বড়ো অবাক লাগে, এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিল। খোয়ারী ভাঙতে, এখন আর কিছু চিনতে পারছে না। এই পট্টিঘর, নদীর তীর—সব মনে হচ্ছে অচেনা কোন ঠাঁই। গাঁ-লালকুঁয়ো কবে আবার এ রকমভাবে বদলে গেল?

সেদিন হাসনার উক্তিতে যেন কী ছিল। হাসনা চেঁচিয়েছে, দুশমন। শালা এঁড়পা হড়। বলে সক্রোধে আবার গর্জেছিল, মোদির জিন্দগীটো কাড়বুন করতি চাস, আঁ? শান্তি লিচিস, আখুন সুখও লিবি গ? মোদির তবে রবেটো আর কি?

কথাটা যেন আকস্মিক প্রাণে দেগে গেছে। অনেকদিন আগে টিক্রু একবার এই কথা বলে গুণিনকে গালি দিয়েছিল। গুণিন তখন অষ্টপ্রহর বাঁধরেকার আগন্তুক বাড়িয়াদের পক্ষে সালিশী করে বেড়াত। আর নানাভাবে এদেশ শহর হওয়ার সুখসুবিধা নিয়ে

ব্যাখ্যান গাইত। হ্যাঁ, ঝুমনি এখনো স্মরণ করতে পারছে সেই সব দিনের কথা। কথা শুনে শুনে তার সম্পর্কেই কেমন একটা নেশা ধরে গেল পাড়াঘরেব সকলেব চোখে, তেমন বুঝ-বাঝ মানুষ দ্বিতীয়টি আর যেন কেউ নেই। কত তার জান-চিন। দেখ্‌তাই কত কিছু।

তাছাড়াও, কথাটা আচমকা মনে আরেক ভাবনার আঁচড় টানলো। এমন করে বুঝি কোনদিন আর এ প্রসঙ্গ ভাবে নি। আচ্ছা, এই যে চূড়ান্ত যৌনজীবন যাপন করলো সে এতকাল— শান্তি পেয়েছে অথবা সুখ? অথচ এটা ঠিকই, দেহের এই প্লাবন চিরকাল থাকবে না। তুহিনায় যেমন ভাটির টানে লগি পড়ে ছপছপ, এই দেহের জলও একদিন মজে দুই পাড় বিস্তৃত ধু-ধু চর জাগবে। বেনো জলের ঘাই নেমে যাওয়ার পর জাদান দেশের যে শ্রী হয়।

ঝুমনি আবার গরগর করে চেঁচাল, ইয়াদ রাখিস, শেষ কিসিম বুলছি গ—

মিশির কি তাহলে ওই সামান্য শাসানিতেই এলে-গিয়ে সব সাধ-আহ্লাদ পরিত্যাগ করে একেবারে উদাস সাধু হয়ে যাবে নাকি? বা-রে কথা! তাহলে তো অনেক আগেই হওয়া যেত। এতদিন ধরে এতসব হুজ্জত-ঝকমারা পোহাবার দরকার কি ছিল? চোখে স্বপ্নাঞ্জনের ঘোর, বুকে তোলপাড় করা উল্লাস! ঝুমনি খানিক আগেও তার পানে মায়াবী কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে গা-দোলানো হেসেছে। সপ্রতিভ জবাব ও চোখ মটকানো তরলভাবের বিলোল তরঙ্গ তুলে বলেছিল, ভালোই করেছে তাকে ডেকে, তারও কিছু দরকার ছিল মিশিরের কাছে। মিশির দমবে না, থামবে না। বরং বন্যপশুর মতো চেঁচিয়ে লাফিয়ে একশা করল।—তুরে মাগী আজ নিয়ে যাবই। কোই বাত্‌ নেহী শুন্‌নে মাঙ্‌তা।

আর্তনাদের গলায় ঝুমনি সমানে হাঁপাল, মিশিরজী গ, ইয়াদ রাখিস—

মিশির পথ আগলালো। বেঘোরে থাকার ছটফটানি তার গলার গোঙানিতে। ঝুমনির হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে বাজ্ঞ পড়া স্বরে ধমকালো, উত্‌নি ঠমক দিখাস কেন। ম্যয় ভী হাজরাবাবু, হুঁ।

এতক্ষণে যেন বাওয়া মেয়ে তার স্বভাবগত পেখম মেলে উঠে দাঁড়াল।—হাজবাবাবু ফুঃ। এক ফুঁয়ে যেন রাশিকৃত ধুলো উড়িয়ে দিল। এইসঙ্গে আবার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। পরে তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে বলল, বোকার মতুন পথ আটকাতে আসিস, বেহদ্দ শেষ হয়্যা যাবি যি।

ঝুমনি অতঃপর পুরোপুরি বাওয়া খুনিয়া। কণ্ঠের নলী তোলা, চোয়ালের হাড় শক্ত। কোমরে গোঁজা গোপন অস্ত্র কখন সুড়সুড় করে হাতে উঠে এসেছে। মিশির দেখল, এ মেয়ে এখন আবার সেদিনকার শেষ মুহূর্তের সেই মূর্তি ধরা। ঠিক এই রকমই সেদিনও থর থর করে কেঁপেছিল তার সর্বাঙ্গ। গলা হয়েছিল পুরুষের মতো সুরহীন, বিচিত্র, ভাঙা-ভাঙা। দৃষ্টি আগুনের গোলক। এতক্ষণে চটকা ছোটে তার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাওসী মাওকির হাতে অস্ত্র। দিনমণির বিশ্রামবেলার আলো মেখে তা আবার চমক-দীপ্ত। মুখেও সেই আলোর প্রতিবিম্ব। সমস্ত জগৎ-সংসারটা যেন দাউদাউ আগুনে জ্বলে উঠেছে। খুনিয়ার ধার লেগেছে সর্বত্র।

—তুয়ারা ত কুত্তা। মুখের নিষিধ শুনিস লাই, খুনিয়া লাই বের করলি।

মিশির গোঁজ ধরে রইল। বাওয়ানী মেয়ের এখনকার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গির গমক-ঝমক কারো অজানা নয় এই জাদান দেশে। লালকুঁয়োর অরণ্যে চলিষ্ণু লতাদের বিষ সেখানকার মানুষীর দাঁতে, জিবেও বর্তমান থাকে—তারা বাওয়ানী ঝুমকো। ঝুমনি এখন তাই। নাগিনীর ফোঁসানী তার কণ্ঠে। তাছাড়াও, ওই নধর

সুডৌল হাতে এখন আদিম পুরুষালী ক্ষমতা। এবং উন্নত চপলা বুক মারাং বুরু। এই চেহারাতেই, পাহাড়-বনের মেয়েরা যথার্থ বাওয়ানী ইলকা নামে আখ্যাতা।

ঝুমনি গর্বিত উদ্ধত ভঙ্গিতে হাত তুলল, হট্ যা হিঁয়াসে।

পায়ে পায়ে নিতান্ত অনুগতের মতো মিশির তখন পিছিয়ে গেল। কি অবাক কাণ্ড, ঝুমনির খুনিয়ার ধার তার চোখেও জ্বলে উঠল নাকি? যেন আলো ঠিকরোচ্ছে।

আর ঠিক তখুনি, বিরাট এক অট্টহাসিতে উদ্বেল হয়ে সমগ্র বাঁধ-তল্লাট যেন টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। চকিত এ হাসি তুহিনার পাড-জোড়া চিরন্তনী চাপা নৈঃশব্দ্যকে এলো-খাবড়ি টানা-হ্যাঁচড়ায় ছিড়ে কুটিকুটি করে দিয়ে, পরিবর্তে বিচিত্র এক প্রমত্ত রোল জাগিয়ে তুলল। দু'জনে তারা একযোগে তাকাল পিছন দিকে। দেখতে পেল স্পিলওয়ে গেটের অদূরে একটা উঁচু টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে হাসছে হাসনা হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে।

মিশির তক্কে তক্কে ফেরে হাসনাকে কবলায় পাওয়ার জন্যে। তবে কি হাসনাও তেমনি ফেরে? নইলে এই মুহূর্তে এইস্থানে সে এল কি করে?

হাসনা সেখান থেকে খুশীতে ডগমগ হয়ে চেঁচাল, কামাল কর্ দিয়া, ঝুমনি মিসেরা। মস্ত্ কিয়া।

হাসনা আজ আর একলা নয়। আগে হতেই যেন গুছিয়ে-সুছিয়ে এসেছে। সাঙ্গোপাঙ্গ জনাকয়েক এনেছে সঙ্গে। তারা চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তার। এবং প্রত্যেকের হাতেই ধার-ওঠানো ঝকমকে টাঙ্গি-কোপাই যা হোক একটা কিছু। হাসনার মতো তারাও প্রগল্ভ খুশীতে চনমন করে হেলেদুলে হাসল। আচ্ছা জব্দ হয়েছে আজ হাজরাবাবু একজন বাওয়ানী মেয়ের কাছে।

হাসনা তাকে দেখিয়ে নিজের টাঙ্গিতে সশব্দে একটা চুমু

খেল।—স্‌্যাস! এই দেখ্‌, দুশমন। তেরো দেবতা বাওয়া জাত-ধরমের। সে যেন তাদের নামে কিরা খেয়ে শপথ করছে।

দল হাসল।

—মুরুব্বির কাথা মেন্থে শালোদির কাটব টুটুকরা কর্যা, হুঁ। বন্ধ চোয়ালের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষবার কিরকির আওয়াজ হল। চোখে সাবেক দুহিনার আকাশের প্রতিচ্ছায়া, লালকুঁয়োর অরণ্য-মর্মর।

মিশির একটু থতমত খেল। হাসনা যেন একটা ভয়াল জরদগব কুগ্রহের মতন তার স্কন্ধে চেপে বসে আছে আজ কিছুদিন হল। কিছুতেই ভারমুক্ত হতে পারছে না সে।

ঝুমনির রক্ত-চক্ষুর চিৎকার পাহাড়দেশের ঢিবি হেজামতীর গায়ে ধাক্কা খেয়ে এখনো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছে। সেইসঙ্গে হাসনার অট্টহাসির শব্দ। সে-ও যেন এখনো দ্রুত-জলতরঙ্গে হাসছেই, কামাল কর্‌ দিয়া। হা-হা।

বাহু-পেশী স্ফীত করে এখন দলবল সহ হাসনা এগিয়ে আসছে সামনে। সে বুঝি আজ সেইদিনকার বদলা উঠোতে চায়।

মিশির তাড়াতাড়ি এক পলক চারিদিকে চাইল। না, শ্রীকান্তটা আজও সঙ্গে আসে নি। বিশেষ বিশেষ দিনে কোনদিনই হারামজাদা সঙ্গে থাকে না। এদিকে মুখে বাক্‌ফট্টাই ঠিক আছে। ঝোঁকের মাথায় অযথা ওকেই খানিক গালি দিয়ে মনকে আশ্বস্ত করতে চাইল। নির্জন বন-উপান্তে বাঁড়িয়া পক্ষের সে একলা প্রতিযোগী। ওদিকে বনবাসী মানুষের আদিম চিৎকারে আকাশ বাতাস একই মতো কুচিকুচি হয়ে ছিঁড়ছে। হঠাৎ তার কেমন ভয় করতে থাকল। ঘাড়ে-গর্দানে ঘাম জমে উঠল। যদিও এতদিনে বাওয়া পুরুষকে তিলে তিলে তারা মেরে এনেছে, তবু এখনো বলা যায় না—সাপ, চিরদিনই সাপ। এবং মরণ-কামড়ের ঘাই চিরকালই একটু বেশী প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। অতঃপর

এভাবে এক ঠায় আর অপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ হবে না মনে হওয়া মাত্র তিলার্ধ বিলম্ব না করে ক্ষিপ্র হাতে ধুতির কাছা-কোঁচা গুছিয়ে বেঁধে নিল। তারপর আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে, চোঁ-চাঁ দৌড় হাঁকাল। এমন অপমান সে বুঝি আর জীবনে কখনো হয় নি। আগেরবার নাক ফাটিয়ে তবু কিছুটা শোধ নেওয়া গিয়েছিল, এবার তাও সম্ভব হল না। তবে সে-ও একেবারে ছেড়ে দেবার বান্দা নয়। দেখবে এক পক্কর। না, কোন দয়া-মমতা নয়। চাই ইন্তেকাম! প্রতিশোধ।

নিচের সমতলে নেমে মিশির একটুক্ষণ দাঁড়াল। একটু আগেও যেখানে সে ছিল, সেখানকার উচ্চতা এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট হবে। মিশির ওপরের দিকে তাকাল। না, কেউ পিছনে ধেয়ে তাড়া দিয়ে আসে নি। ওই পর্যন্ত এগিয়েই দল বেঁধে তাকিয়ে আছে সকলে নাবাল পথে। সম্ভবত তাকেই দেখছে। মিশির আবার দাঁতে দাঁতে ঘষে কিড়মিড় আওয়াজ করল। একটা জোরদার ব্যবস্থা এবার নিতেই হবে। কোনমতেই রেহাই দেবে না সে কুত্তাটাকে। এতবড়ো আস্পর্ধা হারামির।—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে। সে খর-খর পা চালাল।

এখন সন্ধ্যা ঘোর। পশ্চিম দিকও ধূসর আঁধারে ডুবে গেছে। বাঁধের চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় পড়লে, বস্তি লাইন নজরে পড়ল। সারিবন্দী খুপরি ঘর। ডিবরি লণ্ঠন জ্বলছে প্রত্যেক চালাতেই। মিশির একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা ধরল। মেয়েমানুষদের কখনো বকা-ঝকা করতে নেই। মেয়েমানুষদের ওপর রাগ করা পছন্দ করে না মিশিরনাথ। সেই হিসাব অনুযায়ী, ঝুমনিকে সে এবারও কিছু বলবে না। এবং ছিনে জোঁকের মতন পিছনে লেগে থাকবে শেষ পর্যন্ত। সুবিধা একদিন নিশ্চয় হবে। সেইদিনই এই উগ্র চামুণ্ডা মূর্তি ধরার ফয়সলা হয়ে যাবে। জমায়েতের অন্যদেরও এখুনি কিছু বলবে না। ভাইতে জল আরেক

ভাবে গড়িয়ে, আসল ব্যাপারটাই কেঁচে যেতে পারে। আগে বড় কাঁটাটা উঠুক, তারপর ছোটগুলোর ব্যবস্থা যথা সময়ে হবে। কথায় বলে, জলই জল বাঁধে। সুতরাং হাসনার শিরদাঁড়াটা আগে ভাঙতে পারলেই, কাম ফতে।

এর পরদিনই, বাঁধরেকা থেকে সমগ্র রেজা মহল্লায় ত্বরিতে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, হাসনা নাকি বিরাট দলবল নিয়ে ধোলাতে গিয়েছিল হাজিরাবাবুকে। খুনই বুঝি করে ফেলত। তাই, এই অপকর্মের শাস্তি হিসাবে, বেড় বাঁধের নোকরী তার গেছে। কাম-ছুট এখন সে .

যখন হৈ-হট্টগোল উল্লাসে আমোদিত চারদিক, একজন মানুষ কেবল নীরব নিভৃতে বিচিত্রভাবে তার অবসর সময় কাটায়। সন্ধ্যার পর সারিসারি ডিবরি লণ্ঠন জ্বলে ধাওড়ায় ধাওড়ায়, তার ঘর নিষ্প্রদীপ থাকে। চুলের রঙ ঈষৎ বাদামী হয়েছে তাব। মুখ কিঞ্চিৎ ঝুলে পড়েছে বুকের ওপরে। চোপসানো ত্যাবড়ানো গাল। মরা গরুর বর্ণে ফ্যাকাশে কোটরগত বড় বড় চোখ। শুক্‌নো পাটকাঠির মতো যেন মটমট করে, তার বুকের হাড়-পাঁজরার শব্দ। কাদের উদ্দেশে মনে মনে সে তখন গালমন্দ করতে থাকে, নিজেরও সঠিক মালুম হয় না। তবু সে বিরক্তিতে বার বার ভুরু কোঁচকায়, আর বিড়বিড় করে।—মর, মর তুয়ারা সকলে।

মাসুনের মাটি মঞ্জুর করে ফেরার পথে সেদিন যে কাণ্ডটা ঘটল, তারপর বেশ কিছুদিন আর বিকালের পর বাঁধের পাড়ে যায় নি সে।

তুহিনার ঠেল-বাতাস এবং জাদান গাঁয়ের মানুষের নিঃশ্বাসে এখন যেন সেই কথারই ঠাস-বুননি।—হিমালে হিংপা ছা, দেংকো মারাঞ্জি মে। এই বিষময় সংসারে কেউই বুঝি যথার্থ সুখী নয়।

যে আতা চারাটি একদিন চবুতরার আঙিনায় নিজের হাতে পুঁতেছিল মাস্থন, এখন সেটা কচি পাতা ছেড়েছে। পাতার রঙ ছাই থেকে সবুজ। নরম তলতলানি ভাব মরে রসরস আওয়াজ জাগে ডগা ভাঙলে।

আজ দৃশ্য বদলের পালা-খেলায় এক বিচিত্র রঙে চিত্রিত তামাম গাঁ লালকুঁয়ো। অরণ্য-জামেয়ারের গাওনায় পুরাতন রঙের অস্তিত্ব যেমন নেই. এক ভিন্নধর্মী স্থর বয় লালমাটির পাথরে পাথরে, ছুহিনার আকাশে-জলে। ইত্যাদি অনেক বদলের সঙ্গে এই নির্জন বনরাজ্য আবার অনেক মানুষের হবেক ভাষায় মুখর। নিঃসীম দিগন্ত রাত্রিদিন যান্ত্রিক কোলাহলে শব্দিত। ছুহিনার পাডবাসীদের ট্যাকে কাঁচা পয়সার গুছি। সন্ধ্যা না ঘনাতেই তাই আর নিশুতি নামে না আগের মতন।

বাঁধ-সীমানার গা-লাগোয়া নতুন মহল্লা হয়েছে খড়ি-ডুংরী চত্বরে। সেখানে খড়ো চাল উঠেছে কয়েক সারিতে। পাড়া বসেছে উর্বশী রম্ভা ললনাদের। সেই পাড়ায় সারারাত্রি হলদে বিশীর্ণ শিখায় লণ্ঠনের টিমটিমে আলো জ্বলে ভৌতিক ইশারায়।

—কে গো? প্রশ্ন হবে।

তুমি যেই হও, উত্তর দিলে অমনি চিল্‌ক চিল্‌কি হাস শোনা যাবে।—অ, নাগর। এসো, এসো। আমার ঘরে এসো, রাজা। অন্য আরো অনেকে ডাকবে, খদ্দের লক্ষ্মী গো। এসো. এই ঠাঁইযে।

দিন যত যাচ্ছে, স্থধ না ক্রমেই কেমন যেন হয়ে পড়ছে। এখন হাত বাড়ালেই অতি নিকটে দেদার ভালোবাসার জন মজুত পাওয়া যায়। কাড় ছাড়লে, তাদের সঙ্গে শরীরে শরীরে মিশিয়ে রাত-ভর শুতে পাওয়াটাও কিছু দুর্লভ সামগ্রী নয়। জাদান মানুষের ট্যাঁকেও এখন অঢেল কাঁচা পয়সার গুছি বাঁধা। ঝরলা কিরান। তবু এখন বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো মন নানা উঞ্ছ ভাবনায় চঞ্চল হয় না। বরং সেখানে এখন উলটো বোধ। বহুদিনই উঠোনের

মাচায় নির্বান্ধব বসে সমাহিত বিকালকে বাঁধের ওপারে ঝুপসি বনের ছায়ায় হারাতে দেখে দিব্যি সময়টা কাটিয়ে দেয়।

পাড়াঘরে তার 'লুকরান মরদ' বদনামটা অনেকদিন হয় চুকেবুকে গেছে। এমনিতেও, পুরোনো ওইসব প্রসঙ্গ নিয়ে ভাববারও আজ আর কারো অবকাশ নেই। সকলেই ব্যস্ত এবং মশগুল হয়ে আছে আপন-আপন সুখ-অসুবিধা ও চাহিদা নিয়ে।

সেদিন রঙলা হাঁটছিল খাদানের একটা টিলার ওপর দিয়ে। হঠাৎ পা পিছলে গেছে—ভাগ্য প্রসন্ন, পাহাড়ের ঠিক নিচেই তখন ছিল সুধ্না। সে তাকে প্রায় লুফে ধরে ফেলেছিল। নাহলে, হয়তো তুলো ছেঁচা হয়ে যেত মেয়েটা। আরেকদিন কুতনিকে বাঁচিয়েছে সাপের মুখ থেকে। ছোবল দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে অদূরে দাঁড়িয়ে কোচের এক খোঁচায় প্রাণীটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছিল। ইত্যকার অনেক ঘটনাতেই, ডুংরি-ডিহির অপবাপর মানুষের চাইতে কোন অংশেই সে দুবলা-পাত্‌লা নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, সকলে যখন হৈ-চৈ, কোলাহল নিযে মত্ত আছে, তার ভালো লাগে নিরিবিলি শব্দহীনতা। একলা নির্বান্ধব জীবন।

পিছনে অস্পষ্ট ধূসরাভা মারাং বুরু। তাইতে গাছ-গাছড়ার গভীর কালো ছায়া। এখান হতে ছাযা-ছাযা দৃষ্টি চলে, টিলার নিচে কল-লাজুকিনী দুহিনা। দুপাশে ডাইনে-বাঁয়ে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অসমতল কঙ্করময় গমের জমি। কিন্তু ফাঁকা, এবছর ফসল বোনা হয় নি।

সংসারে বাস করতে গেলে, অনেক জিনিসই মানুষকে ছাড়তে হয়। সে-ও ছেড়েছে। একলা ছটফটায়। ঝাঁ-ঝাঁ করে মাথার ভিতরে। অনভিপ্রেত বহু চিন্তা তখন কপালের রগে ঝুল ধরে ক্রমাগত পাক্ খেতে থাকে। কি করবে, কোথায় ছুটে যাবে সে এই মুহূর্তে? খাঁ-খাঁ মাঠ, বৃক্ষহীন। সেই অনাবাদি প্রান্তরে অচেনা পথিক পথ হাঁটছে নিদাঘ বেলায়। সে ক্লান্ত, রুগ্ন। পায়ের নিচের

মাটি অগ্নিময়, ঢেলা-ঢেলা। সেখানে হোঁচট খেতে হয়, পা পাতা যায় না। ওদিকে সমস্তদিন পাথুরে শক্ত ভুঁই কুপিয়ে অবসন্ন শরীর। গাঁইতির কোপ তো শুধু বন্ধ্যা মাটিতে পড়ে না, রেজা মজুরের নিত্য পাঁজর ভাঙে। লালকুঁয়োর বাসিন্দা অপরাপর অনেকের মতো সুধ্না‌ও সেইসময় ডাক পেড়ে অদৃষ্ট ভাঙার কথা বলে উঠতে পারলে যেন কিছু স্বস্তি পায়। জ্বরের ঘোরে রক্তাক্ত ড্যাবড্যাবা দেখায় তার চোখ। ঘাড়, গলা, কপাল জ্বলে যাচ্ছে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। জাদান দেশের চনমনে হাওয়ায় চিরকালের যে লঘুপদ বাজে।

মাস্থনের স্মৃতি পরবর্তীদিনে এমনভাবে কখনো তাকে বিপর্যস্ত করবে, এ বুঝি কোনদিন কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি সুধ্না। জীবিতাবস্থায় মাস্থন যেন তার কাঁধে প্রেতিনী হয়ে চেপে বসেছিল। জগদ্দল ভারী পাথরখানা গড়িয়ে নেমে গেছে, কিন্তু সে কি সত্যি আজ ভারমুক্ত? সুখী? যখন চিরদিনের তরে মাস্থন ছেড়ে গেছে এই সংসার, মায়ার হাট—স্থির নিশ্চিত, কখনো ইহজীবনে এই বিকিকিনির বাজারে আর ফিরে আসবে না। এই ভাবনার সূত্রে খাঁ-খাঁ রিক্ততায়, অসহায় বোধটা কেমন আরো চড়ে যায় সুধ্নার। অজানতে চোখ তখন ঝাপসা হয়ে ওঠে। রুদ্ধ বেদনায় বুক টনটন করে। একদা প্রিয়তমার শেষ স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ কিছু, সবলে ধরে রাখতে সাধ যায়। আর তাই তো, মৃত মাস্থনের জরাজীর্ণ বিছানার রাশি আজো ঘরের কোণে রাখা আছে। ওই নোংরা স্তূপ ইচ্ছে করেই ফেলে দেয় নি সুধ্না।

কি দারুণ ভয়টাই না সে সেদিন পেয়েছিল। মাস্থনের মাটি মজুর করে ফিরবার পথে, চকিত ঝটকায় যেন আলোড়িত হয়েছিল সমগ্র বাঁধের পাড়। শীর্ণ চেহারার উন্নত পয়োধরা এক মেয়ে তার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে থেকে শিস্ দিয়ে দিয়ে হাসছে। সুধ্না হোঁচট খেয়ে একেবারে পপাত ধরণীতল হয়েছে। অন্য কোন

মেয়ে নয়, হাই আয়ু গ, এ যে তারই মাস্থন। খিটখিট করে তখনো হাসতে থাকল সেই মেয়ে তার দিকে চেয়ে। আর সরু কাঠি কাঠি আঙুল বাড়িয়ে ধরতে আসছিল তার গলা। ঠিক যেভাবে একদিন সে খতম করে ফেলতে চেষ্টা করেছিল মাস্থনকে।

জাদান দেশে পুরোনো বাতাসের আনাগোনা চলেছে তখনো। বাঁধের কাজ শুরু হয় নি এমন ব্যাপক তোড়জোড়ে। ভাবলে আরো অনেক লজ্জার কাহিনী মনে পড়বে। অস্পষ্ট ধূসর কুয়াশার মেঘে রাত্রির সীসে রঙ আকাশ। দেওয়াল কাটা খুপরী জানালায় দাঁড়িয়ে পলকহীন তীব্র চোখ তার আরো তীব্র হতো। দেওয়ালের ওপারে তুহিনার টলটলে জলে ভাসমান রাজহংসীর তুধ-সাদা পাখায় অসংবৃত বেশবাসে একখানি মেয়েলী শরীর। পাগলী নদীর মতোই দেহে তার ছাপাছাপি স্বাস্থ্যের ডাক। কাপড়ের নিচে অথৈ পারাবার রক্ত মাংসের ডেলাধরা যৌবন সরোবরের নিটোল তুই ডুব কলসী।

আরো একটা কাণ্ড করত সুধ্না। উদ্ভট এক তাড়নায় ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ত বাইরে। জাদান সন্তানের শূন্য গেঁজেয় তুলকার ঝম-ঝমানি নেই। বাঁড়িয়া মহাজনদের কাল সেদিন। সে সময় একদিন এক ঝুমরী দেহ পশারিণীর দরজা থেকে এক বুক ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে। কত কাকুতি-মিনতি জানিয়েছিল সে, ভিতরে একটু ঢুকতে পাওয়ার জন্য। কোন ফল হয় নি, সেই কাতর আবেদন-নিবেদনে। সুধ্না এখন অবাক হয়ে অনুভব করে, এক আশ্চর্য ভানুমতীর খেলা, কারচুপে তারই ভিতর শুরু হয়েছে। লালকুঁয়োয় এত জিনিসের ভর থাকা সত্ত্বেও মাস্থনের মুখ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুকের দংশন জ্বালা কোথায় মিলিয়ে গিয়ে একেবারে সুস্থ সে। আজ যখন অঢেল ছড়াছড়ি মেয়ে-মানুষের, তখনই এক বিচিত্র বৈরাগ্যে এসবের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ হয় তার। মাস্থনের রোগাক্রান্ত সেই চেহারাটাই চোখে অনেক

ভালো ঠেকে। ভাঙচুর-মুখে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে, তবু কী অপার্থিব স্নেহের লেখা থাকত তাইতে। সুধ্না এখনকার সুখ বৈভব চায় না, পুরোনো দিনে ফিরে যেতে চায়। তার মনের এই চাওয়ার কোন অর্থ সে নিজে বুঝেও উঠতে পারে না। শহর সম্বন্ধে যতনের ব্যাখ্যান শুনলে তাই কখনো কখনো মুরুব্বির মতন তার মাথাতেও কেমন আজকাল খুন চেপে যায়। ইচ্ছে করে যতনটাকে তখন বাসলার এককোপে দু'ফালা করে দেয়। দারুণ মেয়ে-ন্যাওটা মানুষ সুধ্না, এ যেন একেবারে ভিন্ন মানুষে রূপান্তর লাভ করা। হৃদয়ানুভূতির সমগ্র বোধটাই আমূল পালটে গেছে।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এল না। অবশেষে দরজা খুলে বাইরে দাওয়ায় গিয়ে বসল। নির্মেঘ নীল আকাশ স্বচ্ছ জ্যোৎস্না ধারায় প্লাবিত। উঠোন-অঙ্গনও সেই জোৎস্নাধারায় যেন ধুয়ে যাচ্ছে। ঘরে আর ভালো লাগছিল না। এখন একটু বেশ আরাম বোধ হয়। মিষ্টি বাতাস আসছে দক্ষিণদিক থেকে। সে বসে বসে আকাশ-পাতাল নানা কথা ভাবতে থাকল। বাঁধরেকার সকলে যখন এগিয়ে চলার তুরীয় আনন্দে উচ্ছল, সুধ্নাই তখন বুঝি কেবল একলা, অতীতের স্মৃতি-সুখে আচ্ছন্ন। আগে আগে এমন দিনে সে ধেয়ে চলত ঝুমরী পট্টির দিকে। আজ তার আর ওসব ভালো লাগে না।

মাসুন!

এই মুহূর্তে সুধ্না আবার অতীতের প্রতিবিম্ব দেখল। সামনের গাছ, লতায়-পাতায় আয়না-টাঙানো। সেখানে ছবি ফুটে উঠল স্পষ্ট। গাছের পত্রগুচ্ছ লঘুছন্দে দুলছে। ঘুমের ঘোরে মাসুনও কতদিন অমনি বিস্রস্তবসনা হয়ে পড়ত। তার গায়ের ওপর উঠে এসে নেতিয়ে থাকত। কাপড়ের ঘেরাটোপে উদ্বেল দেহবল্গা। সুধ্না যেন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেইদিক পানে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে মাসুনের পরিত্যক্ত স্তূপীকৃত বিছানার পাশে

কয়েকমুহূর্ত দাঁড়ালো। মধুর অনুভূতিতে মন ভেসে যাচ্ছে। নিজেকে আর সংযত করতে না পেরে, সুধ্‌না অতঃপর সেই নোংরা বিছানার ওপরেই গড়িয়ে পড়ল আয়েস ভরে। মাসুনের গায়ের গন্ধ এখনও আঘ্রাণে পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরে নাকে টেনে সেই ঘ্রাণ স্নায়ুতে জড়ালো। আচ্ছন্ন তন্ময়তায় তখন বুঝি একবার কেঁদে উঠতেও ইচ্ছে করল তার। সে বিকৃত ভাঙা গলায় ডাকল, মাসুন, মাসুন। ক্রমে শীতল প্রশান্তিতে ঘুমের ক্রোড়ে বিলীন হয়ে আসতে থাকল তার লুপ্ত অনুভব। অবশেষে সেখানেই প্রবল ঘুমভারে লুটিয়ে পড়ল সে। তার ওষ্ঠ কেঁপে দুই গণ্ড প্লাবিত হয়ে গেল অশ্রুরেখায়।

বাঁধের মূল প্রাথমিক গঠনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল গত গ্রীষ্মেই। তারপর শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। তাও এখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষের আশা, আর বছর দু'য়েকের মধ্যেই সব সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর যেটুকু বাকী থাকবে, পাঁচশালা পরিকল্পনার অঙ্গীভূত বিভিন্ন শিল্প পত্তন। পাওয়ার হাউস, অন্যান্য কলকারখানা ইত্যাদি হবে।

ওদিকে খাল কাটা ও স্পীলওয়ে গেটের নির্মাণও অনেক এগিয়েছে। নদী আপন পথ ছেড়ে বাঁক নিয়ে খিলান তোলা দরজা পেরিয়ে বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি করবে। তারপর গুলি-সুতোর মতো হিলিবিলি খালে-নালায় চলার নতুন পথ নেবে। রঙ্গিণী ধারা ছাড়িয়ে যাবে দূর নিকটের মাঠে বাটে।

জাদান চিংড়ি-মাওকি হাসে খিলখিলিয়ে। মরদের পাশে দাঁড়িয়ে বহু ভাবনায় বিক্ষত ভীরু-ভীরু নরম বুক তাদের সবল। মাটির ঝোড়া তুলতে এসে মনের মানুষের দেহ-লগ্ন হয়ে আড়ে-আড়ে তাকায় আপন পরিপূর্ণ বুকের পানে। তাকায়, আর মুচকি-মুচকি

হাসে। হংস-সাদা পেখম শরীর, লাল পেড়ে খেটো কিচ্‌ড়িতে প্রমত্তা দেখায়।

কিন্তু হঠাৎ আবার গোল বাধল এক রাতে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেন বিস্ময়াহত অপলকে তাকিয়ে রইল সমস্ত গ্রামটা। সাধারণ রেজা মজুর থেকে বাবু পাড়ায় মালদার জন—বিহ্বল প্রত্যেকে। এ কি ব্যাপার গো! বেশ কাটছিল সব কিছু। এতদিন পর আবার সেই অশুভ শব্দটা জেগে উঠল দেখি! সঙ্গে নাকি গলার কাঁদুনি আছে। এবং আজ আর ক্ষণিক যতি দিয়ে নয়, বিরতি নেই। একটানা। এক দমে যেন সকল কিছু নিকেশ করে ফেলার দুর্বার প্রতিজ্ঞা তার অন্তরে। ক্রমে ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসছিল সকলের কাছেই। বহুদিন পরে-পরে এক-আধদিন জাদান গ্রাম লালকুঁয়ো যদি বা আকস্মিক সজাগ হতো কুঞ্জর পদে, সে এমন কিছু আমল দেবার মতো ঘটনা ছিল না। খোনা কণ্ঠের কান্না ইত্যাদি তো একেবারেই বন্ধ ছিল বলতে গেলে। সেইমতো যতখানি থাকলে চলে যায় সে-ক'জন রেখে, সদর থেকে আসা বাড়তি রিজার্ভ ফোর্স একদিন ফিরে গেছে। যদিও ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি, হদ্দ-হদিস পুরোপুরি বের করা যায় নি, তবু একেবারে মুসড়ে থাকার কারণটা অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে। কিনারা না হলেও, সহজ কথায় গোলযোগটা মিটে গিয়েছে। নদীর পাড় শান্ত, পাহাড় বনের উচ্ছল বাতাসে চিরন্তনী গাওনার সুর চড়েছে—এইতেই যথেষ্ট মেনেছিল সকলে। দিন গড়াচ্ছিল স্বাভাবিক মতো। আজ আবার এতদিন পর হঠাৎ সেই সুর কেটে বন্যা উঠল! লালমাটির পাথুরে পৃথিবী মুখর।

শহরের ছোঁয়াচ আজো বুঝি পুরোনো সকল সংস্কারকে একে-বারে নখে টিপে মারতে পারে নি। বহু ভাবনাই একযোগে তাই চিত্ত চাঞ্চল্য জাগায়। নানাবিধ যুক্তির বানে একদা এই বনতলীর আকাশমাটি হোলি খেলেছিল।—তুলকা না থাকলে ধরম বাঁচে না।

পেটের ক্ষুধা বয়ে কতক্ষণ ধরম আঁকড়ে বসে থাকা যায়? সুতরাং রাখের ইজ্জত রক্ষার ভুর্ভাবনাটা কোন কাজের কথা নয়। কুঁড়ি ইলকার চটুল হাসির সঙ্গে সাগুি জোয়ান ছোকরার হাসি মিশে তুহিনার সাধু রঙ জল, নীলবান ভূমির বোবা বাতাস, খানখান হয়েছিল।

—এল্লা বঙ্গার রাগি গিড়বেক, মো কয়্যা দি। হুঁ, জরুর গিডবেক। ধরম-সরম ভুলে জাদান মানওয়ার পাশ তুলকা বড় হল গ? রাখের ইজ্জত-সম্মান কিছু লয়, অ্যাঁ? তুনিয়ায় সবসে বড়া চিজ হলো কিনা, রূপেয়া আর চাঁদি। হাই শালা। মুরুব্বি চেঁচাত।

আজ ঘুম-ছুট মাঝ রাতে সেইসব কথা ভেবে ত্রস্ত হয় গাঁওইয়া সন্তান। যে কথা বিশেষ করেই সহস্র অনুনয়-বিনয়ে সেদিন নিষেধ করেছিল মুরুব্বি, কার্যক্ষেত্রে তারা ঠিক তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। জাতি-সমাজের কোন নির্দেশ আজ আর কেউ মেনে চলে না। পঞ্চায়েত-গাঁ আসরের তোয়াক্কা নেই। সর্বোপরি, আপন মায়ের বক্ষে লাঙলী বেড় বসাচ্ছে। আাণ্ডিয়ার বন্ধন। অতএব নিশ্চিত, পাপ তাদের ছাড়বে না কোনমতেই। দেবতার রোষ ভাবও। বরং এ বুঝি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। তারপর মুরুব্বির কথা যদি আদৌ সত্য হয়, তাহলে তো তাদের পুরো জাতটাই একদিন হারিয়ে যাবে এই বসুমতীর বুক থেকে। ল্যাটা পরিষ্কার হবে।

শব্দ হচ্ছেঃ ঝপ্ ঝপাস ঝপ্। ঝাপুৎ। ঢালু পাড় বেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ। সঙ্গে নাকি সুর।—আঁ-আঁ-আঁ…। যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে কেউ।

সকলের ভীত দৌড়-ঝাঁপে সারা অরণ্যরাজ্য জুড়ে এক মহোৎসব শুরু হয় যেন। বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কোলাহল। যাদের মনে এখনো কিছুটা সংস্কার অবশেষ আছে, দানো-সাহেব, দেওতা পুরকনের নাম স্মরণ করতে থাকে। কেউ ভয় পেয়ে ডাকিনী-

যোগিনী মায়ার কথা ভাবছে। আবার তাদের ভ্রম সংশোধন করছে আরেকদল। তারা আবার পরের দলের দ্বারা সংশোধিত হচ্ছে।

ব্যস্ত-ব্যাকুল আনাগোনা ও হুড়োহুড়িতে বাবুপাড়াও কম আলোড়িত হয় না। পিল্লাই সাহেব, মিঃ কুলকার্ণী এবং বাঁধরেকার অন্যান্য কর্মচারীর দল—সকলে এক জায়গায় সমবেত হয়ে নানা প্রসঙ্গ ভাবতে থাকল। বাস্তবিক কি হতে পারে? ওদিকে পুলিসদল আসছে, যাচ্ছে। ঘনঘন বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে আর নানা নির্দেশ নিচ্ছে। পিল্লাই সাহেব স্বয়ং আজ অভিযানের হাল ধরেছেন। তিনি আগে আগে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন বাঁধের রাস্তার মুখে। বাঁ পাশ থেকে আরেকটা পথ সোজা রেজা মহল্লার দিক হতে এসে মিশেছে। পিছনে বাওয়া-পট্টি। পট্টির পথ নেমে গেছে ক্রমশ একটা টিলার পাক্‌দণ্ডী ঘুরে। সামনে এবার নদী দেখা যাচ্ছে। দল থামল। পিল্লাই সাহেব সবাইকে এখান থেকেই নজর চালাতে বললেন। তীক্ষ্ণ নজরে ঝুঁকে পড়ল সকলে। বাওয়া পট্টির দলটা আবার সেই সময় সেখানে পৌঁছুল। দল ভারী হতে, সকলে ব্যগ্র কৌতূহলে আরো সচকিত হল। কিন্তু কারোরই যে শেষ পর্যন্ত আর সাহস হয় না এগিয়ে গিয়ে দেখতে। বাস্তবে আদৌ নদীর পাড় ভাঙছে কিনা? নাকি, যা সন্দেহ ঘনিয়েছে প্রত্যেকের মনে, বড় বড় পাথরের চাঙড় কেউ পাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে দিচ্ছে নদীর জলে। কিন্তু কে করতে পারে ওই কাণ্ডখানা—দেহ-ধারী কেউ, অথবা অশরীরী কোন দুষ্ট আত্মা?

এমন সময় ম্যানেজার সাহেব সেখানে এসে পৌঁছুল। শহরে গিয়েছিল কাজে, প্রোজেক্ট এরিয়ায় ঢুকিতেই লালজীয়ুর সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। সর্দারজীও সম্ভবত বেদম ভয় পেয়ে থাকবে, চলেছিল নিজের আস্তানার দিকে। ম্যানেজার সাহেবের জীপ দেখেই হাত নেড়ে থামিয়ে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। শুনে কালক্ষেপ নয়. লালজীয়ুরকে পিছনের

সিটে তুলে নিয়ে সাহেব তারপর সোজা চলে এসেছে এখানে। অবশেষে গাড়ি বেঁধে সপাসপ্ উঠে এসে দাঁড়াল সমবেত জনতার মধ্যে। ধমকে উঠল, এত হল্লা কিসের? হোয়াট্ ননসেন্স? পরে, যেপাশে কেবলমাত্র তরুণ ছেলেদের দলটা দানা বেঁধেছে, সেদিকে তাকিয়ে বললে, আরে ছো, তোরাও এখানে মাদীদের মতো দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিস? এতক্ষণেও এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলি না, আসল ব্যাপারখানা কি? সব ক'টাকে ধরে ধরে আলাদা করে জুতোতে হয়। নিজেদের আবার জোয়ান মরদ বলে বুক ঠোকার বহর আছে। অল্ বাস্টার্ড।

আই, আই! মানজার সাহেব তোদের ওই কি কথা বলল। সকলের পিঠে যেন একসঙ্গে চাবুকের ঘা পড়ে।

সাহেব আবার বললে, মুখেই শুধু হেন্ করেঙ্গা তেন্ করেঙ্গা। কেবল বখোয়াজি। ঢেঁকি অবতার। ইচ্ছে করছে, সব শালার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিই। স্কাউণ্ড্রেলস্। রাগ, উত্তেজনায় সাহেব ফুলতে থাকল বাতাস ভরা ট্যাপা মাছের মতন।

বড় কঠিন প্রদেশে আঘাত হেনেছে সাহেব তাদের। বাওয়া পুরুষের মুখের ওপরই কিনা বলে দিল, তারা মরদ নয়। তদুপরি, এতগুলো ভিন্-পারসী মানওয়ার উপস্থিতিতে! যে তিন কথা সইতে পারে না বাওয়া জোয়ান, তার অন্যতম এই বাক্যটি। তারা সমস্বরে হাঁকরে উঠল, হেই সাহাব, উ কি বাত্ বুলিস গ। মোরা বাওয়া খিজামের মানওয়া বটিস। উটো বুরা বাতাসের কাণ্ড-কারখানা, তাই যোঁছ লয় গ। লচেৎ—

সাহেব ক্ষিপ্ত হুংকারে ধমকে উঠল, চোপ রও, শালা কুত্তার জাত। তোদের একেকটাকে ওই জলে ডুবিয়ে মারা উচিত। খচা মেজাজে সাহেব আরো দাবড়ানি লাগালো, হাগা নেই, পটপটি সার। বাতেলা খালি। ব্লাডি সোয়াইন।

আবার, আবার!

দল এবারে সমস্বরে বলে উঠল, হুঁ, মোরা মরদ, হুঁ। সাহাব, চাস ত তুয়ারে দেখায়ে দিই গ।

সাহেব তাদের ওই কথায় যেন কর্ণপাতও করলে না। যেমন বলছিল, বলে চলল। অবশেষে এমন এক শাসানোর কথা বললে, যা শুনলে জাদান মানুষের বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অনেক হারাবার পর ওই খোঁটা গিয়ে একেবারে মরমে বেঁধে। সাহেব বললে, কাল থেকেই সব শালা ছাঁটাই হ'লি। জরুরত হলে আমরা ফির্ বাহারসে মজুর নিয়ে আসব। তবু আমাদের মুর্দা-মরদের দরকার নেই।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল, এমন কি পুলিসের সেই দলটা পর্যন্ত বাঁধের ওপরে ওই অশুভ শব্দটার পাত্তা খুঁজতে এখনো যায় নি। ভয়ে তারা ভাগে-ভাগে জটলা বেঁধে একটা নির্জন ঝোপ মতো স্থানে দাঁড়িয়ে বুঝি কাঁপছিল। দল এগুতেই, কাঁদো-কাঁদো মুখে দৌড়ে এসে সকলের সঙ্গে মিশলো। কয়েকজন ছুটে গিয়ে পিল্লাই সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। পিল্লাই সাহেব হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। তারা কেঁদে চোখ ভাসালো।

এবার আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সন্দীপ রায়। পুলিসদেরও অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করল, হাঁকে ডাকে মর্দানা, এদিকে দেখি আওরতের চেয়েও অধম। ধ্যুস্, শুয়োরের পাল।

তারা কাতর নিবেদনে হাত কচলালো।

সাহেব এবার একলাই সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।— ঠিক আছে, কাউকে লাগবে না। আমি একাই ধরতে পারব, কে ওই নরাধমটা? আর ধরতে পারলে, একেবারে ওর মুড়ো চিবিয়ে শেষ করব।

অন্যান্য রেজামজুর ও পুলিসদলের সঙ্গে অপমানে ক্ষতবিক্ষত হয় বাওয়া মানুষেরা। এমনিতেই তারা হাড়ে চটা মান্জার সাহেবের ওপরে। মানুষটা তাদের বাওসী-মাওকি, কুঁড়ি-ইলকাদের

লোভের ইশারা দেখিয়ে নষ্ট করে। যা কিনা, তাদের সমাজের সঙ্গে দুশমনী বৃত্তি করারই নামান্তর। তারপর কাল সকাল থেকে বেড় বাঁধের নোকরী ছুট্ হয়ে গেলে, তাদের জাদান ঘরের পয়সা এসে লুটে নিয়ে যাবে ভিন্‌পারসী রেজা মজুররা, আর তারা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতভোম চোখে দেখবে! বা কথা! তা বাদেও, তাদের জোয়ানীর ওপরে সন্দেহ পোষণ করা মন্তব্য করেছে সাহেব, তাই নিয়েও জ্বলুনি বাড়বার কারণ আছে।

টিক্রু বিকট কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, উ বাত্ মুখে লিস্ লাই গ, সাহাব।

কে আরেকজন যেন তার কথার ধরতা দিয়ে ভিড়ের মাঝে ওইসঙ্গে গলা ফাটাল, হুঁ, গ। মোদির চিনে লাই মালুম হছে। তাই উ বাত্ কায়্যাচিন গ, হাঁদে।

আরেকজন বুঝি চেঁচাল, হেই সামাল! ইলজাম সইব লাই কিছুতেই। দিখায়ে দিব লিকিন, মোদির কলিজাটো আজো বেহদ বরবাদ হয়্যা যায় লাই।

গতি এখন একটু কমলো মান্‌জার সাহেবের। পিছনে ফিরল। দেখল, সেদিনের ঘাড়-শক্ত-করা চেহারায় টিক্রু আজ আবার তার মুখোমুখি নেমে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং বোধহয় বিষাক্ত এক ঝলক হাসল সে। তার ঠোঁট দু' পাশে ভাগ হয়ে কান্‌কো পর্যন্ত ছুঁলো। অনেকদিন আগে একবার সন্দীপ রায়, তার এই রক্তচক্ষু দেখেই লয়লাকে ছেড়ে নেমে গিয়েছিল সমতলের পথে। আজ তার ওই হাসিতে কী সেদিনের কোন ইঙ্গিত আছে? দুর্দান্ত মানুষ সন্দীপ রায়ও ঈষৎ যেন ত্রস্ত হল।

টিক্রু সাহেবকে শুনিয়ে ফের বলল, মোরা রেজা মজদুর বটেক মান্‌জার সাহাব, কিন্তুন ইয়াদ রাখিস, বাওয়া জাইতের। মোদির ন্যে কুছ বুলবার আগে টুকুন ইয়াদ লিস গ। তারপর নিজের দলকে শুনোতেই যেন বাকি পৌরুষখানি ঝালালো, ইর হাড়মাটো তবে

বুঝায়ে দিতি চাই গ মোরা। তুয়াদির মত্ কী? তুয়ারা কী বুলবি গ?

দল সম্মিলিত উল্লাস জানালো, হঁ, হঁ। দিখাব মোদির সাহসটো?

সন্ধ্যারাত্রির নেশার খোয়ারী বুঝি এখনো কাটে নি বক্তা টিক্রুর। চোখ ঘোলা। পা টলছে থেকে থেকে। কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে। আর রোমাবৃত বুক ফুলে একেবারে কেটেই-বুরু। শক্ত পাহাড়। সেই মত্ত অবস্থাতেই তাল ঠুকে আবার গর্জন করল, তবে শালা মোরা বাওয়া হয়্যা জন্মালম কি করতি, অ্যাঁ? বুল্ কেনে গ তুয়ারা, কুছ্ গুনা ক'লাম লিকিন? বলেই কি বোধহয় ভাবল, হঠাৎ হি-হি করে হেসে উঠল; হেসে একেবারে কুটোপাটি হওয়ার যোগাড় হয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ধস ভাঙার প্রচণ্ড আরেকটা শব্দ হল। যেন একটা বিশালায়তন পাহাড়ই এবারে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে জলে ভেঙে পড়ল।

টিক্রু হাসি থামিয়ে বেবাক চুপ হয়ে যায়। মানুষ হঠাৎ ঘাবড়ে গেলে যেমন করে। তারপর যখন অনুধাবন করতে পারল পুরো ব্যাপারখানা, যদিবা আরো কিছু সময় কথায় নষ্ট হত—আর নিষ্কর্মা হয়ে কেউ দাঁড়াতে চাইল না। কিসের হাতছানি যেন দিগন্তের পটে শোভিত হয়েছে। নিজে যেমন প্রমত্ত আস্ফালনে নেচে উঠল, অন্যান্য সকলকেও উদ্বুদ্ধ করল একই তাড়সে দুলে উঠতে।—চল্, চল্, গ। দেখতি হবেক। বছপনে আয়ুবেটীর তোয়া পি লাই?

সারা বাঁধতল্লাট যেন পলকে এক ভিন্ন রূপ ধরল। যেন ব্যাপক এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে দূর দিগন্ত বিস্তৃত এই বনজঙ্গল-পাহাড়-নদী—হৈচৈ, চিৎকার উঠল আকাশ মাতিয়ে। ভিড় জমানো মানুষের পালের সবাই কিছু-না-কিছু বলতে চায়। কিন্তু

কে কার কথা শোনে? কারোর ধৈর্য নেই। সকলেই বক্তা। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে আর কোন কথা শোনা যায় না। একটা তুমুল সোরগোলে সকল কণ্ঠ ডুবে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গুমগুম একটা ধ্বনি কেবল হতে থাকল। আর ওইসঙ্গে ধস্ ভাঙার দিগন্ত-প্রত্যাগত-প্রতিধ্বনি।

আজকাল আর ডমরু প্রকাশ্য স্থানে বড় একটা আসে না। মনমরা হয়ে আড়ে আড়ে একলা ঘোরে। তার কথা যখন আর কেউ শুনবে না বৃথা বাক্য ব্যয় করতে চায় না। কাউকে শাপমন্যি, নিষেধ করা-করির মধ্যেও আর নেই। নিজের উদাস ভাবনা নিয়ে থাকে। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে কাউকে আর চেপে ধরে না আগের মতো। দিন যখন পালটেছে, ভালো করেই পাল্টাক। যার যেমন ইচ্ছে চলুক। এখন টিক্রু যেন মুরুব্বির সাবেক ভূমিকা নিয়েছে। সকলকে থামতে আবার বললে, হেই, চুপো যা, চুপো যা সব। তারপর গণ্ডগোল কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, সকলকে ডেকে মতলব সাফ্ করতে চাইল।—গোল কর‍্যা, সোময় নষ্ট কর‍্যা, ঝুটমুট্ ফয়দা কী? তারচিয়ি সব চল্ গ্যে দেখি, কে বটেক উ কামটো শানাচে। ঔর সাহাবরে ভী দিখাই মোরা বাওয়া আছিক কিনা, হুঁ। জোয়ানী ঔর তাগদ ভু-ই ধরি কিনা মোদির কলজায়।

আবার সমস্বরে ধ্বনিত বহু কণ্ঠের স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হয় না।

ভিড়ের মধ্যে হাসনাও কখন এসে ভিড়েছে। সকলে থামলে, সে গলা চড়িয়ে হেসে বলল, মোরা মরদ লই, তবে কি গ? হাই বাপ্।

হাসনার চাকরি নেই, তবু এসেছে।

জবাবটা সে নিজেই দিল। আবার চেঁচিয়ে বলে উঠল, নোকরী লাই ত কি হছে? বাওয়া মরদ হয়্যা, জাইতের অপমান হজম করব। ডাঙ্গরটি তবে হলাম কেনে গ, হাঁদে?

বাস্তবিক এ-তো রেজা মজুরের ব্যাপার নয়। কথাটা আজ

পাকেচক্রে দাঁড়িয়ে গেছে সমগ্র বাওয়া জাতিকে নিয়ে। কাজেই না এসে উপায় কোথায় ?

মেয়ের দলে এতক্ষণে যেন ঝট্‌তি ভিন্ন একটা সুর বয়ে কিছুটা অতিমাত্রায় নডন জাগলো। তারা আড়চোখে দেখল একবার লাছলীকে। লাছলী অবশ্য এইতে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ করল না। এসব তার গা সওয়া হয়ে গেছে।

হাসনাকে পেয়ে এখন টিক্রুও যেন কথঞ্চিৎ অতিরিক্ত সাহস পায়। মিথ্যা নয়, হাসনার মতো শক্ত খুঁটি পিছনে থাকলে অনায়াসে সাহসে ভর করে অনেক কাজে এগিয়ে যাওয়া যায়। অতঃপর দ্বিগুণ বিক্রমে নেচে কুঁদে লম্ফঝম্ফ দিয়ে সে হাসনার উক্তিই অনেকবার আবৃতি করে নিয়ে বলে উঠল, লিচ্চয়, ডাঙ্গরটি তবে হ'লম কেনে ? বাওয়া জাইতের হাডমাটো যদি লাই দিখাতে পারি। যদিও মাত্র কিছুদিন আগেই হাসনাকে পেটানো সম্পর্কে হাজরাবাবুর হয়েই ভিন্ন রকম সান্ত্বনা দিয়েছিল সে লাছলীকে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে সব কথা আর তার স্মরণে এল না। সে তেড়ে-ফুঁড়ে হল্লা করতে থাকল।

দল পিছনে একইমতো ধুয়া দিলে, হঁ, হঁ। দিখাব, হঁ।

ভিড ক্রমে জাঁকিয়ে উঠল একস্থানে। তারপর উঁচু-নিচু পথ-রেখা ধরে বাঁধের উদ্দেশ্যে সব একত্রে হাঁটা ধরল।

ওদিকে রাত্রির থমথমে বাতাস কাঁপিয়ে ক্ষণিক বিরতি দিয়ে দিয়ে সমানে হুংকার গজরাচ্ছে : ঝপ্, ঝপাৎ, ঝপ্। ধস ভাঙছে নদী। ঢিবি, বিরাট-বিরাট চাঁই পাথরে গড়া নদীর পাড় যেন খেলার টানে মুহূর্তে জলের কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। সেই মানুষদলের চোখ এখন মশালের দীপ্তি ছড়িয়ে জ্বলতে থাকল। তরল আগুন। রাশি রাশি আগুনের স্রোত।

তাবা ধেয়ে চলল।

নিচু আগাছার ঝোপ। তাই পেরিয়ে উঁচু ঢিবির মতো খানিকটা

কালকাসুন্দের জঙ্গল। জঙ্গল শেষে উৎরাই। নয়ানজুলির রাস্তা ডিঙিয়ে পাথুরে রাঙামাটির পায়ে চলা রাস্তা। রাস্তা সোজা চলে গেছে নদীর পাড়ে। কিছু পলাশ, শিমুল, পিয়াশাল গাছ ছড়ানো রয়েছে ইতস্তত। কিছু পাটকিলে রঙের বড় বড় পাথরের চাঙড় পড়ে আছে।

কিন্তু, ওকি! ধস্ ভাঙার শব্দ, অথচ ধস্ ভাঙছে না নদী। বড় বড় চাঁই পাথর অদৃশ্য কোন্ হ্যাঁচকা টানে যেন ছিট্‌কে গড়িয়ে যাচ্ছে সম্মুখে। তারপর ঝুপ্ করে গিয়ে এক সময় নদীতে ভেঙে পড়ছে। আর, তাইতেই পাক্ উঠছে জলে। ধস্ ভাঙার মতন শব্দ আছড়াচ্ছে চতুর্দিক মথিত করে। আসলে, নদীর খাড়ি কিনার যেমনকে তেমনি অক্ষত। কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই। আর কান্নাও বুঝি দৈবিক বা অশরীরী কোন দুষ্ট আত্মার নয়, কেউ যেন মানুষের কণ্ঠেই ফোঁপাচ্ছে। বিকল্প যে ভাবনা কখনো কখনো মনে হয়েছে, তবে কি তা-ই সত্যি হল! অপদেবতা কেউ নয়, বদমাইসি স্রেফ!

এবং আরো রহস্যের কথা—চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনুসন্ধানকারী দলটা, নিকটেই যেখানে ছোট এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের একটা বাহু গিয়ে পড়েছে নতুন গড়া বাঁধের ওপর, সেখানে টাল দেওয়া পাথরের স্তূপের ওপর কে একজন শীর্ণ-প্রায় উলঙ্গদেহ বৃদ্ধ উবু হয়ে বসে বড় বড় চাঁই পাথর এককেটা অল্প নড়িয়েই গড়িয়ে দিচ্ছে ঢালু পাড়ের গা দিয়ে। আর সেই পাথর শেষে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ছে জলের ঘূর্ণিতে। শব্দ হচ্ছে পাড় ভাঙার।

তবে এই সেই হার্মাদটা! এতদিন যে তাদের সমানে ভয়ে কাঁটা করে রেখেছিল।

ধস্ নামার শব্দ, দানো সাহেব, বঙ্গার ফোঁসানী—এ সব তাহলে সত্যি কিছু নয়। নয় ডাইন-জিনপরীর কান্না, অপদেওতা-দুষ্ট আত্মার ভর। চমকিত হল রেজা মানুষের পাল। আর সেই

মুহূর্তে বুঝি সেই মানুষটাও দেখতে পেল তাদের। একদণ্ড স্থির থেকে পরক্ষণে আঁতকে উঠল। তারপর ঘাড় তুলে চকিতে সিধে হয়ে দাঁড়াল। বাঁকা শরীর একেবারে ঋজু টান-টান দেখাল তার। একটা বিজাতীয় ঘৃণা বুঝি উপচে উঠল সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে।

কিন্তু সে বুঝি পলকের জন্যই। কোন দ্বিধা-ভাবনা নয়। ধরা দিলে তার চলবে না। এখনো অনেক কাজ বাকী আছে। সুতরাং পরক্ষণে পিছন ঘুরে বাজি জেতার দক্ষতায় উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটতে শুরু করে দিল। বাঁধের পাড় ঘেঁষে স্তূপ করা শ্যাওলা মাখা অজস্র চাঁই পাথর ছড়িয়ে আছে। অসম্ভব রকম এবড়ো-খেবড়ো কোনটা। কোনটা আবার ঝুলে আছে একেবারে জলের ওপরে। সেই অসমতল পাথুরে পথে, খাঁজে খাঁজে পা রেখে সে ভীত হরিণের মতো পড়ি-মরি দৌড়তে থাকল।

সন্দেহ অপনোদন হতে কারোরই আর বাকী নেই। তাহলে পলায়ন পর এই বুড়োরই কারসাজি সব কিছু। সে-ই পাড়ের ওপর থেকে চাঁই পাথর গড়িয়ে দিয়ে পাড় ভাঙার নকল শব্দে ভয় দেখাত সকলকে। এবং নিজে নাকে কেঁদে, খোনা কণ্ঠের কান্নার ভয়াবহতা সৃষ্টি করত। স্থির নিশ্চিত হয়ে হরবুক হাটুক মানওয়া পলকের তরে বুঝি কেমন উদাস হয়ে পড়ে। এতদিনে অনেক বিশ্বাসই তাদের ভেঙে গেছে। যেসব সংস্কার আগে মনে হতো অভ্রান্ত, বঙ্গা নির্দেশিত—কালের জলে, বাঁড়িয়া আগমনের পর থেকে সে' ব সংস্কারের অনেকখানি পালিশই দিনে দিনে রঙ চটে উঠে গেছে। তবু এতটা বুঝি ভাবাই যায় নি। ডাইন, অপদেওতা, এল্লাবঙ্গা, দানো সাহেব—কিছুই তবে সত্য নয়? অনেকখানিই যে সত্য নয়, তা অবশ্য প্রমাণিত হয়েছিল, বুরনের আদেশ মতো পূজো চড়িয়েও যখন কোন ফল লাভ হল না। বয়েসের মেয়েরা উপোস করেছিল, শুদ্ধাচারে যথাবিহিত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়েছিল, তথাপি কোন উল্লেখ্য ফল বর্তায় নি।

অন্যান্য আরো বহু ব্যাপারেই ক্রমেই তারা বিভিন্ন দেশজ আচার মুক্ত হয়ে পড়ছিল। সাণ্ডি জোয়ান বয়েসে এমনিতেই মানুষ কিছু বিদ্রোহী হয়, মুরুব্বি-পঞ্চায়েত মান্‌তে চায় না। সামাজিক কানুনের প্রতিও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারলে বাহাদুরী ভাবে। বর্তমান যুব-সমাজ হয়তো আরো কয়েক পদ বেশীই অগ্রসর হয়েছে। তবু এই মুহূর্তে উল্লাসের বদলে সকলে মন মরাই হল। শহরে থাকার মোহ অনেকেরই এখন কেটে গেছে, অথবা কাটবার মুখে। এ একটা বিচিত্র সন্ধিক্ষণ আদিম বাওয়া জাতের পক্ষে। একদিন তাদের কাছে শহরের আকর্ষণ দুর্নিবার মনে হয়েছিল। এই বিল-জঙ্গল ভরা গ্রাম, শহর হয়ে উঠবে শুনে অফুরন্ত ফুর্তি এসেছিল প্রাণে। তারপর অনেক ঘা খাবার পর, ক্রমে সেই মোহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ততোদিনে হারাবার যা হারিয়েছে গেছে। সনাতন গ্রাম লাল-কুঁয়োর রূপ যেমন আমূল বদলে গেছে, সেখানকার বাসিন্দা মানুষদের চরিত্রেরও হয়েছে আমূল পরিবর্তন। সমগ্র জীবন-বোধেরই একটা রূপান্তর ঘটে গেছে। এমন এক জায়গায় এসে তারা এখন পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর পিছনে ফেরা যায় না। এই সন্ধিক্ষণের মুখে পুরোনো বোধের জগৎটা সহসা শিকড় আল্‌গা হয়ে নড়ে উঠলে আরেক বিহ্বলতা এসে যায়। তাদের এখনকার দশাও বুঝি তেমনি হল। তারপরই উন্মনা ভাবটা কাটলে, সমান তালে বেগ বাড়ালো। শিকার আজ কোনমতেই হাতছাড়া হতে দেবে না, এই তাদের শপথ। সেই মুহূর্তে আবার ম্যানেজার সাহেবের শ্লেষাত্মক কণ্ঠ ধ্বনিত হল, ধর, ধর। তবে বুঝব, যথার্থ বাওয়া মরদের জিদ। মুখের বুকনিতেই কেবল ওস্তাদ নয়। অতএব পশ্চাৎধাবমান জনতার রোখ্‌টা কয়েক মাত্রা চড়ে গেল।

যারা তখনো অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার তারাও ছুটতে শুরু করে দিল। সে যেন এক মহাদৌড়ের খেলা। এই

ধরে ফেলে-ফেলে। বুড়োর তবু ক্লান্তি নেই। বড় বড় লাফে অনেকগুলো করে পাথর একসঙ্গে টপকে যাচ্ছে। কি অবাক্ কথা, তাগড়া জোয়ানের এই দলকে সমানে টেক্কা দিয়ে ঝটিকা গতিতে দৌড়চ্ছে বুড়ো।

মশালের আলো বিস্তীর্ণ বাঁধের পাড়ে ছড়িয়ে গেছে। অবশেষে এতক্ষণে ঘটলো বিপত্তিটা। সম্মুখে শোয়ানো পাথরখানার ওপরে পা পাততেই বুঝি স্থানচ্যুত হয়ে পিছলে গেল তার তলাকার ভিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা গড়িয়ে গিয়ে জলে পড়ল। সেই সঙ্গে দিশাহারা ছুটন্ত মানুষটাও বোধহয়। কারণ, পরমুহূর্তে সে আর ওপরে নেই। ভৌতিক কোন মন্ত্রে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। যদিও নিচের জল এখন ততো কূল ছাপা নয়। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভয়ংকরী পাগলা হাওয়ার মারটাও নেই। তবু শীত শুরুতেই রঙ্গিণী নদী ⁻'ন সকল ছলা-কলা ভুলেছে, এমনও ঠিক নয় আবার। ঝপ্ করে পাড় ভাঙারই আরেকটা আওয়াজ হল, তারপর সব নিথর। পিছনের ছুটে আসা মানুষের দল এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলের চো'খে মুখে অপার বিস্ময়ের আর পারাপার থাকে না। এই রহস্যময় অন্তর্ধানের কোন কূলকিনারা করা বুঝি কারো পক্ষে সম্ভব নয়। হতভম্ব হয়ে যায় প্রত্যেকে।

কেবল কয়েকজন সম্ভবত লহমার তরে দেখতে পায় চিত্রটা। তাদের গভীর নিঃশ্বাস রাত্রিব নৈঃশব্দ্যকে বিচিত্র ⌄ ƒ প্রাণস্পন্দন জোগাল। সে দৃশ্য কোনদিন⁴ বুঝি তারা ভুলতে পারবে না। অস্বচ্ছ আলোয় নদীর ঘুর্ণি দোলায় একটা উল্টে যাওয়া মানুষের শিরা কণ্টকিত শীর্ণ পায়ের কয়েক গুচ্ছ আঙুল ক্রমাগত ডুবতে ভাসতে দেখা গেল। মানুষটা যেন জলে পড়েই ঢেউয়ের ধাক্কায় একেবারে উল্টে গেছে। তারপর ঘুর্ণি দোলায় আটকে গিয়ে ঘুরছিল বন-বনিয়ে। মুহূর্ত মাত্র পরে আরেক ঢেউয়ের আচমকা টা'নে ঝট্‌তি কোথায় তলিয়ে গেল, কোন খবর নেই।

সেই দেখতে-পাওয়া মানুষ ক'জন ভড়কে ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে রইল। পরে বিশদভাবে বর্ণনা করল তাদের অভিজ্ঞতা। তখন দলগতভাবে মন্ত্রণা শুরু হল। কিন্তু কিছুতেই ভেবে কুলোতে পারে না কেউ, মানুষটা কে হতে পারে? কি বা তার লাভ হতো, দিনের পর দিন পট্টির চিরায়ত বাসিন্দা মানুষ আর ধাওড়ার রেজা মজুরদের অমনি করে ধস্ ভাঙার শব্দে ও নাকিসুরের কান্নায় ভয় দেখিয়ে? তারপর, এই যে বিরাট কাজ, একা আর ক'টা পাথর ফেলেই বা ঠেকিয়ে রাখতে পারত এ অগ্রগতি! স্বভাবতই পারেও নি। বাঁধের কাজ নিজের নিয়মে ঠিকই লক্ষ্য মতো এগিয়ে চলেছিল। মাঝ-মধ্যিখান থেকে সে কেবল একটা খ্যাপার মতন কাণ্ড করছিল।

পা ধুতে নেমে এসেছিল, যতন, ঝোলা আর ভোলগা। দৌড়ের টানে খেয়াল করে নি, কোন সময় ময়লা মাড়িয়ে ফেলেছে। খেয়াল হতে, দলছেড়ে তাদের এই নির্জনে আসা। বিহারী রেজাগুলোর জ্বালায় নদীর এদিকটায় আর আসবার উপায় নেই। থরে থরে সাজানো উপাচার। পাড়ের ওপরে তখনো আলোচনার উত্তাপ থামে নি। জোর গুঞ্জন চলেছে। তারা নামতে নামতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেস্থানে উবু হয়ে বসে ছায়াটা চাঁই পাথরগুলো গড়িয়ে দিচ্ছিল গাড়ার বুকে, তার নিকটেই একটা উঁচু খোঁটায় আটকানো একখানা ছিন্ন শতনড়ি জামা ঝুলছে। জামাটা বাতাস পেয়ে পতপতিয়ে পতাকার মতো উড়ছে একটানা। ওই সঙ্গে খোঁটার নিচে মস্ত একটা কিচ্ড়ি-ঘেঁটও দৃশ্যমান হল। পুঁটুলি। আরো কাছে যেতে নজর সাফ হল, পরনের বস্ত্র ওইখানি। এবং এবং—। আরে, এ যে মুরুব্বির জামা এখানা। তবে কি—

বাওয়া মানওয়া কোনদিন কোন অঙ্গাবরণ গায়ে পরে না। তবু শখ্ করে জামাটা বুঝি কিনেছিল সে একবার মুলিয়াবিবির মেলাতে। মস্ত একখানা সম্পত্তি ছিল যেন তার ওই জামাখানা।

সারাক্ষণ কাঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরতো, কখনো কাছ ছাড়া করার মধ্যে নেই। ওদিকে আবার কোনসময়ে গায়েও দিত না পাছে ছিঁড়ে যায়। তারপর একদিন কালের টানে জামায় ফাট ধরেছিল। ধূলিধূসর। শেষে সম্ভবত ছিঁড়তে শুরু করেছিল। তবু কোনদিনের তরে বস্তুটির প্রতি যত্নে কোন রকম উদাসীনতা প্রকাশ পায় নি। কাঁধের নিচে ভুল করেও সোহাগের জিনিসটি নামায় নি কখনো।

তাহলে সম্মুখের ধাবমান দিগম্বর লোকটি ছিল ডমরু? পাড়াঘরের মুরুব্বি? দিনরাত্রি যে চেঁচাত: পট্টির কেউ যিন বেড় বাঁধের নোকরী লাই ল্যে গ। বলেই আবার হুংকার ছাড়ত, হঁ, কয়্যা দিছি, উ নোকরী নিলে তুয়ারা কিস্তুন সব ধ্বংস হয়্যা যাবি গ। বঙ্গার রাগি গিড়বেক তুয়াদির উপর। গাছুয়া তুহিনা যে মোদির আয়ু। মা। সন্তান হয়্যা শেষ্যে মা'র বুকে ছিক্‌লি বাঁধব গ, হাঁদে। মা'র সরাম দাগা দিবি।

তাদের সহসা মনে হলো, জামাটাই যেন মৃত্যুকে হঠাৎ বড়ো বেশী করুণ করে তুলেছে। শান্ত দিগন্ত-পট দুলছে টিক্ টিক্। যেন তক্ষক ডাকছে একটানা। সঙ্গে ঝিঁঝি পোকার তুমুল হর্ষরোল। তারা পোকার ডাক, তক্ষকের আর্তনাদ শুনতে শুনতে আরো কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

সে সব মোটেই সুখের স্মৃতি নয়। ঝোলা আর ভোলগার বউকে যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ হেনস্তা করত প. .ল লোকটা। যতনের সঙ্গে মঙ্‌লির ভাব হয়েছে জেনে, ওকেও জোবা মতো ধরতে পারলে রেহাই দিত না। বুরনের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে যতন, ঝোলা আর ভোলগাই প্রথমে শহরের সুখ্যাতি গেয়েছিল। এই বনময় দেশ শহরে রূপান্তরিত হলে ভালো হবে বলেছিল। সেই থেকে মুরুব্বি চটোছল তাদের ওপরে। কিন্তু তারা সাগুি জোয়ান ছেলে, এঁটে ওঠা সহজ হবে না বলে, এ পথে বড় একটা আসত না। ফিকিরে ফিরত ওদের মায়জুদের .দি কব্‌লায় পাওয়া যায়।

আর, একবার কায়দা-মতো ধরতে পারলে, সত্যি একটা লঙ্কাকাণ্ড জমিয়ে তুলত। একবার তো উত্তেজনায় ঝোলার বউয়ের ওপরে রীতিমতো বলাৎকার করে বসেছিল। যদিও সেবারে অজুহাত ছিল, বুকের কাপড় নাকি ঠিক করে দেওয়া ছিল না মাংরির। মুরুব্বি খিঁচিয়ে উঠেছিল, হেই মাগী, নেশা চড়িয়েচিস লিকিন? তাই শুনে বুঝি আবার হেসেছিল বাওয়ানী মাওকি। পুরুষের ওই ধরনের রাগের অর্থ এই বন-বাসিন্দা মেয়েরা বোঝে অন্যরকম। তাই হাসিটা তার পানকৌড়ীর ডুবের মতো ভুচুক-ভুচুক লহর কেটেছিল। তার পরিণাম দাঁড়িয়েছিল, মুরুব্বি ধাঁ করে বড় এক খাবলা খামচি বসিয়ে দিয়েছিল মাংরির বুকের ওপরে।

সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, মুরুব্বি, ই কি লাহাজ গ। মেয়াছ্যালার বেইজ্জতি শেষ্যা তু করবি গ। হাই, ছি।

সে মুখিয়ে তার জবাব করেছিল, ই মাগীটো মেয়াছ্যালা লিকিন? শালী ছিনাল। ধাসা দিখায়ে তুলকা কামাই করে।

এসব আদৌ আনন্দদায়ক স্মৃতি নয়। তবু কি আশ্চর্য, সেই মানুষের জন্যই আজ অস্বাভাবিক রকম ব্যথা অনুভব হয় মনে। বার বার চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হয়ে আসছে। মানুষটা আগে এরকম ছিল না। তখন শ্রী-সৌন্দর্যে জাদান দেশের চেহারাও ছিল ভিন্ন প্রকার। তারপর বাঁড়িয়া আগমনের পর থেকেই ক্রমে ক্রমে তার ওই বিচিত্র চেহারা ও স্বভাব হয়েছিল। এবং বাঁধের কাজ যত এগিয়ে চলেছিল, ততোই লোকটার মাথা কেমন বিগড়ে যাচ্ছিল। সামনে যাকে পায়, তাকেই যেন চিবিয়ে খাবে। দৌড়ে যায়, পিটোবে ভাব নিয়ে।

পায়ে পায়ে নেমে এসে একেবারে জলের কিনারায় দাঁড়াল ঝোলা, ভোলগা আর যতন। জল চলকে চলকে এসে তাদের পায়ের স্পর্শ নিল। ওপরে জল কথঞ্চিৎ শান্ত, স্থির মনে হয়। কিন্তু অগাধ টানটা নিচে ঠিকই আছে। সর-সর করে সরে যাচ্ছে

পায়ের তলার বালি। একজন অদ্ভুত স্বভাবের মানুষের শেষ স্মৃতিচিহ্ন! জামাখানা ও পুঁটুলিটা তারা জলে পাতল। তারপর ছেড়ে দিতেই পলকে স্রোতের টানে তা নাগাল সীমার বাইরে বেরিয়ে গেল।

একদিন হাসনার চাকরি না-থাকা সম্পর্কে লাছলীকে নতুন দিন আগমনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল ঝোলা আর ভোলগা। সে সম্পর্কে খুব স্বাভাবিকভাবেই মুরুব্বির কথা উঠেছিল। তখন বুরনের কথার সূত্র ধরে তাকে আরো নস্যাৎ করা গিয়েছিল। আজ সেইদিনকার কথা স্মরণ করেও তাদের বক্ষে রিনিরিনি কম্পন বাজলো। আর যতন তো পুরো সাহেব মানুষ, মুরুব্বির কথা যে কতদিন কতভাবে নানাস্থানে কেটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। সে সব ঘটনার কথা এখন কেবলই মনে পড়ছে।

অতঃপর সম্মিলিত আলোচনায় ঠিক হল, অন্যে যেভাবে জানবে জানুক, তারা কেউ উপযাচক হয়ে মানুষটার পরিচয় কাউকে জানাবে না। এ কথা ঠিক, এ খবর অবশ্যই সকলের কাছে চিরদিন কিছু লুকোছাপা থাকবে না। মাওসী-গাঁয়েরই একজন মানুষ, যে জাদান সন্তানের কাঁধে বোঝা হয়ে চেপে বসেছিল, সহসা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে—এ নিশ্চয় হতে পারে না। সুতরাং অতি সহজেই রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। তবু এই মুহূর্তে তাদের মন সরলো না, ওই হতভাগ্য মানুষটার নাম রাষ্ট্র করে দিতে।

রাতের আকাশে নিঃশব্দ মেঘের ভেসে চলা শুধু। পথ পরিক্রমা। উদ্দাম ঠেলা বাতাসে গাছ-গাছালির ডালে-পাতায় মাথা কুটোকুটি চলছে। তুহিনার কলকণ্ঠের হাসিতে জলশঙ্খ বাজছে যেন। জীর্ণ ঢেউ এসে পাড়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ছে।

তারা তাকিয়ে রইল নদীর তমসাচ্ছন্ন অপর পাড়ের দিকে। জমাট ঘন-আঁধার বুকে চেপে নিয়ে নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল চুপ। জল ঝাপটার আওয়াজ বুড়ো ব্যাঙের ডাকের মতন নিরন্তর গোঙাচ্ছে।

বাইরের জগৎটা এই মুহূর্তে যেমন দারুণ নিঃসঙ্গ, নীলবান দেশের বাসিন্দাজনেরাও যেন তার শরিক।

না, কেউ তাদের দেখে নি। জামা ও পুঁটুলিটাও কেউ খেয়াল করে নি। ওপরের অনুসন্ধানকারী দল তখনো একই জায়গায় ভিড় জমিয়ে মানুষটার পরিচয় সম্পর্কে গুলজার করছে।

তারা আর মুখ খুলল না। ধীর পদক্ষেপে ওপরে উঠে ভিড়ের মধ্যে নিঃশব্দে মিশে গেল।

দারুণ অপদস্থ হল সেদিন যতন।

মনটা এমনিতেই ক'দিন হল ভালো নেই। ঘরের মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে, মন কারোরই ভালো থাকে না। মঙ্‌লি সেই যে সংবাদ বলল, পেটে বাচ্চা এসেছে তার—তারপর থেকে দিনে দিনে মর্কটের মতো ছিরি হচ্ছে। পেট যতো ফুলছে, বাড়ছে, ততোই যেন কুৎসিত আর শীর্ণকায়া হচ্ছে তার শরীর। চোখ মুখের উছল-চপল রঙ মরে বিষণ্ণ আর্ত দেখায় সর্বক্ষণ।

হাটের পথে দাবাখানা হয়েছে একটা। দাবাখানার পানীদার ছোকরা রামঅবতারের সঙ্গে যতনের খুব দোস্তী। দু'জনে একসঙ্গে বসে বিড়ি তামাক ফোঁকে, শোহুরে হেক্কারির গল্প করে। মাঝে মাঝে ওপারের গঞ্জে যাত্রা সিনেমাও দেখতে যায়। মালিক শিউ-পূজনের অবর্তমানে কখনো-সখনো 'কণ্টারে' (কাউণ্টার) বসে রাম অবতার। তাইতে কিছু কিছু ওষুধের নামধাম, গুণাগুণ জেনে ফেলেছে। সে যতনকে এক বোতল তেলতেলে হলুদ রঙের পদার্থ দিয়ে বলেছিল, দামী ওষুধ। এই এক পাঁইট খেলেই মঙ্‌লি একেবারে নধর খাসীর চেহারা ধরবে। ঝোঁকের মাথায় দু'রোজ কাজের সমুদয় মজুরী দিয়ে ওই এক বোতল মাঙ্গা দাওয়াই কিনে ফেলেছিল যতন। তারপর মঙ্‌লিকে রোজ চামচে মেপে মেপে

খাইয়েছে। কিন্তু মঙ্লির অসুস্থতা আদৌ ভালো হয় না। বরং দিনকে দিন কেমন যেন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। ক্রমেই শীর্ণ পাকাঠির মতো হয়ে যাচ্ছে হাত-পা-মুখ।

নানা ভাবনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যতন 'তাফিন' সারতে বাবু মহল্লায় মেওয়ালালের দোকানে গিয়েছিল। যেমন প্রায়ই যায়। মেওয়ালালের দোকানের সামনে চওড়া বেঞ্চ পাতা থাকে। যতন তাইতে পা ঝুলিয়ে বসে বেগুনি ফুলুরী খায়। বান্‌রুটি চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে গলাধঃকরণ করে। সেদিন যতন নিয়েছিল আবার প্লেট ভরে ঘুগ্‌নীদানা। চামচে করে একটু একটু করে মুখে তুলছিল সেই ঝোলের ক্বাথ, আর সঙ্গে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরছিল। এমন সময় কাপ্তেনবাবু ট্রাক্টর অপারেটর জিৎ সিং কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সেখানে এল।

ঝড়ুকে দেখলেই যেমন রাগ হয় যতনের, যতনকে দেখলেই কেমন যেন খেপে যায় জিৎ সিং পাজীটা। বলবে, এহে! রস দেখো লালার। গায়ে ডোরা টেনে বলদ থেকে শের হতে চায়। উজবুক কাঁহিকা।

ডিউটির মধ্যে খিদে পেয়ে গেলে মাঝে মাঝে ঝিনুক দাসের দোকানেও যায় যতন। বাঁধের ঢাল মুখে ছোট ঝোপড়ি। খান কয়েক বেঞ্চ পাতা। একদিন খেয়াল করে নি, ঝিনুক দাসের হাত থেকে আলুর দমের প্লেট নিতে গিযে খানিকটা ঝোল চলকে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। মাটিতেই পড়েছিল সবটা, কারো গায়ে কণামাত্র ছিটে যায় নি—তবু চড়াৎ করে চটে উঠেছিল জিৎ সিং। পাশের টেবিলে বসে সে বুঝি তেলেভাজা জাতীয় কিছু খাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখেছিল নিজের পরিহিত প্যাণ্টের দিকে। তারপর কোন দাগ নেই দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েই যেন মুখ ওপরে তুলে খিঁচিয়ে উঠেছিল, ওই সঙ্গে ধাওয়া করে এসেছে: এই, কে রে শালা তুই গাড়োল। যদি ওই ঝোল গায়ে পড়ত! তোকে বিক্রি করলেও এর একটার দাম হবে? বলে প্যাণ্টটা আবার দেখেছিল।

অপরাপর খদ্দেররা হেসেছিল, হি হি।

যতনের মাথায় কি ভুত চেপেছিল, বলেছে, আহা, গায়ে তো আর পড়ে নি। পড়লে কথা ছিল।

সহসা দারুণ খিঁচড়ে গিয়েছিল জিৎ সিংয়ের মেজাজ।—আবার বুক্‌নি হচ্ছে। তর্ক, শালা!

এমন সময় কে একজন রসের যোগান দিতে টিপ্পনি কাটলে, করবে না তর্ক! ও যে রাজা মারাং বাবু।

জিৎ সিং ভেংচেছে, দেব যেদিন রাজা মশাইয়ের পাছা দিয়ে সত্যিকারের বাবুগিরিখানা পুরে, সেদিন বুঝবে এর জ্বলুনি কত।

জনতা আবার হাসতেই যতন খাবারের প্লেট ছেড়ে উঠে পড়েছিল। তারপর কি ভেবে আর দাঁড়ায় নি সেখানে। ঝলাৎ করে বারোটা নয়া ঝিনুক দাসের নাকের ওপর ফেলে দিয়ে খর খর পায়ে হাঁটা ধরেছিল বাঁধের রাস্তায়।

সেই যে কোন্ চোখে জিৎ সিং দেখলে যতনকে, এরপর থেকে সামনা-সামনি হলেই যেন তার ভালো মেজাজও টপাস করে বিগড়ে যায়। আর ভাবাভাবি নেই, আগে-পিছু চিন্তা কিছু নেই—অমনি পিছনে লাগতে শুরু করে দেয়। আর সর্বক্ষণই লোকটা মেলা চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে চলাফেরা করে। একদিন যে ঈষৎ কষে দেবে, তার উপায় নেই।

দোকানে ঢুকেই তাকে দেখতে পেয়ে যেন আহ্লাদে আটখানা হল জিৎ সিং। বদখদ্ রকমের শব্দ করে প্রথমেই প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুলল।

যতন দেখল তার দিকে। জিৎ সিং মোম মারা গোঁফে মোচড় তুলে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসল সেবারে। তারপর সকলকে সে যেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলে, বলে উঠল, ক্যায়া লালা! মুরগ্ মসল্লম খাতা হ্যায় ক্যায়া? হম্‌কো খানা ত নহী খাতা তু, বাদশাহী

খানা লেতা। বলে তারপর ছড়া কাটল, মায়ের নাম চুট্কী বাঁদী, ছেলের নাম সুলতান খাঁ।

যতন অপ্রস্তুত হল। দল মহাফুর্তিতে অট্টহাসি হাসল।

জিৎ সিং এবার ঠাস করে তার মাথায় একটা চাঁটি মারল। মুখে বলল, এর নাম হ্যায় উড়ন দোসা। বিলাতি চাঁটি। এ ভি বড়িয়া খানা। হেসে শুধোলো, কহো, সাচ নেহী ?

দল আবার হেসে গড়াগড়ি খাওয়ার মতন হল।

জিৎ সিং তার বগলের নিচে হাত চালিয়ে দিয়ে কাতুকুতু দিল।—বলো, এ ক্যায়সা ? জিজ্ঞাসা করল।

দল একইমতো হেসে কুটোপাটি হয়।

যতন যতো ছটফট করে, জিৎ সিং ততোই আরো মজা অনুভব করে। তার চুলের বাব্‌রি ধরে টান দিল। আরেক প্রস্থ কাতুকুতু দিলে; শেষে প্যাণ্ট্ ধরে টানামানি শুরু করে দিল, বোতাম আল্‌গা করে কষির বাঁধন খুলে দেবে।

ছোটখাট একটা ভিড় জমে ওঠে। সকলেই যেন বাঁদর নাচানো খেলা দেখছে। জিৎ সিংয়ের দল তো হেসে একবারে মাটি পাবার যোগাড়। যতন অনেক চেনা মুখের দিকে তাকাল। মেওয়ালালের এই খাবারের দোকানেই অনেকদিন ওই সব বাবুদের পাশে বসে সে খেয়েছে। ওকেও তারা নিশ্চয় চেনে। কিন্তু কৌতুক ছাড়া এখন আর অন্য কোন স্নেহের ছায়া ফুটে নেই কারো চোখে। তাই নিষেধ করার পরিবর্তে হাসছে প্রত্যেকেই।

যতন মেওয়ালালের দিকে তাকাল। দোকানের মালিক হিসাবে সে অন্ততঃ কিছু বলবে, প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু চারা গোঁফ নিয়ে বিকশিত দন্তে সে-ও হাসছে দেখা গেল। যতনের হঠাৎ বাবু-মহল্লার ওপরে ভক্তি চটে গেল। কেমন পাড়া এই বাবু-মহল্লা ? কই তাদের পট্টিতে তো কোন মানুষকে নিয়ে এমন ধারা রসিকতা করার রেওয়াজ নেই। কত অচেনা ভিন্ পারসী মানুষই তো আজ

তাদের জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা পড়ে গেছে। কেউ আর ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। অথচ শহুরে রুচিতে যারা তাদের চেয়ে অনেক উন্নত বলে জাদান দেশের মানুষ জানে, তাদের মধ্যেই কিনা রয়েছে আদিম বন্য প্রবৃত্তি। অকারণে একজন মানুষকে লাঞ্ছিত করার মহতী বাসনা।

তবে বাওয়া জোয়ান সহজে দমবার পাত্র নয়। ঘুগ্‌নীর প্লেট আগ্‌লে খোঁটা মেরে বসে রইল।

কিন্তু জিৎ সিং যেন ধরে ফেলেছে তার উদ্দেশ্যটা। ক্রোধে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। তবে শেষ পর্যন্ত সহজ রসিকতার পথটাই সে বেছে নিল। যেভাবে শিশুকে আদর করে মা, জিৎ সিং আঙুলের ডগা দিয়ে তার থুত্‌নি নেড়ে দিল। তারপর জিহ্বায় চুকচুক শব্দ তুলে বললে, লালাজী কি তখৎ ছাড়বেন না, তো হাম্ লোক বৈঠেঙ্গে ক্যায়সে? হায় রাম।

দল হাসল। যতন তারপরও ওঠে না।

এবার সকলের কাছেই ব্যাপারটা স্পষ্ট। যতনও কি ভেবে বড় বড় শ্বাস নিয়ে ফুঁসতে থাকল। তখন আর বুঝি ভরসা হয় না মেওয়ালালেরই। সে তড়িঘড়ি এগিয়ে এল।—এই, এই শালা, ওঠ্ জলদি। বলে ঘুগ্‌নীর প্লেটটা টপাস করে হাতে উঠিয়ে নিল।—শালা, কোকাই কার্তিক। বাবু বনবার শখ্। বলে আবার দূর দূর করে উঠল, যা-যা। ভাগ্ হিঁয়াসে।

যতন ঘাড় ফেরাল। এবার চাঁদা করে চাঁটা পড়ল তার মাথায়। জিৎ সিং ভুম করে একটা কিল বসাল তার পিঠে। আবার ছড়া কাটল, যার বাপ খায় নি কোনদিন আমড়া ভাতে, তার ছেলের আবার লণ্ঠন হাতে।

যতন তারপরও যখন ওঠে না, সকলে ধাক্কে ধাক্কে তাকে তুলে দিল।—ফের এ পথ মাড়াবি তো গায়ের চামড়া তুলে নেব। খটাসটা।

বাওয়া পুরুষ আজ নিজের দেশেই পরবাসী। যতন হঠাৎ কেমন যেন একটা নিরাবলম্ব অবস্থা অনুভব করল। আজ কার কাছে সে গিয়ে দাঁড়াবে এর প্রতিকার চেয়ে? কে তার হয়ে ধেয়ে আসবে এর উচিত শিক্ষা দেবার জন্য? না, কেউই সম্ভবতঃ আসবে না। মানুষজন কম নেই পট্টিতে। সকলেই আছে। তবু আজ সাথী হিসাবে কাউকেই পাওয়া যাবে না, সুনিশ্চিত কথা। শহুরে আদপ-কায়দা রপ্ত করে সে আবার হয়ে গিয়েছিল প্রবলভাবে ভিন্‌পারসী। তার তরফেই কারো সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষা করার আগ্রহ হয় নি। সুতরাং আজ কারো অনুগ্রহের আশায় গিয়ে দাঁড়ানোর কোন অর্থ হয় না। এ বাদেও, জাদান দেশের সেই রেওয়াজ আর নেই। আজ কেউ কারো জন্যে কোন দরদ অনুভব করে না। একের অপমান আর অন্যের গায়ে লাগে না। যেমন অরণ্যানী, রাঙা দুন্দিক্ষণাতেও অন্য গাওনা, অন্য সুর।

যতন উঠে দাঁড়াল একটা শিলাখণ্ডের ওপরে। জায়গাটা উঁচু মতো স্থান। নিচে রাস্তা, নদীর রেখা। অল্প দূরেই বাঁধের আরম্ভ। রাস্তা ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছে ওপর আকাশের উদ্দেশে। বাঁধ বাঁধার কাজ অনেকখানিই শেষ হয়ে গিয়েছে। যতন অপলকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ সে নিজেকে অদ্ভুত রকম নিঃসঙ্গ মনে করল। এই দেশটা যেন তার চেনা নয়, অদেখা কোন প্রেত-পুরী। এই ভরা দুপুর বেলাতেও গা তার ছমছমিয়ে উঠল। তারপর চোখ জ্বালা করে কান্না এল। এমন অপমান সে জীবনে আর কখনো হয় নি। কিন্তু তার জন্যেও এখন আর মনে কোন খেদ নেই। কান্না আসছে, শহর হয়ে তাদের আবাল্য পরিচিত গ্রামটা কবে কিভাবে যেন হারিয়ে গিয়েছে। শত চেষ্টাতেও যা আর এখন খুঁজে বের করবার কোন উপায় অবশেষ নেই। শহুরে হবার দুর্বার বাসনা নিয়ত তার মনকে উদ্বেল করে রাখত। দুরস্ত হবার জন্য মেহনতও সে কম করে নি। ইদানীং চলত ফিরত, সে যেন

একজন যথার্থই শহুরে মানুষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে-স্বপ্ন যে এমন এক আঘাতেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, এ আর কে ভাবতে পেরেছিল? ফুঙ্গি পঞ্চাননের কথা তার মনে পড়ল। লোকটাকে এতদিন নিতান্তই বাতুল মনে করে এসেছিল সে। পাগলের মতো অর্থহীন প্রলাপ বকে। সে একদিন বলেছিল, শহর হলো আরো বড় বন। এই বনে যেমন সাপ বাঘ আছে, শহরে আছে তেমনি মানুষ। দু'দলের দাঁতেই সমান বিষ। সেদিন ওই কথায় বিরক্ত হয়েছিল যতন। পঞ্চাননকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করেছিল। শহরের নেশা এতদিন মনকে এতই আবিষ্ট করে রেখেছিল যে ওখানকার সম্বন্ধে কোন অপমানকর উক্তি শুনলেই মাথায় অমনি চটাং করে খুন চড়ে যেত। এখন মনে হচ্ছে, কি গাধামিই না করেছে। যা কোনদিন হবার নয়, তার পিছনেই এতোবধি ছুটেছে হন্যে হয়ে। লেল্‌হা না হলে এমন হয়! সে নিজেকে সেতার বাচ্চা বলে গালি দিল। তারপর হাঁড়ুর বাচ্চা বলল। পরে ডাংরার বাচ্চা। বিংকিলের বাচ্চা। আরো, আরো অনেক গালি পাড়ল এক নিঃশ্বাসে। ঝিরঝিরে দাক্ষিণা বাতাস বইছে, গায়েও তার অনুভব মেলে। সে এক খাবলা থুতু ছুঁড়ে ফেলল। উল্‌টো বাতাসে সেই থুতুর ঝারি আবার ফিরে এসে ছিটিয়ে পড়ল তারই মুখে-নাকে, হাতে-বাহুতে। সে এবারে ঝুঁকে পড়ে নিচের শক্ত পাথুরে মাটিতে কপাল-মাথা কুটলো। ক্রমে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরল। তবু যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না যতন। জ্বলুনি বন্ধ হচ্ছে না বুকের। সে পরিত্রাহি মাথা ঠুকতেই থাকল।

রক্তে চিত্রিত মুখ-মাথা নিয়ে যতন এক সময় নেমে এল আবার সেই টিলার ওপর থেকে। অনেকদিন পর ফের নিজেকে সাবেক বাওয়া মরদ ভাবাতে, অদ্ভুত ভালো লাগছে। হ্যাঁ, পুরোপুরিই সে বাওয়া পুরুষ। আকাশ দেখস। আকাশে অনেক রঙ। অর্থাৎ, দিনের এখনো অনেক বাকী। আশ্চর্য, নিজেকে বাওয়া মরদ ভাবার

সঙ্গে, এই গ্রাম, মাঠ-প্রান্তরও অদ্ভুত সুন্দর ঠেকছে তার চোখে। ওই তো সেই গাম্বিল গাছটা। যার অন্ধকার তলায় পথ চলতি কতদিন থমকে দাঁড়িয়েছে সে। গাছটার কোটরে একটা বড় গো-সাপ থাকত, সেটাকে দেখলেই তার বুক দুরদুরিয়ে কেঁপে উঠত। জানোয়ারটার কথা মনে পড়ে খুবই উল্লসিত হল এখন যতন। এই গ্রাম, গাছ-গাছালির সঙ্গে নিবিড় একটা সম্পর্ক যেন অনুভব করল এই সুবাদে। বিস্তর ব্যাখ্যান গেয়েও কোনদিন শহরের প্রতি তেমন আকৃষ্ট করতে পারে নি মঙ্লিকে—যে কারণে তার ওপরে প্রচ্ছন্ন একটা ক্ষোভ যতনের থেকেই গিয়েছিল। এখন হঠাৎ ভাবল, ঘরে ফিরে মঙ্লিকে আজ দারুণ চমকে দেবে সে। আর কোন দিনও শহরে যাবে না, এই ঘোষণা শোনাবে।

যতন এরপর দ্রুত হাঁটা ধরল পট্টির পথে।

পাহাড়বনের টানা-পোড়েনে গাঁ-লালকুঁয়ো ক্রমেই কেমন বুঝি ঝিমিয়ে পড়েছে। বন কেটে ফর্সা হওয়াতে পাহাড়গুলো এখন বড় বেশী ন্যাডা ন্যাড়া দেখায়। বাতাস উঠলে শাখায় শাখায় জড়াজড়ি হয়ে সেই আরণ্যক ডাক আর শ্রুত হয় না। আগে ওই মুহূর্তে মনে হতো যেন হায়নারা চড়ুইভাতিতে মেতে উঠেছে। চতুর্দিক জুড়ে মার-মার কাট-কাট ধ্বনি বাজত। জঙ্গল নির্মূল করে পাহাড়গুলো এখন পাথর চালানের খাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেখানে সেইমতো অঢেল যান্ত্রিক আয়োজন। কিন্তু গাঁ লাল-কুঁয়োর এ হল আরেক রূপ। আদিম সজ্জায় কর্মব্যস্ততার তাড়া ছিল না বলেই ক্লান্তির ছাপও পড়ত না। এখন যত কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া, বিমর্ষতা ততই যেন প্রকট হয়ে উঠছে।

বর্ষায় ডুংরির জলে রক্তিম আস্বাদের স্পর্শ আঁকা হয়েছিল। শীত শুরুতে এখন তা আবার স্থির কাঁচ কাঁচ। অবশ্য এই দু'য়ের

সহজ সমঝোতা নিয়েই তুহিনার বহমান গতি। খুঁজলে হয়তো এমনি অসংখ্য সাদৃশ্য পাওয়া যাবে তার পাড়বাসী বাসিন্দা মানুষদের চরিত্রেও।

সেইমতো হাসনার সঙ্গে হাজরাবাবুর দাঙ্গার যে অশুভ বিভীষিকা তাদের সমগ্র সত্যবোধ ও জাতি সত্তাকে নাড়া দিয়েছিল, ক্ষয়িষ্ণু পরানে টাটানি উঠেছিল ঝমক-ঝমক—সেখানেও আর শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক জোয়ারের স্রোতটা লক্ষিত হল না। যেন তারা সাদাসিধে, নিয়ম-নির্দিষ্টভাবেই স্বীকার করে নিল ওই ফতোয়া। এই আজ হাল শের-ছাড় জাইত বাওয়া পুরুষের! ভাবা গিয়েছিল অন্তত হাসনা ছেড়ে কথা কইবে না। সাণ্ডি জোয়ান ছেলে, দল-বলও কিছু আছে। পাড়াঘরে খাতির মর্যাদাও মন্দ নয়। কিন্তু সে অবধি আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। যেন মিশির যা করেছে, উপযুক্ত কাজই করেছে। তবে এ-ও এক চারিত্রিক ধর্ম বাওয়া পুরুষের। বদ্‌লা তুলবার সময় বা আরো দুর্ধর্ষ কোন মতলব থাকলে ওপরে এমন স্থির অচঞ্চল থাকবে, মনে হবে যেন কোন প্লাবনই তাব ভিতরে নেই। আসলে ভিতরে-ভিতরে ঠিকই চলবে গুঞ্জনটা। একটু-একটু করে ফুঁসবে, ফুলবে। তারপর সহসা একদিন রুদ্র মূর্তি ধরে একটা মহাপ্লাবন ঘটিয়ে ছাড়বে। যেমন রঙ্গিণী নদী তুহিনার স্রোত। ওপরে স্থির বহমান গতি। নিচে অসংখ্য চোরা পাথরের মার আর কপট ঘূর্ণির টান। যেদিন পাড ভাসায়, ভালো করেই কর্মটা সমাধা করে। হাসনাও যেন সেই রকমই গুমরে গুমরে ফিরছে। মিশিরের সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হয়ে গেলে, উপ-যাচক হয়ে কথা বলতে যায়। মিশির 'হ্যাঁ-না' কোন সাড়া দেয় না। হাসনা তবু বলে। মিশির তাকে না দেখার ভাব করে থাকে। হাসনা রসিকতা করে। তারপরই হোহো করে গলা চড়িয়ে হাসে। হাসে আর দাঁত কিড়মিড় করে। অর্থাৎ যেন, যেদিন ফাটবে, ফাটার মতোই ফাটবে। এই অজ্ঞতা, তার কপটতা মাত্র।

হাসনা যদি তক্কে তক্কে ফিরছে হবে, মিশিরও একই ফিকিরে আছে। সেদিনের ওই সামান্য ধোলাই টুকুতে শরীরের ঝাল আদৌ মিটবার কথা নয়। মেটেও নি সত্যি। আরো এক প্রস্থ পাঞ্জা না লড়ে সে তাকে রেহাই দেবে না কোনমতেই। পিছন থেকে অতর্কিতে এসে জামার কলার চেপে ধরেছিল এতবড় সাহস। রেজাকুলি হয়ে হাজরাবাবুর গলায় হাত। তাও নীরবে নিভৃতে নয়, প্রকাশ্য দিনের আলোয় এবং এক বাওয়ানী যুবতীর সম্মুখে—যখন সে তাকে রাত-আশ্‌না হওয়ার জন্য ফুসলোচ্ছিল। এই অপমান কিছুতেই ভুলতে পারবে না মিশিরনাথ। হাসনাকে সেই বাবদে আরেকদিন বাগে পেতে চায়। কিন্তু ঠিকমতো কবলায় পাচ্ছে না। যাতায়াতের পথে অবশ্য প্রায়ই মুখোমুখি দেখা হয়। পাশে শ্রীকান্ত থাকলে গুরু-শিষ্যে চোখাচোখিও হয় একঝলক। কিন্তু না, এত লোকের মধ্যে হুট্ করে কিছু করাটা ঠিক হবে না। হাসনা হেসে বলে, নমস্তে, হাজরাসাব্। সেই বলায় ঠেস থাকে স্পষ্ট। মুচকি-মুচকি হাসেও তখন যেন ও।—সাহাবকা তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় ত?

আবার হয়তো কখনো বলে, দিমাগ ক্যায়সা হ্যায় সাহাবকা, আঁ?

মিশির গজরায়। কিন্তু জুতমতো অজুহাত পায় না কোন। অসুবিধা তো আর কিছু ছিল না, কিন্তু কথাটা ম্যানেজার সাহেবের কানে পৌঁছুলে, কিভাবে সে নেবে, কোন্‌দিকে গড়াবে তারপর এর ধারা, কে জানে! তার মর্জি তো সীতারামজীরও অজ্ঞাত।

আর ফস্ করে চাকু ভরাভরিটা কিছু বিপজ্জনক কাজ এই মুহূর্তে। নদীর খাড়ি পাড় ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সদরের সেই পুলিস দলের কিছু আজো ভাগে ভাগে মোতায়েন হয়ে পাহারা দিচ্ছে চারিদিকে। সকলের চোখের সামনে খুন-জখম হলে ব্যাপারটাকে কোনমতেই চাপা দেওয়া যাবে না। কিন্তু হাসনা কি এসবের কিছুই বোঝে না? অথবা, আদৌ বুঝতে চায় না। নাকি কোন কিছুকে তোয়াক্কা-পরোয়া না করার ঔদ্ধত্যেই সে ওইভাবে

চলা-ফেরা করে? মিশিরের সঙ্গে শ্লেষাত্মক ইয়ার্কি-ফাজলামি মারে। মারে আবার ঠা-ঠা করে হাসে।

হিংনানা তক্‌দীরে দাঃ। বাওয়া মানুষের অদৃষ্টের যে ফল।

যদিও আসল ঘটনাটা অনেকেরই প্রায় জানা, তবু কথাটা অচিরেই রেজাপট্টি থেকে বাওয়া পাড়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। হাজিরাবাবুকে নাকি বেমক্কা ঠেঙাতে গিয়েছিল হাসনা। অবশ্য সেখানে উলটে এক ঘুষিতে তার নিজের নাক-মুখ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে এবং বরখাস্ত হয়েছে সে। বেড় বাঁধের নোকরী আর তার নেই।

মিশিরকে পিটোতে যাবার রটনার রহস্য কারোই না-বোঝা থাকে নি। পাড়াঘরে খুবই লোকপ্রিয় ছেলে হাসনা, কিছু অনুরাগী সাঙাৎ-দোস্তও আছে। আর ঝাঁক বেঁধে বাওয়া জোয়ান একসঙ্গে খেপলে, জনা দশকের একটা বদমাইসের দল তো কোন্ ছাড়, সশস্ত্র একটা পুলিসদলও তোড়ের মুখে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। সুতরাং ওই ধরনের রটনার তাৎপর্য, হাসনাই যে প্রথম অন্যায় করেছে, সে-সংবাদখানা ফলাও করে-চাউর করা। যাতে এই নিয়ে পরে কোন সালিশি হলে, মিশির না অসুবিধায় পড়ে। হাজিরাবাবু সম্পর্কে রেজা মনের নেপথ্যেও একটা পাকা-পোক্ত ভীতি দেগে দেওয়া হয়।

তবে যত যাই হোক্, হাসনাকে অযথা মারধর এবং ওই মিথ্যা রটনা উপলক্ষ করে সমগ্র জাদান দেশ মথিত হয়ে তুমুল একটা হৈ-হট্টগোল ওঠবার কথা ছিল ঠিকই। অনেকের বক্ষেই এ আশংকার কালো মেঘ ঢিপিঢিপি বেজে উঠেছিল, তুহিনার বর্ষা-শেষের থির জল ফের বুঝি দুর্বার-ছন্দে ঘোলা হবে

বাবু মহল্লায় জল্পনা-কল্পনা চলেছে। রেজা পাট্টিতেও এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু কার্যকালে কিছুই হল না।

জলে-জলে ধাক্কা লেগে বুদ্বুদ ওঠে গাড়ায়, মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকির পর বিদ্যুতের পাখ্‌না ভাসে আকাশ-চাতালে—আবার একসময় আপনা হতেই সব কেমন থিতিয়ে পড়ে, কেউ ও-নিয়ে মাথা ঘামায় না। তেমনি ক'দিন এ-কাহিনীও মুখে মুখে বেশ ছড়ালো। শেষে একদিন কবে যেন ধুয়ে-ধায়ে সব সাফ্‌সুত্‌রো হয়ে গেল। সকল আলোচনার ইতি।

একটা অন্যায় অবিচার তাদেরই বস্তির প্রতিবেশী একজন মানুষের ওপর সংঘটিত হয়েছে, তবু পাড়াঘরের আজ কেউ এ নিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত কণ্ঠে এগিয়ে আসতে পারে না। এমন কি, সেদিন যারা ঝুমনির ডাকে অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রত্যক্ষ করেছিল হাজিরাবাবুর নৃশংসতার ছবিখানা—তারা পর্যন্ত অনুপস্থিত। তাদের সমাজ গেছে। পুরোনো রীতিনীতিও অনেক তামাদি হয়ে গেছে। বাধরেকার কাঁচা পয়সা, বাওয়া জীবনের প্রতিদিনকার জান-চিন জগৎটাকেই যেন বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে এখন বাওয়া পুরুষ-মেয়ে ঘর ছাড়ে। সারাটা দিন গুজরান হয় পথে প্রান্তরে। তারপর রাত্রি আসে। ভৌতিক পদধ্বনি ওঠে রাঙামাটির প্রান্তর দলিত করে। তখন শুরু হয়, অভিসার পর্ব। ব্যাপক দেহের লেনদেন চলে অর্থের বিনিময়ে। এক বিচিত্র চেহারা ধারণ করে নীলবান জাদান ভূমি।

এমন যে বদরাগি টিক্রু কিষাণ, সে পর্যন্ত চুপ। পরন্তু, সঙ্গীদের সঙ্গে ফিসফাস করল, ওই চোট তার নিয়তিতেও আসতে পারত। সে-ও একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে অমনিভাবে লয়লাকে তুলে এনেছিল আরেক দুশমনের গ্রাস থেকে। ম্যানেজার সাহেব! তবে সে লোকটা মিশিরজীর মতন অত চোয়াড় নয়। অথবা, নিতান্তই তার সৌভাগ্য বলতে হবে, শেষ পর্যন্ত হুল্লোড় আর বেশী দূর গড়ায় নি।

আশ্চর্য, কোথায় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত প্রয়াশে প্রতিবাদ ব্যূহ রচনা করবে, তা নয়, ভাবছে একেবারে উল্‌টো দিক।

পাড়াঘরেরই একটা মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে মিশিরের সঙ্গে এই গণ্ডগোলের পত্তন হয়েছে হাসনার। কিন্তু সে সব ব্যাপারে আজ আর কারো কোন অনুকম্পা, সহৃদয় মনোভাব নেই। এটা যেন কোন ধর্তব্যের বিষয়ই নয়।

হাজিরবাবুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধব্যবস্থা। রেজা মজুরের কাছে এসবই আজ ছেলেমানুষী ভাবনা ব্যতিরেকে অন্যকিছু নয়। নীলবান দেশের কুলি কামিন আর যাই কেন-না বুঝুক, এটা পরিষ্কার বুঝে গেছে, ওই বেফয়দা কাম করতে যাওয়ার অর্থই হল, উল্টে নিজের পিছনেই আরো শক্ত পোক্ত বাঁশ আনা। হপ্তাশেষে তবে বুঝতে হবে তাকে অনেক কিছু। ন্যায্য-পাওনার অনেক কম তার দিকে বাড়িয়ে ধরে চোখ চেটে চেটে হাসবে মিশিরনাথ। বলবে, এ হপ্তায় পুরা কাম হয় নাই রে তুর। এই নে, এই নে যা হয়েছে।

মূর্ছিতের মতো চেঁচাবে উদ্দিষ্ট মানুষটা, সি কি গ? মো ত—

তার আগেই মিশিরনাথ তারিয়ে তারিয়ে হেসে উঠবে। যেন স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে কিছু। তার করা কোন অপরাধের কাহিনী। লঘু মনোযোগে বার বার সেই টাকা কটা বাড়িয়ে ধরে আবার ফিরিয়ে এনে গুনবে।—এক, দুই, তিন···। তারপর হঠাৎ ঝাঁজিয়ে বলবে, যেমন কাজ, তেমনি মজদুরী: সাদা হিসাব।

ক্রোধে ফেটে পড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে রেজা মানুষ তখন বলবে, এত্‌না-কম্‌তি তাই বলে?

শুধু বলবে। তবু চেষ্টা করবে না অন্য কিছু করতে। অনেক স্বাভাবিকতা হারানোর সঙ্গে বাওয়া পুরুষ আজ খেপতেও যেন ভুলেছে।

মিশির একই রকম হাসবে। গাঁওইয়া রেজার চোখে নেশা ধরানোর ছলনায়, তার চোখের ওপর টাকা কটা বার বার নাচাতে থাকবে। জাদান মানুষের দুর্বলতার স্থানটা সে চিনে ফেলেছে ভালো করেই। তাজ্জব ঘটনা, তখন সব ভুলে, ওই সামান্য ক'টা

টাকার লোভেই সেই মানুষ প্রায় উন্মত্ত হবে। মিশিরের হাত থেকে ছোঁ মেরে বাণ্ডিলটা নিজের হাতে তুলে নিতে পারলেই যেন আশ্বস্ত হওয়া যেত। নাহলে ওই টাকা ক'টাও যদি শেষ-বেশ একেবারে হাত-ছুট্ হয়ে যায়? মিশিরের খচরামির তো লেখাজোখা নেই।

খিক্‌খিক্ করে সে হাসবে। অজ্ঞ মানুষটা বুঝবে না, এ তার হক্কের পাওনা। দাবি আছে, এর প্রতিটি নয়া-পয়সা পর্যন্ত বুঝে নেওয়ার। কিন্তু তার বুকে আছে তোলপাড় দোলানি, কখন টাকা কটা হাতে পাবে। তবে মিশিরের বদমাইসিটা হয়তো অনেকেরই একেবারে না-বাঝা থাকে না। —সারা হপ্তায় এক্কুরোজ নাগা করলম লাই, পুরা কাম করলম। হাই আপুং গ, আখুন—

মিশির আবারো খিক্‌খিক্ করে হাসবে। বলবে, উৎপাতের কড়ি চিৎপাতেই যায় রে, শালা। নে ধর, রসিকতা রাখ্।

একবার একজন ম্যানেজার সাহেবের কানে কথাটা তুলেছিল। আর যাই হোক, এ ব্যাপারে ম্যানেজার সাহেব মিশিরনাথ নয়। বাওয়ানী মেয়ে না জুটলে রাত্রি কাটে না ভালোমতো, কিন্তু তাই বলে পয়সা কম দিয়ে শোধ ওঠানোর মতো প্রবৃত্তি নয়। সাহেব তখুনি মিশিরকে ডেকে দেখতে চেয়েছিল হিসাবের খাতা।—তুমি নাকি ওদের ন্যায্য পাওনা দাও না? আই ও'ন্ট্ [illegible] গারেট্ দিজ, মাইণ্ড ইট্।

—কৌন বোলা হ্যায় জী?

—কেউ বলে নি, আমি নিজেই জানতে চাইছি।

মিশির তার স্বাভাব-সুলভ জিব বের করে বার বার বজরঙ্গীজীর কিরা খেয়েছিল। নাক-কান মলেছে ঘন ঘন।—এ্যায়সা মত্ সমঝিয়ে হুঁজুর। তারপর ভক্তের অবতার হওয়ার ভান করে চোখ মুখ মুদ্রিত করে ফের বলেছিল, মি[illegible]নকাহি যব হুকুমত্ হ্যায়, ম্যায় দেঙ্গে নেহী কাহেকো? মর্জি দিখানেকা, ম্যায় কৌন্ হুঁ?

এতো গেল অন্য কথা। এসমুদয় চাল বুঝি জানা সন্দীপ রায়ের। তবু সে হেসে ফেলেছিল। লোকটার আশ্চর্য রকম ভনিতা করবার ক্ষমতা দেখে। —একটা জিনিয়াস হে তুমি, মিশিরবাবু! রত্ন। তবে হিসাবের কারচুপি নিয়ে বলার কিছু নেই। কোন সূত্র খোলা রাখে নি। নির্ভুল, প্রথামতো সব লেখা রয়েছে খাতায়। অঙ্কের হিসাবেও কোন ভুলভ্রান্তি নেই। হাজিরাবাবুর কাজ, হাজিরাবাবু করবেই। যেদিন যার উপস্থিতি পাবে না, তারই নামের পাশে গড়-হাজিরার ঢেরা টেনে দেবে। সরকারী কানুন মোতাবেকে এ সবই যথাযথ, ত্রুটিহীন লেখা রয়েছে।

ম্যানেজার সাহেব ধমকেছিল, আমি তো তোমায় না-জানি এমন নয় মিশিরনাথ। বলি, এসব গণ্ডগোল পাকাবার দরকার কী তোমার? আমরা কি খুব সাধু-সজ্জন লোক? হার্ম ওয়াচ্ হার্ম ক্যাচ্—কথাটার অর্থ জানো?

মিশির বলবে, তখন ম্যানেজার সাহেবকে তার খুবই খারাপ লাগে। এইভাবে যদি কোম্পানীর ছ'পয়সা সে সাশ্রয় করতে পারে, তাইতে বাগড়া দেওয়া কেন বাপু? এই যে হীন ক্রিয়া-কাণ্ড সে করে, সে-ও তো একটা বৃহত্তর পরিকল্পনার ছবি চোখের ওপরে রেখেই তবে করে। এর দ্বারা রেজা মজুরের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে হাজিরাবাবুর একটা দম্ভময় 'স্বরূপ' তৈরি হয় জাদানবাসীর চোখে। যে ছকের বলে বহু মেয়েকে সে সাহেবের রাত-সঙ্গিনী হতে কবলায় আনে। এ খবর আজ আর কারো অজানিত নেই, তবু এর বিপক্ষে কোন প্রতিবাদ সোচ্চার হয় না। আলো আঁধারিতে একজন অদ্ভুত মানুষ সন্দীপ রায়। অতল, গহিন যেন তার হৃদয়ের ঠাঁই। অথচ এই মানুষই কিছুদিন আগেও বাঁধ ফাটার সংবাদ শুনে মিশিরকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তিনশ' কুড়ি টাকা ষোলজনের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে ছ'টো প্রাণের দাম চুকিয়ে ফেলতে। মিশির সেদিন হিসাব কষেছিল, একটা মানুষের

জীবনের মূল্য তাহলে সাহেবের কাছে ক'টা টাকা মাত্র। সাহেব সেদিন পরামর্শ দিয়েছিল, আর উচ্চকণ্ঠে খুব হেসেছিল তার চকিত-ত্রস্ত ভাব দেখে।—মানুষ জন্মায়, আবার মরে। কুকুর বিড়াল যেমন পথে-আঘাটায় জন্মে, শেষে আবার নিকেশ হয়ে যায়। ও-জন্য অত ভাবনার কি আছে, শুনি? ইডিয়েট। ওল্ড সেন্টিমেন্টাল ফুল্ কোথাকার। ম্যানেজার সাহেবের মনের মধ্যে যেন বিশালকায় গভীর একটা গহ্বর আছে। আবার তার পরেই চওড়া এবং প্রশস্ত সুন্দর সাঁকো বাঁধা।

যাহোক, নালিশ করতে আসা মানুষটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশিরের কষা হিসাবের অতিরিক্ত এক পয়সাও পায় না। সাহেব তার প্রতি যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু করবে কি, আইন মোতাবেকে যখন সব কিছু ঠিকঠাক আছে, তাকে নস্যাৎ করবে কোন যুক্তিতে? নাগা কাজের তো আর মজুরী দেওয়া হবে না। মধ্যে থেকে নালিশ করতে আসা সেই মানুষ, ফিরে আবার বধ হয় পরের হপ্তাতেই। মিশির হাসে, প্রতিশোধ, সোনার চাঁদ! লে, আবার নালিশ ঠোক্ গিয়ে। বলার কিছু নেই, এবারও হিসাবে কোন গরমিল নেই। যেমন উপস্থিতি, তেমনি হিসাবের হিসাব, হিজুচান পয়সা। মিশিরের হাতে আদৌ বাওয়া কোপাই থাকে না, তবু সে বালদার। মালিকের বহালী পরোয়ানায় হাজিরা-বাবু। তাই বাঁধরেকার কোন রেজাকুলিরই এখন আর বড় একটা সাহসে কুলোবে না, এগিয়ে গিয়ে তার বিপক্ষে দু'কথা বলবে।

লাছলী একদিন চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে পাড়া মাত করল, বাওয়া মরদ কি সব মেরম (ছাগল) হয়্যা গেল গ? আঁ? জোয়ানী খতম সবকোইকা?

তবু অনুদ্বেলিত থাকল পট্টি।

—তবে যি এত্তরোজ রহব ছিল বড়—শের-ছাড় জাইৎ, বাওয়া। হাই গ। এই নিয়া ধিজামে খুনের গরমি! ছো-ছো।

তথাপি যখন নিঃশব্দ রইল চবুতরার আঁধার, লাছলী হু-হু করে কেঁদে উঠল। যে তিন কথা সইতে পারে না বাওয়া পুরুষ, আজ তাই শোনার পরও তাদের অন্তরে কোন চাঞ্চল্য জাগে না। চতুর্দিকস্থ পাহাড়-বনের মহাস্থবিরতা নিয়ে যেন তারা বেবাক হয়েছে। কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তাহলে আজ বাওয়া জীবন! এরপর আর কি বলবে লাছলী? কি বলতে পারে? এ লজ্জা যে তারও। একই রাখের মেয়ে সে-ও। বাওয়ানী মেয়ে হয়ে বাওয়া পুরুষের এই অক্ষমতা ঢাকতে পারলে কিঞ্চিৎ তৃপ্তিই হয়তো সে পেত, কিন্তু ঢাকবে কি দিয়ে? কোন্ জোরে?

ভিড়ের মধ্য হতে কেবল ভোল্গা এক সময় বলে উঠল, কি করব মিসেরা, মোদির বাত কি আর উ শালো শোনবে লিকিন, যি কব গিয়া কিছু। এট্টা বেহদ্দ চোয়াড় উ শালো।

লাছলী আরো জোরে কেঁদে ওঠে। বলল, শোনবে লাই মানে? তাই বল্যা ছাড়্যে দিবি গ? ই দিশম্-জানম্ গাঁ-টো মোদির, লাই উয়াদির? ইখেনেও মোদির কাথাটো লাই টিকলে, কুথা আর টিকবে, আঁ?

—কিন্তুন—

—আবার কিন্তুন কি? শুনতে লাই চাইলে, জোর কর্যা শুনাতে হবেক, মো কই।

ভোলগা বুঝি তার ওই প্রস্তাবে এবারে তিক্ত হাসলে।—মেয়াছেলা মানুষ তু, কি কব। তবু বুল্ছি গ, সি জমানা আখুনো আছিক লিকিন ইদেশে? বাহা কাথা দেখি তুয়ার। লে মজা।

বুরন তাদের একদা নানা কথায় প্রলুব্ধ করেছিল। দিন গড়াবার সঙ্গে বাওয়া কানুনের কাঠিন্য শিথিল হবে। বিজেৎ হওয়ার ভয় থাকবে না। পঞ্চায়েত, মুরুব্বির লৌহ প্রহরাও, অনেক দুর্বল হবে। আজ তার প্রত্যক্ষ ফল ফলতে আরম্ভ করেছে,

জাদানবাসী প্রত্যেকের জীবনকে আলোড়িত ক'রে। এই পেষণ থেকে আর কোনদিনও বুঝি বনের মানুষ উদ্ধার পাবে না।

লাছলীর কান্না বন্ধ হয় না। সে বিরক্তি ওগ্‌রাতে থাকে।—ধ্যুৎ, ধ্যুৎ। বাওয়া মানওয়া আর আছিক লিকিন তুনিয়ায়? ই ত সব মায়ও গ। হিজড়া।

বুরনের কথা এখন বার বার মনে পড়বে লাছলীর। তারপর সহসা গুণিনের কথা ধরে সেদিনকার ঘটনা মনে পড়ে যেতেও পারে। পথ চল্‌তি হাসনা প্রথমে ফিসফিসিয়ে শুনিয়েছিল, সেও এবার অন্য সবার মতন গিয়ে বেড় বাঁধের নোকরীতে ঢুকবে। তখন মেলা-ই গ্যাঞ্জাম চতুর্দিকে। ডমরু রাত্রিদিন চেঁচাচ্ছে। কে তার দলে থাকে, আর কে যায়। প্রস্তাব শুনে, লাছলী খুশির তরঙ্গ-দোলায় উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। তাকে আরো উসকেছে, যেদিন সে যাবে, পার্শ্ববর্তিনী বাওয়ানী মেয়েকেও যেন সঙ্গে নিয়ে যায়। সেইমতো পরে কাজ হয়েছিল। এত উৎসাহের পর আজ জাদান মানুষের অদৃষ্ট চাবড়ানো ছাড়া কোন গতি নেই—ব্যাপারটা ভাবলেই আরো যেন মন খারাপ হয়ে যায়। একদিন যে আলোকরশ্মি তাদের দৃষ্টি পথকে প্রচণ্ড বিভায় ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, আজ তা অনুভব হচ্ছে আলেয়ার আলো বলে। হায় রে নতিজা! বিশেষ করেই এখন ভাবনার কথা, এই পরিবর্তনকে হাজার চেষ্টা করলেও আর ফিরে কখনো পাল্‌টানো চলবে না। তুহিনার ধারা কোনদিন উল্‌টো স্রোতে বয় না।

তারপরও যখন লাছলীর চিৎকার থামে নি, আর্ত গোঙানিতে মধ্যরাত্রির শব্দহীনতা খানখান হয়েছে, স্খলিত পদে একসময় টিক্রু অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে।—বহেন ঘর যাও গ।

এই সান্ত্বনায় লাছলীর উদ্বেল কান্না ফের অসংযত হয়। ডুকরে ওঠা চিৎকারে যেন পাড়া মাথায় করে।—বাওয়া মরদ সব মায়ও গ, মায়ও। ছো-ছো।

টিক্রু আরো নিকট হয়ে লাছলীকে সান্ত্বনার ভাষা শুনিয়েছে।

—রো নেহী। ই মোদির তকদীরে দারকান ঠেল রে। কান্দ্যে আর কি ফয়দা হবেক ? সব কাড়বুন-হয়্যা যাবেক বুঝিন। কপালের গেরো। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

টিক্রুর চোখেও যেন জলের ঝাপটা লেগেছে। গলার স্বর অসম্ভব রকম ভারী হয়ে গেছে। যেন তার নিজের গলায় নয়; ডমরুর কণ্ঠে কথাগুলো বলল। লাছলী চোখ তুলে তাকাতেই, দারুণ অবাক হয়ে যায়। ওই দামাল, দৈত্য সদৃশ চেহারা, কিন্তু কুঁচকে এখন যেন একটুখানি ঝুপড়ি পাবা বন দেখাচ্ছে। টিক্রুকে এইরকম দৈন্য দশায় ইতিপূর্বে বাওয়া পট্টির কেউ বুঝি কোনদিন আর দেখে নি।

বিভীষিকাময় সেইদিনের কথা আজো লাছলীর পরিষ্কার মনে আছে। হাঁকডাকে সে-ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জমায়েতের মধ্যে। টিক্রুর কাজের জুটি লয়লা। কাজের মধ্যে এক ঝট্কা একটু নির্জনে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল বাওয়ানী বউয়ের। যেমন সব মানুষই যায়। কিন্তু তার তো একটা সময়সূচী থাকবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য হতে পারে না। সেই সময় পার হয়ে গেলে, শংকিত মনে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল টিক্রু। পাহাড়-জঙ্গলের দেশ, নানান সাপ-খোপের রাজ্য! যদিও বিল-জঙ্গল সাফ্-সুত্রো হওয়ায় বনের সচল লতাদের দৌরাত্ম্য বহু পরিমাণে কমে গেছে। তারপর খোঁজাখুঁজি বেশী করতে হয় নি হঠাৎ নজরে পড়েছে, লয়লা আক্রান্ত হয়েছে। তবে সাপ, কিংবা অবণ্যচারী কোন প্রাণীর দ্বারা নয়, বাবু-মানুষের থাবা পড়েছে তার জঙ্ঘায়।

সেড ঘরের বড় মিস্ত্রী সোলেমান মিঞা। ম্যানেজার সাহেবের মতোই দেদার মদ গেলে লোকটা। দিন-দুপুর-রাত্রির ভেদাভেদ নেই। সারাক্ষণ চুর হয়ে আছে রঙীন নেশায়। মালের কোন বাছ-বিচারও করে না। হাঁড়িয়া, পচাই, মহুয়া—যা পায়, তাতেই সাঁ-সাঁ চুমুক বসায়। আর আছে, প্রচণ্ড মেয়েছেলের বাতিক।

যুবতী, বুড়ী যা দেখল, অমনি পিছনে ল্যাঙ্ ল্যাঙ্ করে ঘুরবে। সে-ই লয়লাকে একলা পেয়ে পথ আটকেছে।

টিক্রু চাপা গলায় হুংকার দিয়েছে, শালা, নংপানা। বদমাইস! তার দুই ভুরু কুঁচকে ঝুলে এসে চোখের ওপরে পড়েছে। সেখানে একখানা বিরাট খাঁজ।

সকলে হেসেছে। টিক্রু আবার সক্রোধে লাফ দিয়েছে।—হুঁ, নংপানা। সেতার বাচ্চা। মুরুব্বির কাথা মেনে শালোরে কাটব দু'টুকরা কর‍্যা। হুঁ, কাটব ত। লিচ্চয়। বঙ্গা কসম।

প্রবল বর্ষার কারণে সিমেণ্ট ঢালাই ও মাটি ভরাটের কাজ এতদিন বন্ধ ছিল। পাথর খাদানেই যেটুকু কাজ হয়েছে। দীর্ঘ বিরতির পর এখন আবার পুরোদমে পরিকল্পনা মতো আরম্ভ হয়েছে সব কিছু। চারিদিকে সর্বক্ষণ মানুষ জনের হুড়োহুড়ি, হাঁক-ডাক। যান্ত্রিক ধ্বনি গজরাচ্ছে। পাহাড় ও জঙ্গল সীমানা পর্যন্ত চীহর লতার পাকদণ্ডীর মতন টিক্রুর সেই হাঁকানি অনেকক্ষণ ধরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফিরল। স্থানটা ঢালু পাহাড়ের উৎরাই স্থল। রক্তিম পাথুরে ঢেলা ইতস্তত: ছড়ানো চারিদিকে। লাছলী চিত্রার্পিত হয়ে গিয়েছিল। ওই হাঁক-ডাক, লম্ফ-ঝম্ফটুকুই সার। সাহস ভরে কেউ এক পা এগিয়ে গেল না কোপাই উঁচিয়ে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছিস, আগের দিন হলে এতক্ষণে কি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত, সকলের জানা। অথচ আজ যেন সবাই কোন্ জাদুমন্ত্র বলে একেবারে স্থাণু হয়ে গেছে। কেবল মুখের কোঁতানি দিয়ে যেটুকু দম্ভ দেখায়।

টিক্রু আস্তে আস্তে বলছিল, সাবেক এলা গেণ্ডুয়ার আটি এম্পা। অর্থাৎ আজই শেষ দিন। কিন্তু টিক্রুর নিজের ওই ভাষাতেই শেষ পর্যন্ত তার গলায় কোন উল্লাস জাগে নি। বরং যেমন ঝিমিয়ে ছিল, তেমনি ঝিমিয়ে রইল। পরে ধীরে ধীরে ফিরে যেতে উদ্যোগী হল।

লাছলী দেখল, তার মতো টিক্রুর মুখও সেই মুহূর্তে ভীষণ

ভারাক্রান্ত। অশ্রুকণা দুলছে চোখের পাপড়িতে ঝুল খেয়ে। এবং সে যেন এখনো নিজের গলায় কথাগুলো বলল না, ডমরুর কণ্ঠেই বললে। অতঃপর লাছলীর হঠাৎ মনে হল, তাহলে টিক্রু নয়, মুরুব্বিই কোন ভৌতিক কায়দায় এই মুহূর্তে উঠে এসেছে এখানে। আর এসেই, তার চিরাচরিত স্বভাবে খ্যালখ্যাল করে হাসছে। যতই কেন না পাগল-ছাগল মনে হোক মুরুব্বিকে, প্রলাপ বকুক— মুরুব্বির সেইসব অভিশাপ আজকের দিনে এমনভাবে মিলে যাবে সেদিন বুঝি দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে নি।

টিক্রু ঘাড় নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরে চলা আরম্ভ করেছিল। কয়েক পা হেঁটে পিছন ঘুরে শেষবারের মতো ডাক দিল, কই মিসেগ্না, কছি যি, ঘরে যাও। রা করয়া আর কিছু ফয়দা লাই গ।

এবারও ডাকটা, ডুংরি-ডিহির ওপার পর্যন্ত খাদান মাটির বনে যেন ছেলা ভাসিয়েছে। বলেই সে আবার হাঁটতে থাকল। লাছলী পড়ল, টিক্রুর চোখে তুহিনার আকাশ, লালকুঁয়োর অরণ্যছায়ারা যেন সহস্র টুকরোয় খান খান হয়ে গেছে। সে অতঃপর আর না দাঁড়িয়ে তার পিছন পিছন হেঁটে নিজেদের ঘরের দিকে ফিরে যায়।

পরদিন ঘাটলা পাড়ে নির্জনে বসে একই ভাষায় ডুকরে উঠলে, হাসনা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে থামালো, ন, রো। কাঁদিস নে। সব ঠিক হয়্যা যাবেক। কিন্তু তারপরই আর তার প্রবোধ দেবার ভাষা নেই। এক জিজ্ঞাসারই সে আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক কোন উত্তর দিয়ে উঠতে পারল না, এখন তো শতেক প্রশ্ন।

লাছলী নড়ে না, চড়ে না। হাসনা তার কাঁধে হাত পাতে। ঠোঁট কাঁপল, ভুরু নাচল। স্বাভাবিকভাবে এবার যে প্রশ্ন আসার কথা, তা ভাবতে গেলে হাসনার বুক গুঁড়িয়ে যায়। এ-তো জানা কথাই, লাছলী এখন কি শুধোবে তার কাছে? আসলে, াবার ওই একই জিজ্ঞাসা যে তারও। তবু মুখে যেন যন্ত্রের নিয়মেই

আবৃত্তি করে ওঠে, হুঁ, মো কই, সব ঠিক হয়্যা যাবেক জরুর। হুঁ জরুর। ভাবিস লাই গ।

মেঘমেদুর আকাশের থমকানি নিয়ে এবার হাসনার চোখে জল নামে। বাওয়া মরদের শাণিত দৃষ্টিতে গাড়ার উল্কি। তাই দেখে, লাছলীর চোখে বরিষণ ধারা সেবারে আরো উত্তাল হয়।

হাসনার বুকে গহিন দরিয়ার শীতলতা, সে লাছলীকে বুকে বেঁধে আড়াল তুলল। লাছলী কোঁকাতে থাকল। ভিজে মুখমণ্ডল তার চুলে জড়াজড়ি হয়ে যায়।

—জ্বল্যে যায় গ। হাসনার হাত টেনে আপন বক্ষ মাঝে পাতল বাওয়ানী সুন্দরী।

হাসনার অজানা কিছু নেই, কিসের জ্বলুনি ওই বুকে। সে নিরুত্তর থাকে।

লাছলী বললে, তু বুঝবি লাই। বুঝবি লাই গ—

—কি বুঝব লাই?

—মেয়া মানুষের বুকের রাঃ। কান্না!

এবারে হাসনার নিবু নিবু ডুই-ডুই গলা শোনা যায়। লাছলীকে বুকে তুলে ধরে ডুকরে ওঠার মতো বলে, কি করব। নসীবের যি দাগ গ।

জলভরা দৃষ্টি নিয়ে লাছলী তাকিয়ে থাকে হাসনার মুখের দিকে। সে সম্পূর্ণ পৃথক। বাওয়া পাড়ার মাটিতে তার জোড়া আর কেউ নেই। মিটমিটি আবার যখন হাসনা বলেছে, তবেক মো কছি, সব ঠিক হয়্যা যাবেক একুরোজ, ভাবনা লাই। লাছলী সেবারে আর চুপ কর থাকতে পারল না। একই কথা আবৃত্তি করে সে-ও স্বীকারুক্তি জানাল।—হুঁ, ভাবনা করি লাই। জানি, সব ঠিক হয়্যা যাবেক। তবে উৎকণ্ঠা রুখতে সে আরো কিছু বাড়তি ভরসা চায়।

কিন্তু হাসনা ওর বেশী আর কি বলবে? তারও যে গলা বন্ধ একই জিজ্ঞাসায়।

সেই রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল লাছলী, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হাজরাবাবুর ঘরের দিকে সে এগিয়ে চলেছে। পায়ের তলায় শুক্‌নো রাস্তায় ধুলোর মেঘ উড়ছে। আকাশে রাঙাভাঙা অস্বচ্ছ চাঁদ। রাস্তার পাশে ঝাঁকড়া জঙ্গলে কিসের আওয়াজ শুনতে পেল। কৌতূহলী লাছলী এগিয়ে গেল দেখতে। কাছে যেতেই লক্ষ্য হল, অস্পষ্ট চাঁদনী জ্যোৎস্নায় আদিম জানোয়ারের মতন উবু হয়ে বসে মিশিরনাথ বিড়ি টানছে আর খক্‌খক্ করে হাসছে। এহেঃ, লোকটার হাঁটুর নিচ থেকে পা ছ'টো ওইভাবে খসে গেল কবে? বাবা গো, কি ভয়ংকর দেখাচ্ছে হাজরাবাবুর চোখমুখ। রক্তময় চাউনিতে যেন সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবে। লকলক করছে জিবের ডগা। ঠোঁট ফাঁক হয়ে জিব ঝুলে নেমে এসেছে বাইরে। আরে, আরে! ওরে বাস্‌রে! একি কাণ্ড! এতক্ষণ নজর হয় নি, চারিদিকে দেখি রাশীকৃত উলঙ্গ মেয়ের ছড়াছড়ি। আর, সকলেই জ্ঞানহারা। আলুলায়িত কুন্তলে পড়ে আছে মরার মতো। তাহলে এই মেয়েগুলোকে এতক্ষণ নিগ্রহ করছিল মিশিরনাথ। তাইতেই চেহারাটা তার নিজেরও খপিস, সাংঘাতিক দেখাচ্ছে। যেন ভয়ংকর এক ঝড় বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।

লাছলী কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপরই দারুণ ভয় পেয়ে গেল। মিশির ছ্যাদলা পড়া দাঁতে সমানে চোরাগোপ্তা হাসছে। আজ সে অনেক পেয়েছে। কুঞ্চিত চক্ষু আর কাটা ভুরুতে, এই হাসির সঙ্গে অদ্ভুত ছিরি হল তার মুখের। ভয়ে সারা শরীর শিরশির করে উঠল তখন লাছলীর। ঘাম জমে উঠল নাকের কোল দিয়ে সমগ্র মুখমণ্ডল ভাসিয়ে। পিছন ঘুরে তাড়াতাড়ি পালাতে যাবে, শুক্‌নো একটা ডালে মট্ করে পা পড়তেই, মিশির ফিরল তার দিকে। ফিরেই যেই দেখতে পেল তাকে, কী খুশীর আনন্দ! ছুই গাল বেয়ে যেন উপচে পড়ল সেই ধারা। কিম্ভূত জানোয়ারটা এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তার

দিকে। লাছলীর গায়ে কাঁটা দিল। হাত পা শিথিল হয়ে আসতে থাকল ক্রমেই। কিন্তু ধরা সে দেবে না কিছুতেই, কোনমতেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা আরম্ভ করল সামনের রাস্তা ধরে। ওমা, পিছনের কিম্ভূত জানোয়ারটাও দেখি নাছোড়বান্দা। সমানে তেড়েফুঁড়ে ধেয়ে আসছে তার পিছু পিছু। আসছে, ক্রমে এসে পড়ল প্রায়। কাছে, এবারে আরো কাছে। হিমশীতল ভয়ে হাত পা ছুঁড়ে বিকট আর্তনাদ করে একসময় বিছানায় উঠে বসল লাছলী। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। মাথা অসহ্য ভার। কাশির দমক উঠল। আলটাগরায় জিব আটকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়েছিল আরেকটু হলে। অতঃপর নিদ্রার ঘোরটা সম্পূর্ণ ছুটে যেতেই যখন অনুধাবন করতে পারল— ব্যাপারটা বাস্তবে নয়, স্বপ্নে, দুঃসহ একটা বোঝা মনে হল বুকের ওপর থেকে কেউ নামিয়ে নিল। জানালা গলে বাতাস এসে কপাল মুখ স্পর্শ করল। মিষ্টি প্রশান্তির সুর বইল তাইতে। যাক্, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারে নি মিশির চোয়াড়টা। তার কাছে দৌড়ের বাজিতে হেরে গেছে—ব্যাপারটা ভাবতেই, খুব ভালো লাগল। খুশী খুশী আমেজে চিত্ত আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। জানালার বাইরে উদাস আকাশ তখন সাত লহরী তারার মালায় প্রসাধন মিটোতে ব্যস্ত। গাছের পাতায় ধূসর আলোর চেতনা। দূর বনানীর শাখায় শাখায় পাখির স্তিমিত-গুঞ্জন জাগ্রত। উঠোনের বুড়ো হিজল গাছের শুক্‌নো ফল ঝরছে। লালকুঁয়োর রাঙামাটির সর্বাপেক্ষা ইঙ্গিতময় মুহূর্ত এখন। বন্ধমুখেও দারুণ চপলা, মুখরা। পাহাড় বনের দেশে ঊষা আসছে নবতর সাজে। লাছলী অনেকক্ষণ সেইদিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে আবার সজাগ হল।

এইদিনই প্রথম কাজে কামাই করল লাছলী। রাত্রির ঘুমটা নষ্ট হওয়ায় নিবিড় প্রশান্তিতে এখন চোখ বুজল।

ক্রমেই কেমন শুক্‌নো পাতার মতো নীরস, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল মঙ্‌লি। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, এক মুহূর্তের তরেও উপশম নেই। ওইসঙ্গে সমানে রক্তস্রাব চলেছে। সারা দিনরাত বিছানায় কাটা ছাগলের মতো কাতরায় মঙ্‌লি। যত কাতরায়, যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়।

চেষ্টার ত্রুটি নেই যতনের। বার বার ছুটে ছুটে গেছে শিউপূজনের দাবাখানায়। দোস্ত্‌ রামঅবতারের সঙ্গে সলাহ পরামর্শ করেছে। সে আবার যে নতুন ওষুধের নাম বাত্‌লেছে, কিনে এনে খাইয়েছে। কিন্তু কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। বরং দিনে দিনে ক্রমেই কেমন যেন নিঃসাড় হয়ে পড়ছে মঙ্‌লি। বকের মতো সাদা হয়ে যাচ্ছে।

বেশ যাচ্ছিল দিন তাদের। পেটে বাচ্চা এসেছে মঙ্‌লির, সারাক্ষণ সে হাসিগানে মত্ত হয়ে থাকে। পেটের বাচ্চা বুঝি নড়ে চড়ে, মঙ্‌লি অমনি চিৎকার করে যতনকে ডেকে সেই বাচ্চা চলাফেরার গল্প বলে। হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পেটের কোথা থেকে কোথায় নড়ল বাচ্চাটা। যতনও কতদিন মঙ্‌লির ফোলা পেটের ওপর কান ঠেকিয়ে বাচ্চাটার নড়াচড়ার খবর জানতে উৎসুক হয়েছে। পরিষ্কার হয়তো বোঝে নি কিছুই, তবু আবারো চেষ্টা করেছে বুঝতে। মঙ্‌লি ঈষৎ কৃশকায় বলে প্রথমে রাম-অবতারই দিয়েছিল প্রস্তাবটা।—বাবু-মানুষরা এসময় তাদের বউ-মেয়েদের নানারকম ভাল-ভাল ওষুধ খিলায়, যাতে বাচ্চার তাকত্‌ হয় জবরদস্ত্‌, পোয়াতীও সুস্থ থাকে। তারপর বাচ্চা বিয়োনোর কষ্টটা যাতে জাদা না হয়। শুনে চোখ বড় বড় করে ফেলেছিল যতন।—বাহা, এমন কায়দা-কানুনও শোহুরে মানুষেরা জানে! এমন ওষুধও আবার আছে নাকি? শিউপূজন তখন দোকানে ছিল না। রামঅবতার কাঠের আলমারি বেয়ে উঠে ওপারের শোকেস থেকে একটা পেট মোটা শিশি বের করে

দেখিয়েছিল।—এই হল সেই ওষুধ। দোকানে পানীদারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মালিক শিউপূজনের সঙ্গে খরিদ্দার বাবু-মানুষের অনেক আলোচনা সে শুনতে পায়। মালিক তাকে এ-ওষুধটা সে-ওষুধটা এগিয়ে দিতেও বলে। এতে করেই সে ওঝাগিরির অনেক ফর্দ জেনে ফেলেছে। শিশিটা দেখিয়ে রামঅবতার নিজের বাহাদুরী যাচাই করতে পেরে খুব হেসেছিল। —হুঁ-হুঁ, বাবা। পরে যতনের হাতে এগিয়ে দিয়েছিল পাত্রটা। যতনের বিস্ময় তখনো কাটে নি। সে শিশিটা ধরে একটুক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিয়েছিল। তেলতেলে হলুদ কি খানিকটা তরল পদার্থ। কিন্তু রামঅবতার যা বলছে, সেই আশ্চর্য মোহিনী ক্ষমতা যদি এই বস্তুটুকুর সত্যি হয়, অবাক হওয়ারই কথা। তেমন ক্ষমতা আদৌ কোন পাচনে আছে শুনলেই অবাক হতে হয়। পরে তার চোখ দুটো অসম্ভব রকম ঝকমকিয়ে উঠেছিল। মঙ্‌লির মুখটা বুঝি সহসা মনে পড়ে গেছে। হাসাহাসিতে সে সারাক্ষণ মশগুল হয়েই থাকে। তবু কখনো কখনো যতনের যেন লক্ষ্য পড়ে যায়, অনাগত সন্তানভারে ঈষৎ পীড়িত মঙ্‌লি। গায়ের সেই দামাল শক্তিতেও যেন অল্পবিস্তর ভাটা লেগেছে। হঠাৎ তার বড় ইচ্ছে হল, বাবু-মানুষদের মতো সে-ও এই ওষুধ মঙ্‌লিকে খাওয়াবে। যাতে প্রসব সময়ে তার কোন কষ্ট না হয়। আর পেটের খচ্চরটাও সুস্থ সবল থাকে। মঙ্‌লির কোন কষ্ট সে চোখ চেয়ে দেখতে পারবে না। ওষুধের দাম শুনে পরে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল যতনের। সারা সপ্তাহে একুনে তার রোজগার কত হয়, অঙ্কটা একদণ্ডেই মনে পড়ে গিয়েছিল। তবু শেষ পর্যন্ত রোখের বশেই ওষুধটা সে কিনে নিয়েছিল নগদ দামে। তারপর বাড়ি ফিরেই আবিলম্বে সেই ওষুধ এক দাগ খাইয়ে দিয়েছিল মঙ্‌লিকে। মঙ্‌লি খেতে চায় নি। আদিবাসী বাওয়ানী মেয়েরা এসময় তের রকম শিকড়-বাকড়, গাছের ছাল-চামড়া দিয়ে একপ্রকার পাচন বানিয়ে খায়। গাঁয়ের

বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েরা সেই শিকড়-বাকড়ের নাম বলে দেয়, সংগ্রহে সাহায্য করে। ক্বাথ বানাবার প্রণালীটাও দেখিয়ে দেবে। মঙ্‌লিও সেই রীতি অনুযায়ী পাঁচন বানিয়ে খাচ্ছিল। যতন রাগের মাথায় একটানে সেই ক্বাথের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অশ্লীল খিস্তি-খাবুদ করেছে। মঙ্‌লি আগেও যেমন কিছুতেই শহুরে কায়দা কেতা শিখতে চাইত না, এখনো তার সেই দেহাতী রকম-সকম দেখে, যতন তারপর তাকে ধোলাতে উদ্যত হয়েছিল। মঙ্‌লি তখন সেই শিশির দাবাই খেয়েছিল।

যতন খিঁচিয়েছে, ইর দাম কত জানিস? তোকে বিক্রি করলেও সি পইসাটো উঠবেক লাই গ, হঁ। উ কাথাটো মনে লিস সারাক্ষুন।

পাগলা মানুষটাকে মঙ্‌লি খুব ভালো করেই চেনে। শহরের প্রশস্তিতে সারাদিনমান বুঁদ হয়ে আছে। এই দেশও একদিন পুরো শহর হয়ে যাবে, মুখে সেই ব্যাখ্যান খালি। তবে মঙ্‌লির প্রতি রয়েছে অসীম টান। কিসে সে একটু আরাম পাবে, এই ভাবনা সারাক্ষণ মাথায়। ওই খিঁচুনির আর কোন জবাব না করে সে চুপ করে থাকে।

যতন আবার কোঁদে, বাপের জম্মে দেখিচিস কুনোদিনও ই দাবাই, হঁ? গাঁওইয়া ভূত কাহিকা। যতন তারপর আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে নিজের উত্তেজনাটা প্রকাশ করেছিল, দেখবি, সাতদিনে কি গতরখান হয়? হুইত শাসিকের মতুন ছিড়ি, ইবার একুবারে নধর খাসি হয়্যা যাবি গ, হঁ। যা কছি, খাঁটি কাথাখানা। মিলায়ে লিস পিছে।

বিপত্তিটা বেধেছিল এরপরই। পরদিন মঙ্‌লি খুব বমি করল। সাত-আট-দশবার করল। রাত্রে শুরু হল আচমকা রক্তস্রাব। যতন ভাবলে, এ বুঝি মঙ্‌লিরই কোন দোষে। তবু ছুটে গিয়েছিল রামঅবতারের কাছে। সব শুনে রামঅবতার হেসেছিল। অমন নাকি অনেকেরই হয়। বাবু-মানুষদের মেয়েদের হামেশা হচ্ছে।

তারপর দিয়েছিল আরেক প্রস্থ দাওয়াই। যতন তা-ও নেয়। বাড়ি ফিরে যথেচ্ছ খাইয়েছে সেই ওষুধ। সঙ্গে যে-সব চিকিৎসা প্রণালী বাতলে দিয়েছে রামঅবতার, সে-ও চলেছে। ক্রমে যে পেটে যন্ত্রণা বিশেষ ছিল না, আরম্ভ হয়েছে অসহ্য টাটানি। এবং রক্ত-স্রাবও বেড়ে চলল। এখন মুমূর্ষুর মতো বিছানায় পড়ে কাতরায় মঙ্‌লি, আর বারে বারে জল খেতে চায়। মুখে বলে, পেটের দরদে সে তুনিয়া আন্ধেরা দেখছে।

সেদিন জিৎ সিংয়ের কাছে অপমানিত হয়ে ঘরে ফিরে মঙ্‌লির আর্ত ভাবসাব দেখে যতন আরো ক্ষেপে উঠল শহরের মানুষদের সম্পর্কে। কি জানি, রামঅবতারের দেওয়া ওষুধ খেয়েই যদি মঙ্‌লির এই অবস্থা হল নাকি? গ্রাম লালকুঁয়োয় বাওয়ানী মেয়ের বাচ্চা হবে, নতুন কোন ঘটনা নয়। আখছার হচ্ছে ইতিউতি। কেউ শহরে মাঙা দাওয়াই খরিদ করে এনে খায় না। দেশজ লতাগুল্ম, শিকড়-বাকড় পিষেই দাওয়াই তৈরি করে নেয়। সেখানে রামঅবতার বিশ্বাসঘাতকতা করে নি তো? জিৎ সিংয়ের মতোই তাকে লাঞ্ছিত করে মজা পেতে চায় নি তো? শহরের মানুষদের ওপর আর তার সেই আস্থা নেই। অকারণে যারা অপরকে নাস্তনাবুদ করতে পারে, তারা সব পারে।

কি ভেবে যতন পরদিনই নাগরা গাঁয়ের পাঁচন বভির কাছে গেল। বুড়ো মানুষ চলতে-ফিরতে বিশেষ পারে না। তবু যতনের সকাতর অনুনয়ে আসতে রাজি হল। এসেই দেখে যা বলল, যতন কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে রইল। এ ক'দিনে অবিশ্রান্ত রক্তের ঢলে শরীরের সব সার পদার্থ নাকি নামিয়ে দিয়েছে মঙ্‌লি, পেটের বাচ্চাও কখন ওই সঙ্গে ধুয়ে গেছে। এখন তার শেষ বিদায়ের ক্ষণ।

যতন ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল মঙ্‌লির মুখের ওপর। পেটে কান ঠেকিয়ে বাচ্চাটার নড়াচড়ার শব্দ অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। না, মঙ্‌লির বুকের ধুকধুকি লাফানোর সামান্য মাত্র আওয়াজও

শোনা যায় না। পেটও নীরব, নিথর। তাহলে পাচন বড়ির কথাই খাঁটি। তাহলে শহুরে দাওয়াই দিয়ে রামঅবতার তার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গেরই কাজ করেছে? চিৎকার করে উঠল যতন, হাই গ, ই কি কারবার? সব শালা জিৎ সিং গ। দাওয়াইটো পর্যন্তক।

যতন ফুঁকরে উঠল মঙ্‌লির নাম ধরে, হেই মিরু, একুবার দেখ কেনে গ মোর দিকি। কেমুন লাগছিক বল্‌ গ।

ঠোঁট নড়েছে মঙ্‌লির। যেন বহুদূর জগৎ থেকে সাড়া দিচ্ছে সেই ডাকে। তারপর হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে প্রশ্নকারীকে। অর্থাৎ, মঙ্‌লি অন্ধ হয়ে গেছে।

যতন আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মঙ্‌লির ওপরে। হেই, তু চোখে দেখতি পেছিস লাই লিকিন? বল্‌ গ জলদি! বলে তার বন্ধ চোখের পাতা ফাঁক করে ধরেছিল।

মঙ্‌লির ঠোঁট নড়েছে। সেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে আহ্বানকারীকে।

ওঝা ওষুধের শিশি তুলে দেখে বলেছে, এই ওষুধই হল মঙ্‌লির কাল। ভরা মাসে জঠরে গরম তাপের বস্তু গেছে, অমনি ধাত ছেড়ে গেছে বাওয়া খিজামের মেয়ের। এ সময় সাধারণতঃ ঠাণ্ডা পরিপাকের জিনিস খাওয়া উচিত।

পাঁচন বড়ির কথা শুনে বিহ্বল যতন ছুটে গিয়েছিল শিউ-পূজনজীর দাবাখানায়। মালিক শিউপূজন শেঠ তখন দোকানেই ছিলেন। যতন আর রামঅবতারকে কিছু না বলে, প্রথমেই সব খোলাখুলি মালিককে বললে। শুনে শিউপূজন চড়া গলায় হাসলেন —ধুৎ ব্যাটা, ওর কথায় ওষুধ কিনে খাইয়েছিস। একটা আস্ত গাড়োল তুই।

—কেনে?

—ও তো ওষুধের ভুল নামও বলে থাকতে পারে। ও কি পাস করা ডাক্তার?

যতন তাড়াতাড়ি ওষুধটার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেছে।—লেঙ্গেৎ গ। পিছল-পিছল। আর, হুই শাশাং-আয়াঃ রঙের। হলুদ রঙের।

কাজের সময় বিরক্ত করলে মেজাজ বিগড়ে যায়। আর বুঝি ধৈর্য রাখতে পারেন না শিউপূজনজী। মুখ বিকৃত করে ধমকে উঠেছিলেন। —অমন ওষুধ তো কতই আছে গাধা। বোবা বোকা কহো মৎ। বলে কি ভাবে হাতের কাছে থাকা একটা ওষুধের শিশি তুলে দেখিয়েছেন। তারপর সিট ছেড়ে উঠে এসে তাকে দোকান থেকেই তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন।—যা, ভাগ্ অাভি। পিছে আসিস।

যতনও ক্ষোভের মুখে সেবারে বলে উঠেছিল, ওষুধ ঝুট, লাই তুয়ারা ঝুট গ, হঁ? কোমড়া, বাঁড়িয়া ঢ্যামনা।

একদিন গ্রামের মানুষকে শহরে যাওয়ার জন্য কতই না উত্তেজিত করেছে যতন। এই নিয়ে তুমুল বচসা, তর্ক-বিতর্কও কম করে নি। নগর জীবন ছেড়ে পঞ্চানন গ্রামে এসে বসতি করেছে, যে কারণে সে আজ পর্যন্ত তার দুচোখের শূল হয়ে আছে। যতন নিজেও যথেষ্ট শহুরেয়ানা রপ্ত করে ফেলেছিল। কিচ্ড়ি ছেড়ে প্যাণ্ট পরে। হাতে ধরে কিছু খায় না, বাবু-মানুষদের মতন চামচে দিয়ে কেটে কেটে খায়। আজ যেন সমস্তই একটা প্রকাণ্ড প্রহসনের মতো মনে হয়। নিজেকেই এতদিন নিজে নিষ্করুণ ধাপ্পা দিয়ে এসেছে। বাবু-মানুষরা একবার শহর থেকে যাত্রাদল ভাড়া করে এনেছিল। সেই গানের দলে একটা এবারে ছিল। মানে ভাঁড়। লোকটা খালি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে হাসাচ্ছিল। সে-ও কি সেই এবারেটার মতোই এতদিন অযথা নানা কায়দায় লোক হাসিয়েছে? যতন প্রথমে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর চিৎকার করে মণ্ডলির নাম ধরে ক'বার ডাকল। শেষে কি হল হঠাৎ, পাগলের মতো হি-হি করে হেসে উঠল। অতঃপর কাল্পনিক রামঅবতার জিৎ সিংয়ের উদ্দেশে বলে চলল, খুব মজা পেছিস, মোকে স্যে ফুর্তি করবি গ?

হঁ-হঁ, বুঝায়ে দিব সিটো কেমুন কর‍্যা করতি হয়। যতন মাটির ওপর লাফ দিল। সে যেন হঠাৎ বহুদিন হল মারা গেছে ডমরু সর্দারের পুরাতন আকৃতি পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

এর দু'দিন পরই মঙ্‌লি মারা গেল।

আর যতন তখন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল। সারাদিন এখানে সেখানে আপন মনে ঘোরে আর বিড়বিড় করে কি বলে। বলে আর মাথা ঝাঁকায়। তারপরই হি-হি করে হেসে ওঠে। তখন খিস্তির গৎটা আরেক দফা আউড়ে যায়।—খুব মজা পেছিস, মোকে ন্যে ফুর্তি করবি গ? হঁ, হঁ, বুঝায়ে দিব—। রোজই একই বয়ান। ওই একটাই মাত্র কথা। যতন তারপর আর এক জায়গায় দাঁড়ায় না। হাঁটা ধরে আরেক রাস্তায়।

সন্ধ্যার পর ঘাটলা পারে এসে তারা নিঝুম বসে থাকে।

অনুচ্চারিত আর্তনাদে ফুঁকরে উঠে লাছলী এক সময় ঝামটা দেয়, কি জরুরত ছিল হুজ্জোতি বাঁধানোয়?

হাসনা শব্দ করে না। সে যেন এখন কিঞ্চিৎ অনুতপ্তই। বর্তমানে জাদান ঘরে সে-ই একমাত্র বেকার পুরুষ বলতে গেলে। আর সকলেই নাহলে কিছু-না-কিছু করছে। দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করে, শালা দুশমন চেছিল—

লাছলী মাঝে পড়ে ধেয়ে ওঠে, সবেতে খালি কায়দা দেখানো। অত মাতব্বরী কিসের? গাঁ-আসরের মুরুব্বি লিকিন তু, আঁ?

অর্থাৎ, পট্টিঘরে আরো তো কত মরদ আছে। তাদেরই সম্মুখে, আপন মাওসী গাঁয়ের একজন জরু যখন চরম বেইজ্জত হচ্ছিল, কেউ প্রতিবাদ করল না, অথবা এগিয়ে গেল না—সেখানে হাসনা কেন গেল? অত সমাজ সেবার প্রয়োজনটা তার কিসের? আসলে এই তো এখন রেওয়াজ। কেউ আর এতে বিচলিত হয় না। পিছন থেকে মিশিরের জামার কলারই বা চেপে ধরেছিল

কেন? প্রথম দিন নিজের নাক ফাটাবার সুযোগ দিয়ে, তবু যা হোক একটা সুখকর নিষ্পত্তি হয়েছিল। সেদিন আবার পিছনে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে বাঁধরেকা মাৎ করতে গেল কেন? একজন গররাজি বাওয়ানী মেয়েই কি যথেষ্ট ছিল না মিশিরের পক্ষে? সাধ না হলে, চোখ রাঙিয়ে কোন বাওয়ানী মেয়েকে কব্জা করান, অসম্ভব ঘটনা। যে কারুর পক্ষেই।

আজ বেশ ক'দিন হাসনার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। কিছুদিন হল, হাসনা যেন বিশেষ করেই তাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে ফিরছে। ঠিক মতো আসে না জংলাকাটার পাড়ে। আর যদিও বা আসে, রাত্রি গভীর হলে তবে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর দীর্ঘক্ষণ একলা অপেক্ষা করে লাছলীর তখন দুচোখ ছাপিয়ে ক্লান্তি গড়ায়। বার বার হাই ওঠে, আর ঘুমে মাথা ঢুলে পড়তে থাকে অনবরত। তা-ও আবার এসে বসা নেই। কাছাকাছি হতে না-হতে বলবে, আজ আর জাদা সোময় বসব লাই রি, বড়ি হেতাল আছিক। তাড়া আছে। কোনদিন বলবে, দিমাগ জুতে লাই। মেজাজ ঠিক নেই, বুরা লাগছে। গত ক'দিন ধরে তো তার সাথে দেখাই হচ্ছে না লাছলীর। লাছলী এসে বসেছে! একলা অপেক্ষা করছে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। তারপর নিঃশব্দ পায়ে একরাশ ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে গেছে পাড়ার রাস্তায়।

আর কালক্ষেপ করবে না লাছলী। কত আর নির্বিকারে বসে দেখবে? মনস্থির করে ফেলে, যাবেই সে এবার মিশিরের কাছে। দরকার হলে, ম্যানেজার সাহেবের কাছেও যাবে। গিয়ে সবিনয়ে আর্জি নিবেদন করবে, হাসনার পুনর্বহাল চাই। তারপর যা হয় হোক্। যা কপালে আছে ঘটুক—কিছুর জন্য আর পরোয়া করে না সে। অনেক ভেবে দেখেছে, হাসনার এই আওয়ারা জীবনের পরিণতি নিশ্চয় খুব ভালো নয়। এখনই যা অবস্থা, কোন্‌দিন না-জানি কোন্ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। পাগল-ছাগলও হয়ে যেতে পারে। আপন মনে

কি খালি বকছে, আর ক্রুদ্ধ ফোঁসানিতে গজরাচ্ছে অনুক্ষণ। এই পরিস্থিতিতে যদি আশিকের জন্য আপন ধরম দেওয়ারও প্রয়োজন হয়, দেবে লাছলী। সেই তো হবে তার চরম পূর্ণতা। মোটকথা, যে কোন মূল্যে, যা করে হোক, হাসনাকে বাঁচাবে। তাকে আবার সহজ বোধের জগতে ফিরিয়ে আনবে।

সাপিনী বাওয়ানী মেয়ে লাছলী। কিন্তু কে যেন তার মাজা ভেঙে দিয়েছে, আর ফণা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। নির্জনে কাঁদে আর ভাবে, বনতলী এই জেরাত গাঁয়ের মতোই তার অদৃষ্টও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। এ বুঝি আর কোনদিনও মেরামত হবার নয়।

তারপর এক সময়, অতিক্রান্ত সন্ধ্যার বনপটে, চুপি চুপি লাছলীর পা চলল মিশিরনাথের ধাওড়া-মুখি। আজই তার পক্ষে প্রশস্ত দিন। ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, হাসনার মতিগতি ততোই রহস্যময় হয়ে উঠছে।

আর মিশিরনাথ যেন জানতো লাছলী আসবে। সে অমনি দূরদূর করে হেঁকে উঠল, এতদিনে রহব ভাঙলো ?

লাছলী বললে. হাসনার নোকরীটো লাই হলে—। উটো চাই গ।

মিশির খিঁচোলো, এহে লাটের বাট! এসেই অমনি হুকুম-তম্বি। যা-যা, দূর হয়ে যা।

লাছলী তখন কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললে, বুরা মানিস লাই গ কিছুতে। মাথার ঠিক লাই। টুকুন দয়া কর, মালিক। বঙ্গার দোয়া মিলবিক। ভালাই হবেক তুয়ার।

কতদিন এই লাছলীকে কব্জা করার চেষ্টা করেছে মিশিরনাথ। সামান্য মাত্র পরশ একটু। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হয় নি। মিশির বেশী বাড়াবাড়ি করেছে, বা এগিয়েছে তো, অমনি খুনিয়া বের করে দেখিয়েছে। ইয়াদ করিয়ে দিয়েছে, বাওয়ানী মেয়ের দাঁতে আছে

বিষধরীর বিষ। একবার ছোবল বসালে, সর্বাঙ্গ পচে গেল দগদগে ঘা হয়ে যাবে।

মিশির চোখ-মুখ ঝাঁজিয়ে জ্বলে উঠল। দাঁত খিঁচিয়ে আবার বললে, কেন এতদিন যে বড় তড়পাতি, দো-ফালা করে ফেলবি। কত ঠমক, বাওয়ানী ইল্‌কা মোরা, ভুলিস না। আজ আরেক কথা যে।

—হেই, উটো গুনাহ্‌ হয়্যা যেছে। মাফি কর‍্যা ছে গ।

—তোর মাফি মাগুার গুষ্টিকে…। মিশির অশ্লীল খিস্তিতে ফের দাবড়ি দিল।

এ তো জানা কথাই। বাগে পেয়েছে শিকারকে তাই অবহেলার ভাব এখন ঘুচবে না মিশিরের। কিন্তু লাছলী আজ ওসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবে না। সমস্ত ভালো-মন্দ বিচার জলাঞ্জলি দিয়েই তো সে এখানে এসেছে। বলতে গেলে এখন সে পুরোদস্তুর মরিয়া। যা হয় হবে। পিছনে বাওয়া খিজামের কোন টান নেই। যা হোক একটা নিষ্পত্তি করে তবেই সে আজ ঘরে ফিরবে। নিজের কাছেই নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর চরিত্রানুযায়ী এ তো জানা কথাই, রেজা কামিন খাদে পড়েছে দেখে এমন সব রকম-সকম করবে যাতে মনে হবে চিরদিনের অতি ভালো মানুষটি সে। জগতের কোন পাপ ব্যাপারের মধ্যে নেই। কিচ্ছুটি জানে না।

অবশেষে মিশির তার প্রত্যহকার চালটা ছাড়ল। বললে, শুধু আমাকে শুনোসে কি হবে? সাহাবকোভী এক ম: তোয়া বল্‌। তবে তো মিলবে কাম-কাজ, যা চাস। মালিক হুকুম না করলে, বান্দা কি করবে? নিতান্ত হাল্‌কাভাবে কথাগুলো বলে সে যেন এবার জরুরী কোন কাজে মন সংযোগ করবে, দাওয়ার সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল।

লাছলীর সারা অন্তর প্রদেশ কি এইদণ্ডে মুহূর্তের তরে টিপ-টিপিয়ে নেয়? একদিন রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। আজো ভোলে নি সেই আজব স্বপ্নটার কথা। কিম্ভূত একটা জানোয়ার

উন্মত্ত লালসায় ধেয়ে আসছে তার পিছু-পিছু। ধরতে পারছে না তাকে, তবু মরণপণ দৌড়চ্ছে। হাত পায়ের লোম সব খাড়া হয়ে ওঠে তার। মিশির যে ভাবে ক'কদম পিছিয়ে গেল, বনের মানুষ তারা, শিকারী জানোয়ারের কায়দা-কানুন জানে—শিকার ধরবার প্রাক্‌ক্ষণে ল্যাজ মুড়ে মুড়ে ওইভাবেই কয়েক পা পিছিয়ে যাবে আক্রমণকারী, আর রয়ে রয়ে তাক্ করবে। তারপর এক সময় প্রলয়ংকর বিস্ফোরণটা ঘটবে—স্বপ্নে দেখা ভয়ংকর জানোয়ারটা হিংস্র বন্য দৃষ্টিতে তার দিকে আড়ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। আশ্চর্য, তবু লাছলীর পা উঠল না পালাতে। কোন্ এক অদৃশ্য টানে যেন আজ আট্‌কা পড়ে গেছে।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধোলো, এই সাদা ব্যাপারটো কী সাহাবকে পুছতে হবে?

মিশির খিঁচোল, তবে?

—কেনে, তু ত মোদির মারাং বাবু। তু বুললেই ত হওয়ার কথা।

—উনোনে যে সাহাব। মারাং বাবুরও বাবু।

—বেশ চল্ তবে। এবার সে যেন এক কথাতেই রাজি। আর কোন জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন নেই।

বাওয়ানী মেয়ের এত সহজে রাজি হওয়া দেখে তখন আবার মিশির পিছোয়। কোথায় ভেবেছিল, এই লেজের খেলাতে আরো খানিকটা নক্‌রা করা চলবে। তাইতে বাওয়ানী ফণা মাজা ভেঙে লুটিয়ে পড়বে পায়ের তলায়। এখন এক কথাতেই যেতে স্বীকার হওয়া মানে, তার সব ফন্দি-ফিকিরের ইতি। এতদিন এই মন্ত্রণার ছকেই তো সমুদয় জাদানবাসিকে হাতের মুঠোয় এনে থামিয়েছে মিশির। ব্যাপার হয়তো কিছুই নয় অকারণ এমন একটা গুরুত্ব আরোপ করে রাখে, যাতে মনে হয় সত্যি বুঝি বিরাট কোন ব্যাপার। ম্যানেজার সাহেবকেও করে রেখেছে কল্পলোকের দেবতা

স্বরূপ। সাধারণ মানুষ সেখানে চট্ করে পৌঁছতে পারে না। একটা ত্রাস রচিত হয়ে আছে।

এইসময় একদিনকার কথা লাছলীর মনে পড়লে, মিশিরেরও স্মরণ হবে। বাকেটভ্যানের মাল খালাস না করে হাসনা উঠে এসেছিল একটা টিলার ওপর। বাওয়ানী যুবতীর হাত ধরতে গিয়েছিল মিশির। হাসকুটে সেই মেয়ের চেহারা মুহূর্তে বদলে ভরাবর্ষার-নদীর রণরঙ্গিণী রূপ হয়েছিল। কোমরের ভাঁজ থেকে বের করে এনেছে খুনিয়া। মাঝ দুপুরের সূর্যের আলোয় চমকেছে বাওয়ানী হাতে সেই অস্ত্রের ফলা। হাত তুলে সে উদ্ধত গর্বিত ভঙ্গিতে বলেছিল, হট্ যা হিঁয়াসে। মিশির আর দাঁড়াতে পারে নি।

কিন্তু লাছলীকে যে এখন কোনমতেই দুম করে সাহেবের কাছে যেতে দেওয়া যায় না। অনেকদিনের সাধনা তার, একটুখানি পরখ করবে খাঁটি বাওয়ানী যৌবন কার নাম? লাছলীর মতো এমন ভরা শরীরের মেয়ে আর ক'জন আছে এই তামাম গ্রাম গৌহদ্দির মধ্যে?

মিশির সহজ হেসে ডাকল, টুকুন বসবি না হামার ঘরে?

লাছলী তাড়া দিল, সি পিছে হবেক'খন।

এই কুঠিবাড়ি বাইরে কোথাও হলে, এই মুহূর্তে মিশির কি করত সেই জানে। কিন্তু এখানে বেশী সোরগাল করা ঠিক নয়। বিশেষত এই নিস্তব্ধ রাত্রিবেলায়। ম্যানেজার সাহেব হয়তো এখুনি বেরিয়ে আসবেন কম্পাউণ্ডের বাইরে। আর অমনি দেখতে পাবেন ফুল দেব অর্ঘে প্রথমে উৎসর্গীকৃত না হয়ে অস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাওয়ানী মেয়েকে কোন বিশ্বাস নেই, কখন কোন্ খেয়ালে আছে। বিষধরীর আটন সর্বাঙ্গে। চেঁচিয়ে ফুঁড়ে এখুনি হয়তো দুনিয়া মাৎ করে তুলল। তাই লাছলী যতক্ষণ গুম খাওয়া ছিল, কিঞ্চিৎ ভরসা ছিল। এখন টিপেটিপে হাসছে—

বাওয়ানী মেয়ের ওই হাসিকে চিনে চিনে এখন মিশিরনাথেরা রীতিমতো সমীহ করে। অনেকদিনের অনেক অভিজ্ঞতা রক্ত-লেখায় তাদের বুকে গাঁথা হয়ে আছে।

আকাশে বছর শেষের মেঘের গতি সঞ্চরণ শুরু হয়েছে। তাই আলো-আলো অন্ধকার মাটিতে। সেই আলোয় স্বচ্ছ নয় মিশিরের মুখ, চোখের তারা।

কিন্তু লাছলী কি জানে না, সরীসৃপের গর্তে সে সাধ করে প্রবেশ করতে চাইছে! অনেক সাপ আছে, সাপই তাদের খাদ্য। লাছলীও সাপিনী মেয়ে, কিন্তু ম্যানেজার সাহেব আরো বড় সাপ। মিশিরের মতো মানুষ পর্যন্ত যে লোককে গুরু বলে মানে। রাতের ম্যানেজার সাহেব সম্বন্ধে বহু গল্প-কথাই ছড়িয়ে আছে সারা বাঁধরেকা চত্বরে। সম্ভবত লাছলীরও সে-সব অজানা নয়। লাছলীকে এখনো দ্বিধাহীন দেখে, মিশির খুবই অবাক হয়ে গেল। অগত্যা বললে, বেশ, চল্ তবে।

দুরুদুরু বক্ষে লাছলী এগুলো তার পিছু-পিছু।

তারপর শুরুটা হয়েছিল যথানিয়মেই। পথে যেমন শিখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মিশিরনাথ। ঘরে পাওয়া গেল না ম্যানেজার সাহেবকে। পরে পিছনের বাগানে গিয়ে দেখা মিলল। ডেক-চেয়ারে এলিয়ে শুয়েছিল সাহেব। লাছলী বলেছে, নমস্তে সাহাব মালিক। সাহেব চোখ তুলল। তারপর আলস্য ভেঙে সিধে হয়ে বসল। লাছলীর বুক বুঝি লহমার তরে দুরদুরিয়ে বেজে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সব জেনে-শুনে-বুঝেই, সে এই পথে পা বাড়িয়েছে। মিশির আগমনের হেতুটা ঝট্‌তি বাত্‌লে গিয়েছিল। সাহেব লাছলীর দিকে ফিরে এক কথাতেই ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে, এ আর এমন কি কথা! ঠিক আছে, কাল থেকেই ও যেন কাজ লেগে যায়। চাকরি হয়ে গেল।

জাদান মেয়ের চোখ অশ্রুতে ভারী হয়ে উঠেছিল। মানজার

সাহেব এত উদার! অথচ এই লোকটি সম্বন্ধে কি খারাপ ধারণাই না তাদের হয়ে রয়েছিল। সে আবেগ থামাতে সহসা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, জাদান মান্‌ষের আজ আর কি আছিক? মোরা যি বড্ড গরীব গ সাব্‌, নোকরী লাই থাকলি বাঁচব কি ছে?

এরপর ম্যানেজার সাহেব এগিয়ে এসেছিল। লনের জাফরীর ওপারে ঘন অন্ধকার আর শব্দহীনতা। কয়েকটা অক্লান্ত ঝিঁঝি তখনো কেবল তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ রাখতে ঝুমঝুম আওয়াজে ডাকছিল। সাহেব তার পিঠে হাত রাখল।—ভাবিস কেন? তোদের দেশ-জেরাত-গাঁ, তোদের নোকরী কখনো ছুট্ হতে পারে? আমরা তো ছু'দিনের পীর। আজ আছি, কাল নেই। তোরা আগেও ছিলি, থাকবিও।

লাছলীর দৃষ্টি আরো ঝাপসা হয়ে যায়। তাদের মাওসী জাদান ঘর। অ।ঙ্গ নিজ ঘরেই তারা পরবাসী। অপরের মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে আছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করে, আর কিছু বলবি?

লাছলী মাথা নাড়ে।—না, এতেই সে কৃত-কৃতার্থ। হাসনার ছুটে যাওয়া কাজ আবার হল, অতিরিক্ত আর কিছু সে চায় না। পরে স্মিত এক ঝলক হাসে, তুয়ার দেয়াইনের হিরালা লাই গ সাহাব। তোর করুণার তুলনা হয় না। জোয়াইলে! বহোত সুক্রিয়া।

সাহেব তার দিকে এক পেয়ালা মদ এগিয়ে ধরল—একটু নেশা করবি তো এখন? নে, খা।

বাওয়া জীবনে মদ্যপান স্বাভাবিক ঘটনা। চরম সংকট ও আনন্দের ক্ষণগুলোকে তারা মদের তরল ধারায় গেঁথে তোলে—যে প্রবাহ নিয়ে তুহিনার চিরকালীন চলন। মৃত্তিকার রসে রসে শিলাস্তূপের কথা কওয়াকয়ি।

লাছলী প্রসারিত হাতে পাত্র ধরে। পাত্র শেষ হলে সাহেব

শুধোয়, আরেকটু দেব? লাছলী লাজুক হাসে। বাওয়া সন্তানের এক দু' পেয়ালা মদে কি হবে, তারা খায় হাম্ড়ি হাম্ড়ি। সাহেব পাত্র ভরে দেয়। বলে, নে, যত পারিস খা। লজ্জা করিস না। লাছলীর তবু লজ্জা যায় না। দ্বিতীয় দফার পানীয় শেষ করে গ্লাস নামিয়ে রাখে। বলে, আর লাই গ। আর খাব লাই। সাহেব হাসে, কেন? লাছলী কথা কয় না। সাহেব এবারে জিজ্ঞাসা করে, হাসনা কি তোর হেরেল? লাছলী চুপ। অর্থ পরিষ্কার। সাহেব তখন ঠোঁট উল্‌টে ফের হাসে, ওহো বুঝেছি, দুল্‌হা বুঝি। আশিক ঔর মাসুক।

এই ভয়াল পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়েও লাছলী একটুক্ষণের জন্য বুঝি কেমন উন্মনা হল। সহসা তার মুখমণ্ডল বর্ণ-কুঙ্কুম দেখাল। মদির না হেসেও যেন পারল না। যুবতী গহীন হৃদয় তার এমনিতেই উচাটন, সেখানে প্রেমের কথা বেজেছে। সে কিচ্‌ড়ি-প্রান্তে মুখ চেপে কৌতুক ভরা দৃষ্টি ঘোরাল।

সাহেব এখন নাড়াচাড়া খেয়ে হঠাৎ বড় বেশী আন্তরিক হয়ে উঠল। চুকচুক শব্দ করল জিহ্বায়। তারপর উঠে এল একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে। এইবার বুঝি কালো কষ্টিপাথরের রঙ ধরবে মানজার-মালিক। হাসি তাই চৌদুনে উঠল।

কি বুঝে লাছলী তাড়াতাড়ি বললে, এবার যাই তবে।

সাহেব ওর মাথায় হাত রাখল। তারপর চকিতে এক সময় ওকে জড়িয়ে ধরে ওর পাত্‌লা ঠোঁটে পটপট করে কয়েকটা চুমো বসিয়ে দিল। ক্রমে তারপর সেই জোয়ার ঠোঁট থেকে গণ্ডে, চুলে, কপালে, বক্ষে বিস্তার লাভ করল। পরে, সমস্ত শরীরটাকে নিয়েই যেন ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ করে দিল।

এই আকস্মিকতায় লাছলী প্রথমে দিশাহারা হল। পরে নেশার ভাবটা কেটে যেতেই ফালা ফালা হাসি থামিয়ে সচকিত হয়। কিন্তু কোন সুবিধা করার আগেই সাহেব আরেক কাণ্ড করল। ফস্

করে একটানে তার পরিহিত দেহবাসখানা খুলে দিল। আর পলকে লাছলী একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ে।

হাপালো দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যৌবন সরোবরের আদিম উচ্ছ্বাস। এখন আবরণের ঘেরাটোপ মুক্ত হয়ে সেই উচ্ছ্বাস দুর্নিবার চেহারা নিয়েছে। সরু কটিতটের নিচে সুপুষ্ট নিম্নাঙ্গ। তুহিনার বঙ্কিম খণ্ডস্রোত যেন বহমান সেখানে।

লাছলীর আদিম সেই রূপের দিকে তাকিয়ে থেকে ম্যানেজার সাহেবের চোখের পলক যেন আর পড়ে না। হাসল। শক্ত পাথরের গায়ে লোহার ছেনী ঠুকবার আওয়াজ হল যেন। চোখে রাশি রাশি আগুনের হল্‌কা। ক্ষুধিত লোলুপ বাহুতে আরো পিষ্ট করতে চাইল তাকে। লাছলী অসংবৃত অঙ্গবাস আঁকড়ে ধরে নিজেকে আবরিত করতে চেষ্টা করল। পরে আর্তকণ্ঠে চেঁচাল, হেই গ, সাহেব। মো কিন্তুন বা[illegible]য়ানী বিইং (সাপ)। ছাড়্যে দে গ। কিন্তু সন্দীপ রায়কে তখন থামাবে কে? আবারো সাহেব হেসে উঠে ফের কাছে টানতে চেষ্টা করল তাকে। চোখ জ্বলছে আগুনের শিখার মতো। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। একটা মত্ত প্রলয় না ঘটিয়ে থামবে না।

ক্ষণিক থমকানো মুহূর্ত! লাছলী তখন আক্ষরিক অর্থেই বাওয়ানী লাবু। বনভূমির সচল-লতাদের ফোঁসানী জেগেছে নিঃশ্বাসে। চোখের চাহনিতে খুনিয়ার ঝলকানি। ধারালো দু'পাটি দাঁতে সহসা সাহেবের সুঠাম কব্জির ওপর হুল ফুটিয়ে [illegible]তি খোঁচায় একখণ্ড কাঁচা মাংস তুলে নিল।

কান ফাটা বিকট চিৎকারে রক্তাক্ত সাহেব তাকে ছেড়ে দিয়ে ধুপ্‌ করে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। পড়ে, ছটফট করে কাতরাতে থাকল। তখন আরো হতচকিত হল লাছলী।

পরে ঘোর কাটলে তাড়াতাড়ি সামলে উঠে নিজেকে বসনাবৃত করল। একবার দেখল সাহেবকে। তারপর প্রস্থানোদ্যত হল।

এমন সময়, সাহেবের আকস্মিক চিৎকারে মনোযোগী হয়ে,

দরজা আগলে দাঁড়ায় এসে মিশিরনাথ।—হায় রাম! ই ক্যায়া? খুন করে ফেল্‌লি নাকি?

রাত পেঁচার কণ্ঠের ত্বরগুম ত্বরগুম আওয়াজ তুলে হাসল লাছলী।—হল আর কই? বলে টলতে টলতে এগিয়ে এল দরজার দিকে। ঘামে সমস্ত মুখ তার ভিজে উঠেছে, যেন এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে।—পথ ছাড়। ইয়াদ লিস, মো বাওয়া বিইং—। বলে আর অপেক্ষা না করে এক ধাক্কায় মিশিরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

· এই আদিবাসী মেয়েগুলোকে মিশির আজো ঠিক চিনে উঠতে পারল না। কিছু নেই, তবু কি এদের অহংকার! আর কখন যে ক্ষিপ্ত হয়ে বিষের জ্বালায় জ্বলে উঠবে, সম্ভবতঃ ঈশ্বরও জানেন না। অথচ যখন আছে, বেশ ভালোই আছে। হাসি-মস্করা, রঙ্গ-তামাশায় মশগুল হয়েই আছে। তারপরই এক সময় একবারে ভিন্ন রূপ। দ্বিতীয়ত, অসভ্য দরিদ্র বাওয়া পুরুষদের মধ্যে যে ওরা কি পায় ওরাই জানে। কিছুতেই তাদেরকে ছাড়বে না। আগে তবু কিছুটা ঝুঁকত হয়তো, এখন সে-রঙ প্রায় সকলেরই চোখ থেকে মুছে গিয়েছে। মিশিরদেরও আর তাই তেমন পাত্তা নেই কারো কাছে। অথচ পয়সার লোভটা যে ঠিক গেছে, তা-ও নয়। তবু ভিড়বে না। এইতে কখনো কখনো নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করে মিশির। মাথা গরম হয়ে উঠে। অর্ধোলঙ্গ মানুষগুলো হল কি না তাদের চেয়েও খাতিরের জন। আর তারা হল গিয়ে ফেল্‌না!

মিশির পিছনে দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হাসনার নোকরী নিবি না?

—ঝাড়ু মারি তুয়ার নোকরীর মুখে। সেতার ঝাড় কুথাকার। লাছলী ঝমঝমিয়ে বাজল।

মিশিরের কালচে মাড়িতে হলুদ দাঁতের বিচিত্র রেখা আঁকা পড়ল।—ভেবে বলিস কথাগুলো।

কানের পিছনে অর্ধমরা কুকুরের কেঁউ কেঁউ ডাকটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না দেখে, লাছলী আবার ভ্রূকুঞ্চিত করল। দেখল, যেন মিশিরের দৃষ্টিও দগদগে ঘায়ের মতোই। তাড়াতাড়ি একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে এবারে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা টকাস করে গিয়ে মিশিরের মাথায় পড়ল।—কি রি আরাম পেলি? জঙ্গুলে হাসিতে দুলে উঠে, তারপর এক ড্যাবলা থুতু তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

ইটের টুকরোটা নিতান্ত ছোট নয়। বেশ জোরেই ব্যথা লাগে। মিশির নিজের মাথার তালু চেপে ধরে খিস্তি করল, শালী তুরে একদিন ঠিকই দেখে নিব।

লাছলী খুব হাসল।—দেখে লিবি? লে, কেনে। এই ত মো। বলে আবার এক খাবলা থুতু ফেলল তার উদ্দেশে।—এই নে খা। বাওয়ানী গুরু খেয়া তাকত্ বাড়া, তবে ত দেখবি। তারপর আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করে দিল।

এরপর কি করবে, কোথায় যাবে? তার নিজেরই কি আর নোকরী থাকবে? গিয়েছিল হাসনার নোকরীর ব্যবস্থা করতে, মধ্যে থেকে ফল হল, সে-ও এবার বেকার হবে। হাসনার নিষ্কর্মা জীবন দেখে কতই না আক্ষেপ করত। এখন ক্রমেই তার নিজের জীবনও দুঃসহ মনে হবে। কি পুরুষ, কি মেয়ে—বাওয়া সন্তান কখনো আলস্যের দিন যাপন করা পছন্দ করে না। আগে ক্ষেত খামার ছিল, বনের পশুপাখি মেরে দিব্যি কেটে যেত দিন—কালের প্রভাবে কবে থেকে যেন স্বভাব মেজাজ বদলে গেল দেহাতী জাদান মানওয়ার। বেড় পাড়ের নোকরীই এখন একমাত্র সম্বল। দিন গুজরানের পথও বটে।

বার বার চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে তার। নিজের

ওপরই তখন রাগ ধরে যায়, কি দরকার ছিল সাহেব কুঠিতে যাবার ? আর গেলই যদি, মনকে তো সে প্রস্তুত করেই গিয়েছিল কখনো অসংযমী হবে না—আরেকটু ধৈর্য কেন ধরতে পারল না ? হাসনাকে ভালোবাসার যে যুক্তিতে সাহেব কুঠিতে গিয়েছিল সে, সে-কাজও উদ্ধার হল না, মধ্যে থেকে আরো কেঁচে গেল পরিস্থিতি। ভালো-বাসার চেয়ে তার যৌবন, সতীত্ব বড় হল ? বরং ভালোবাসার খাতিরে সে যদি তার সতীত্ব দান করত, লজ্জার ছিল না কিছু। এখন নিজের কাজেই তাই লজ্জা রাখবার জায়গা নেই তার। ধিক্কারে মাথার চুল খানিকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। ঠাস ঠাস করে দুই গালে চড় মারল। যে দান মহান হত, সামান্য হটকারিতার ফলে, একূল-ওকূল দুকূল গেল।

এরপর সবই যাবে একে একে। সমস্ত দেশটাই কি হয়ে গেল ! সুখ দুঃখে গড়া ছিল জীবন। আনন্দ ছিল, আবার যন্ত্রণাও ছিল। সংসারে বাস করতে গেলে যেমন হওয়া উচিত। আজ সেখানে একপেশে ছবি। কেবল হারাবার দিকগুলোই চোখে পড়বে।—এ মেঘ কাটবে কবে ? তাব এই জিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর কোন দিনো দিতে পারে নি হাসনা, আজ তো আরো ধূসর হয়ে পড়ল দিকভূমি, এরপর ওই প্রশ্নের জবাবে কি বলবে সাগুি জোয়ান ?

রোজকার অভ্যাসে কখন বাঁধের দিকেই পা চলেছে।

জংলাকাটার খাড়ি পাড এবং পলাশ মিলনের ধাব ফেলে, 'নাই' তুহিনার স্রোত যেখানে সাঁকো খালের পথে বাঁক নিয়েছে, সাঁঝবেলার পর জল আনবার অছিলায় রোজই সেখানে গিয়ে হাজির হয় লাছলী। হাসনা অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করে। বেকার জীবন, বেলা থাকতেই জলের পাড়ে এসে বসে থাকে। তবে আজ প্রায় সপ্তাহ খানেক হতে চলল, মরদের পাত্তা নেই। কোথায় যে থাকে, কেউ কিছু জানে না। লাছলী একলাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর উঠে ঘরের পথে হাঁটা ধরে।

ওপাশে ধূসর-ছায়ার মেদুর বন চঞ্চল। শব্দটা যেন বাজছে ওইখানেই। আসলে প্রতিধ্বনি। শেষ রাত্রের দিকে হয়তো ঝড বৃষ্টি কিছু হবে। তাই আকাশের রঙে পীতাভ খয়েরীর ছোপ লাগতে শুরু করেছে। পশ্চিমা খ্যাপা হাওয়ার নাচুনি আরম্ভ হয়েছে পত্র পুষ্পকুঞ্জে। দুহিনার জলে তাথৈ দোলন।

বাঁধের চওড়া রাস্তা সোজা চলে গেছে পশ্চিম দিক বরাবর। ডাইনে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। জলের শেষ সীমান্ত দেখা যায় দূরের বনরেখা পর্যন্ত। একটা অনুচ্চ টিলা পাহাড় আছে বুঝি, তার বুক পর্যন্ত জলের স্তর ছড়ানো। কত গ্রাম যে এই জলের তলায় তলিয়ে গেল, লেখা-জোখা নেই। ভাগ্যিস বাওয়া পাড়া বাঁধের বাম দিকে পড়েছিল, নদী বাঁক ঘুরে এসে স্পিলওয়ে দরজায় পৌছেছে—ফটকের ওপারে সঞ্চিত হচ্ছে জলরাশি—নদীর তীর-লাগোয়া এদিকের নিরাপদ্‌. তাই রয়ে গেল। নদীর অবস্থা অবশ্য এখন আর আগের মতো নেই। তবু রঙ্গিণী নদীতে বাতাস উঠলে, এখনো বাওয়ানী মেয়ের পদঝঙ্কার বাজবে ঝমুর ঝুম।

এখান থেকে চাঁদের আলোয় ধোয়া নদীটা দেখাচ্ছে সুন্দর। যেন একলাছি গুলিসুতো ছড়ানো রয়েছে। রুপোলী রঙের সুতোটা পাক্ খেয়েছে দূরের বনভূমি ধরেও। ম্লান আলোয় রুপোলী রঙের গায়ে আবার ভিন্ন বর্ণের বাহার পড়ছে। তাইতে রুপোঁ রঙের আরেক চমক জ্বলছে এখন। ওদিকে গুটিগুটি হাওয়ায় বনটা যেন ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। লম্বা ছায়া পড়েছে কালচে মাটির ঢালে। ছায়াটা আরো ছড়াতে পারলে অচিরেই জলের সীমানায় পৌছে যাবে। এখান থেকে নিচের ছবিটা আরেক কারণেও সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর তীর ধরে একটা রাস্তা আছে, রাস্তাটা অবশ্য শেষে খাড়াই একটা উচ্চতা ও পাক্‌দণ্ডী সৃষ্টি করে এসে মিশেছে এই বাঁধের সঙ্গেই। কিন্তু এখানটায় দাঁড়ালে, ওপরে-নিচে সমান্তরাল দুই রাস্তা মনে হয় চলে গেছে দূর ধূসর দিগন্তের দিকে।

ওপরে বাঁধের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যেন নজরে পেল তাকে। লাছলী এক পলক থমকে দাঁড়াল। নিচে নদীর কিনারায় বিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে কে একজন মানুষ দূর বনপথের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রয়েছে। বুক তার এইদণ্ডে কিছু অশান্ত হয়। কতদিন দেখা হয় নি দু'জনার। কতদিন পর লাছলী আজ হাসনাকে দেখতে পেল। রাত্রির ছায়াময় আলো, তারপর আবার দূর অনেকখানি হওয়াতে, মুখ স্পষ্ট নয় ভাবুক দর্শকের। তবু চিনতে কষ্ট হয় না লাছলীর। ওই বসার ভঙ্গিটুকুই যথেষ্ট। ওই মানুষের অবয়বের সামান্যতম প্রতিচ্ছায়া দেখেই লাছলী বলে দিতে পারবে ওর পরিচয়। একটু বুঝি শীর্ণ মনে হল তার মুখমণ্ডল। আচ্ছা, হাসনার সংস্রব হারিয়ে সে যেমন মরমে মরেছিল, হাসনার মানসিক অবস্থাও কি তেমনি হয়েছিল? নিভৃত বেদনায় গুমসে গুমসে সারা হয়েছে? কতদিন হাসনার কল্লোলিত-কণ্ঠের কথা শোনে নি। কতদিন, কতকাল, কে বলতে পারবে? অতঃপর লাছলী যেন আর কিছুই স্পষ্ট ভাবতে পারছে না। কেবল নিদারুণ একটা অপ্রাপ্যতাবোধের জ্বলুনিতে ভিতরে ভিতরে দগ্ধে সারা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল।

বাঁধের ঢালু পাড় ধরে থরে থরে পাথর সাজানো। নিচে নামার রাস্তা কিছুটা দূর এখান থেকে। আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখে। তারপর একটা টিলার কোল ধরে উৎরাই পথে নামো। লাছলী একটু দাঁড়াল। অন্যমনস্কভাবে কি যেন এক ঝলক ভাবল। তারপরই আর দেখাদেখি নেই। সেই ক্রম-নিম্নমুখী পাথরের থাক বেয়ে দ্রুত ধেয়ে নামতে আরম্ভ করল।

বিপজ্জনক কাজ। মসৃণ পাথরের পিঠ, মাঝে মাঝে আবার দুই পাথরের মাঝের স্থান ভালোভাবে ভরাট হয় নি—তাইতে খন্দ, গর্ত সৃষ্টি হয়ে আছে—মুহুর্মুহু পা পিছলে-পিছলে যায়, অথবা

হোঁচট খাওয়ার মতো হয়—লাছলী সেদিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করে রাশ ছুটিয়ে গতিকে আরো দ্রুততর করল।

তারপর একদমেই অনেকটা নিচে নেমে এল। আর সামান্য পথ সমতলের দূরত্ব। আগে এখানে অসংখ্য কুল-পলাশের বন ছিল। 'লা' অর্থাৎ লাক্ষার চাষ হতো। কতদিন এই নির্জন বন-ভূমে এসে বসেছে তারা, সে আর হাসনা। বসে চোখের জলে ধরিত্রী ভিজিয়ে। দৌড়তে দৌড়তেই সে-কথা মনে পড়ে বুকের থমকানো কান্নাটা আবার ঈষৎ যেন প্রমত্ত হয়। সেইসঙ্গে আছে মানসিক উত্তেজনার চাপ। সহসা পদক্ষেপ একটা পিছলে গেছে বুঝি, লাছলী ধেয়ে নেমে চলল। শেষে আর বুঝি সামলে উঠতে পারে না, বাঁধতে পারে না গতির রাশকে—হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। তারপর ঢালু পথে গডাতে আরম্ভ করল। ভাগ্যিস, অনেকটা নেমে আসার পর দুর্ঘটনাটা ঘটল, নইলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না বাওয়ানী মেয়েকে।

ছিট্‌কে পড়বার সময় বোধহয় একটা ডাক ওঠে তার আর্ত গলা চিরে, তাইতে দূরের মানুষটা চটকা ভেঙে এক পলক চোখ তুলে দেখে। সন্ধ্যার ঘন রেখার টানে ঝাপসা দিগন্ত। কয়েকটা জড়াজড়ি বাঁধা গাছের ঝুপসি ছায়া পড়ে ওখানটাতে আরো বিশেষ করে আঁধার জমাট রূপ নিয়েছে। তবু একজন কাউকে উল্‌টে পড়ে যেতে ঠিকই দেখতে পায় দূরের দর্শক। অতঃপর কালবিলম্ব না করে তড়াসে ছুটে আসে সে অকুস্থলে।

পৌঁছে, আহতের সেবা করতে গিয়েই এবারে চক্ষুস্থির হয়ে পড়ে।—হাই, আয়ু গ! ই-যি লাছলী। সে তাড়াতাড়ি নিজের পরিধেয় কুর্তাটা খুলে ফেলে লাছলীর ক্ষতস্থান মুছিয়ে দিল। চোট তেমন গুরুতর নয়, তবু হাত-পা-মুখের অনেক জায়গাই ছড়ে গিয়েছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরুচ্ছে খালি। গ্রাম লালকুঁয়ো এখন বিকাল শেষেই বিজলী বাতির শোভায় মনোহর রূপ ধরে। এদিকটা

গ্রামের বাইরে ব'লে এবং বাঁধ সীমানার এক টেরে হওয়ায় বিজলী বাতির কোন খুঁটি নেই। অল্প দূরে রাস্তার একটা বাঁকের মুখেই শেষ খুঁটিটা এখান থেকে দেখা যায়। হাসনা অপলকে আরেকবার লাছলীর মুখের দিকে দেখল। কতদিন দেখা হয় নি তাদের দুজনার। কত যুগ। শেষে যেদিন বা আবার দেখা হল, এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে। এ কথা ভেবে হাসনা খুবই বিহ্বল হল।

লাছলীর জীবনে এই ধরনের আকস্মিক বিপদ যেন অহরহ লেগেই আছে। এ যেন তার নিয়তির একটা লেখা। সব ভুলে দৃঢ় আবেষ্টনে হাসনা এবার জড়িয়ে ধরল লাছলীকে।—ই রকুম হয় কেনে তুয়ার ক্ষেপে ক্ষেপে। কেমুন লাগছিক আখুন? দেখ্ গ চেয়ে। মো এয়াচি গ। কে বটিস মো, দেখ্ গ। বহু যত্নে আবার তার ক্ষতস্থান মুছিয়ে দিল হাসনা। লাছলীর ছড়ে যাওয়া মুখ-চোয়ালের রক্তে হাত তার মাখামাখি হয়ে গেল।

ঠিক অজ্ঞান হয় নি লাছলী। একটা মুমূর্ষু অবস্থা যাকে বলে। তার দুই চোখের কোল অশ্রুধারায় ভিজে উঠল। তারপর সেই জল টসটসিয়ে গড়িয়ে পড়ল গাল-গণ্ড বেয়ে। পরে খুব অনুচ্চ এক সময় বললে, এতদিনে সোময় হল, হঁ? এতদিনে ফিরবার কাথাটো মনে পড়ল সাঙি জোয়ানের?

হাসনা চুপ। সে একই মতো ঝুঁকে থাকে লাছলীর বুকের ওপর।

লাছলীব বক্ষ বুঝি এসময় আলিঙ্গনের তৃপ্তি সুখে কানায় কানায় ভরে ওঠে। সে তো যাচ্ছিল হাসনার কাছেই। পথে এই বিপদ ঘটল। তবু একেবারে ব্যর্থ হয় নি তার অভিসার পব। হাসনা এখনো নিকট আত্মীয়তার বন্ধনে তাকে বেঁধে রেখেছে। লাছলী এ সুখ রাখবে কোথায়? বিশীর্ণ মুখ তার পরিতৃপ্ত হাসির আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কষ্ট পীড়িত দুই হাত তুলে হাসনার গ্রীবা বেষ্টন করল। সে যে দীর্ঘ দিন ধরে অনেক নিদ্রিত বাসনার

জ্বালায় পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে। লাছলী হঠাৎ কেঁদে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে ডাকল, হাসনা, হাসনা। তারপর বললে, মোর ভী আর নোকরী লাই, বেকার হয়্যা যেছি রি।

—হয়েছিস ? ঠিক আছিক। যা আছিক কপালে, হবেক।

সকল মান-অভিমানের পালা এইবার এতদিনে সাঙ্গ। এতদিন ত্বই হৃদয় যে বেদনায় আছড়েছে, সামনা-সামনি হতে পারে নি, মুহূর্তের মধ্যে সেই দুই ভিন্নমুখী স্রোত এক হয়ে মিশে গেল।

হাসনা এবার জিজ্ঞাসা করলে, খুব ব্যথা পেছিস ? লাগছিক খুব ?

লাছলী যেন রহস্যময় হাসল তার জবাবে, তু পাশে থাকলি কুনো ব্যথা কি মোর ব্যথা মনে লেয়, জানিস লাই বুঝিন ?

চেলে উল্, চেলে উল্! নোকরী যাবার পর থেকে এ অনুভূতি তার একেবারেই মরে গিয়েছিল বুঝি, আবার বহুদিন পর বুকের সমগ্র প্রদেশ জুড়ে হুড়হুড় করে আলোড়নটা বেজে যায়। মুখে চট্ করে কোন কথা যোগায় না। তারপরই থমথমে ভাবনায় ভিন্ন প্রসঙ্গের কিছু কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ঈষৎ চঞ্চল হল। ত্রস্ত চারিদিকে একবার দেখে নিল। অতঃপর লাছলীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলল, কুনো আবডালে যাবি ? চল্ তবে।

লাছলী এবার সরাসরি চোখের ওপরেই হাসল।—কেনে, আবডালে যাব কেনে ?

—হঁ, চল্ না।

—আখুন আবডালে যেতে চেছিস কেনে ? এত্না রোজ মনে ছিল লাই ? গোসা মেনেছিলিস যি বড়!

হাসনা আবার চারিপাশ দেখল। না, এই খোলা প্রান্তরে অন্ধকার মাথায় করে তাদের দেখতে দূর-নিকটেও কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই। তবু তার জড়তা ভাবটা যেতে চায় না। বুকের

বালি ক্রমেই যেন সরে সরে যাচ্ছে। বলল, ভাবনা হয়, কে আবার কুথা ত্থে দেখে লিবে। তারপর—।

লাছলী তার হাত ধরল। হাত কাঁপছে থরথরিয়ে। ঠাণ্ডা যেন শিল পাথর। ওহো, তবে যা ভেবেছিল, হাসনা বুঝি তা মনে করে কথাটা বলে নি। তাকে নিয়ে কোন চার দেওয়ালের ঘেরার ভিতর যাওয়ার কথা ভাবে নি।

সোনারঙ দিগন্ত তামস অন্ধকারে বর্ণ বিধুর। বিহারী রেজা পট্টিতে দিওঃানা একজন লোক আছে সুন্দর বাঁশী বাজায়। মিষ্টি সুরের তরঙ্গ দিক হতে দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। এমনি বিশেষ বিশেষ দিনে, পাড়াঘর যেদিন কোলাহল বিহীন নিঝুম নিস্তরঙ্গ থাকে—সে ওই ম্লান অস্ফুট স্বরে বাঁশী বাজায়। আজও সম্ভবত ধরেছে। ছন্দঘন মিষ্টি একটা সুর যেন বাতাসের দোলায় দোলায় বিলম্বিত লয়ে বহুদূর বনানী পথ থেকে ভেসে আসতে থাকল।

লাছলী হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, এত্তরোজ মো কি ভাবে ছিলম, সি কাথাটো একুবার ভেবে দেখল কেউ? যার-যার নিজেরটাই ত কেবল ভাবাভাবি।

এই কথা যদি লাছলী বলবে, হাসনার দৃষ্টি সহসা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।—উ কাথা বুলিস কেনে গ?

—ঠিকই কাথা ত।

হাসনা অতঃপর সান্ত্বনা দেয়।—হাই. কান্দিস লাই গ। বঙ্গার কিরা।

অভিমানে লাছলীর স্বর বুজে যায়।—লাই, কাঁদবে লাই! হাসবেক।

শিশু, আমলকি বৃক্ষের ছায়া-ঘন অন্ধকারে চিরন্তন মানব-মানবী বদ্ধ-মুখ অপলকে চেয়ে থাবে৷। সীমাহীন অরণ্য প্রান্তরের একটেরে বসে ক্রমে তারা কঁকিয়ে ওঠে। তাদের অদৃষ্টের সড়ক দূরের কোন্ বাঁকে মিশে গেল? রাতের আকাশ কি এখন মেঘে মেঘে ধূসর

মলিন? বাতাস উঠেছে নদী তীরের মহুয়া বনে। এই ঝড়ো ঝাপটানি তাদের জীবনকেও বুঝি ছারখার করে দেবে। তারা ত্রস্ত, শংকিত হয়।

লাছলী গোঙায়, কি হবেক, ই মারং হয়েদা কী কাটবে লাই, গ? এ তুফান কি থামবে না?

হাসনা আকাশ দেখে। হয়তো কিছুটা মেঘের আভাস আছে। তাইতে একটা ঈষৎ থলো অন্ধকার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সে নির্বিকার থাকে।

লাছলী বলে, ভিজব। আসুক কেনে দাঃ, বৃষ্টি। ভিজব। অনেকদিন ভিজি লাই।

—কিন্তুক মো ভাবি, ই রিমিল রবেক লাই, রি। উত্তরের হাওয়ায় কাট্যে যাবেক শিগগীরি।

- যাবেক?

হাসনার গলা হঠাৎ খাদে নেমে যায়। মোরা ত কুনো কাই করি লাই, হঁ। দুলাড় কি কুনো বাড়িইঃ কাম? পাপ করি নি। ভালবাসা অসৎ কাজ? মো কছি, লিচ্চয় কাট্যে যাবেক।

আগে আগে এবম্বিধ প্রসঙ্গ উঠলে জ্বলে উঠত হাসনা। ঝেঁজে-দাপিয়ে একশা করত। ইদানীং কি হয়েছে, অদ্ভুত এক কান্নার সুরে কথা বলে সে। আর বলেও খুব অনুচ্চ। মাথা ঝুলে পড়ে তখন নিচে। চোখ দুটো দেখায় যেন মরা গরুর। ভাষাহীন, স্তিমিত।

লাছলী তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলল, হঁ, মো ভী ভাবি তাই গ। লিচ্চয় মিট্যে যাবেক ইসব ঝঞ্ঝা। বঙ্গা কাঁড়া লয়। বাঙ্গ-আঙ্গে মরা লয়। দেবতা অন্ধ নয়, কালা নয়।

হাসনা অমনি যেন আর পট্টির জোয়ান মরদ নয়। বাওয়া পুরুষেরা কেউ চোখের জল ফেলে না, শত দুঃখ-বেদনা পেলেও কাঁদে নয়। জোয়ান ছোকরা হয়ে হাসনার গণ্ড প্লাবিত হয়ে অশ্রুধারা গড়াতে থাকে।

তখন লাছলীরও কেমন কান্না পেয়ে যায়।—তু কাঁন্দিস গ? সে বলে।

—দূর! হাসনা হাসতে চেষ্টা করে।

লাছলী আপন হস্তে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আবার বলে, তবে আঁশু গড়ায় কেনে, হাঁদে?

লাছলীর ঘন নিঃশ্বাস বাতাসের সঙ্গে আবর্তিত হয়ে ধ্বনিত হয় খোলা প্রান্তরে। এবার সে নিজেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। হাসনার মুখ স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টি, উদাস বসে থাকে। তাদের পুরোনো জিজ্ঞাসা আবার তুরন্ত গতিধারা নিয়ে ঘুলিয়ে উঠবে, এসব বুঝি তারই প্রস্তুতি পাট।

আলিঙ্গনাবদ্ধ হাসনা প্রহর গোনে। অনুভব করে লাছলীর সুপুষ্ট শরীরের ওঠা-নামা। অবশেষে শুনতে পায় প্রত্যাশিত ক্লান্তি-জড়িমা কণ্ঠস্বর।—আর তিস মাহা? কতোদিন?

এই ত্থাখ! আবার সেই নবম প্রদেশ পা দাবিয়ে দিয়েছে লাছলী। যে কথা বিশেষ করে ভুলে থাকতে চায় বাওয়া সাঁওি জোয়ান, বাওয়ানী মাওকি সেখানেই বসিয়েছে তার বুনো পায়ের দলন। সে প্রায় আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, হেই, চুপো যা। উ কথা মনে লিস লাই গ। যা হবার হবেক। নসীবে যা লিখন আছক, ফলবেক।

বহু পুরাতন জিজ্ঞাসায় তুই বক্ষ ফাটো ফাটো হবে ওই প্রসঙ্গে। এ জিজ্ঞাসার সরলীকরণ করা আজো তাদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। প্রশ্নটা উভয়ত। কোনদিন হাসনা করে, কোনদিন আবার লাছলী। আজ যেমন লাছলী করেছে, হাসনা কি জবাব দেবে এর?

লালকুঁয়োর গমগমে নিথর নিস্তব্ধতা যেন এবার ঘিরে ধরে তাদের চারিধার থেকে। তারা মৌন মুখে বসে থাকে প্রকৃতির নিঝুম আঙ্গিনাতলে। বনরাজ্যের রাতের আকাশ ঝুলন্ত, ঠিক পাড়ের নিচেই তুহিনার বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জল এবং মহাশূন্যতা

যেন একসঙ্গে দল বেঁধে চাঁদোয়ার মতো ধরে রেখেছে ওই আকাশটাকেই।

এমন সময় দু'জনেরই সহসা লক্ষ্য পড়ল, কে একটা লোক জল সাঁতরে সাঁতরে এপারের দিকেই আসছে। লোকটা জলের তোড়ে ডুবছে, ভাসছে। কিন্তু নিশানা ঠিক রেখেছে। এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। লোকটাকে চট্ করে চেনা গেল না। ভিজে চুলে চোখ-মুখ ঝাঁপানো। তারপর চাঁদটাও এখন আবার মেঘে ঢাকা পড়ায় আব্ছা অন্ধকার ঘনিয়েছে। তবে সরু সরু হাত পা দেখে মনে হল, নিশ্চয় কৃশকায় চেহারা আর বয়স্ক মানুষ।

লাছলী আর হাসনা তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দাঁড়াল নদীর তীরে। লোকটা সম্ভবত ভীষণ ক্লান্ত। হাত-পা খুবই অলসভাবে ছুঁড়ছে। যদি আগাগোড়া ওপারের গঞ্জ থেকে ভেসে এসে থাকে অবসন্ন হ[illegible]ই কথা। এবারে তারা ভাসমান লোকটিকে চিনতে পারল, আরে, এ যে দেখি হারুলোর বুড়ো আসছে!

হারুলোর হাত তুলে নাড়াল। লাছলী ও হাসনাও হাত তুলে নাচাল। রেজা মহল্লার কুলি ধাওড়া হাল্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেণ্ডী পাড়াতেও ভাটা লেগেছিল। কম মানুষ থাকলে, [illegible] রোজগার হবে! আর রোজগার কম হলে, বেচারিরা থাকেই বা কি করে? গ্রাসাচ্ছাদনের ওই তো একমাত্র রাস্তা। অতএব থোকে থোকে তারাও কেটে পড়তে আরম্ভ করেছিল। হারুলোর সেই রকম গোটা পাঁচ-ছয় মেয়ের দেহ-ব্যবসার দালাল হয়ে তাদের সঙ্গে একদিন দূর শহরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল। বয়েস হয়েছে, ভারী কাজ পারে না। অথচ বাঁধ রেকার কাজ যা বলো, সবই গতরে খাটার। সুতরাং রূপসী মেয়েদের খদ্দের জোটানোর হাল্কা কাজটা খুবই মনঃপূত হয়েছিল হারুলোরের। বেশ হৃষ্টচিত্তেই সে গাঁ-ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আজ তাকে পুনরায় জল সাঁতরে সাঁতরে ফিরতে দেখে লাছলী ও হাসনা যারপরনাই অবাক হল।

এখন হারুলোর ডাঙার কাছাকাছি এসে পড়েছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসতে শুরু করল। আনন্দ-উত্তেজনায় সে যেন একেবারে দিক্‌বিদিক হারা হয়ে উঠেছে। কোনদিকে চোখ ফেরবার সময় নেই। তারপর জল ছপছপিয়ে মূল ভূ-খণ্ডের ওপর উঠতে যাবে, একটা গড়ানে পাথরে হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে পারল না, লাট্টুর মতো পাক্ খেয়ে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল ফের সেই পিছন দিকেই—অল্প-অল্প জল-কাদায় থকথকে জমির ওপর।

তেমন লাগবার কথা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু উঠেই হারুলোর :যেন আবার ইচ্ছে করেই সেই কাদা প্যাচপ্যাচে মাটির ওপর গড়িয়ে শুয়ে পড়ল। খামচে সেই মাটির স্পর্শ নিল। খাব্‌লে খানিকটা মুখেও পুরল। দাঁতে কেটে অনুভবটা যেন আরো গভীর করে নেবার প্রয়াস।

হাসনা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলল। কিছুতেই ‑স উঠবে না, এপাশ-ওপাশ করে কাদা মাখতে লাগল। আর

‑-খামচা মাটি দাঁতে-জিবে ঘষবে।

[illegible] [illegible]—হুড়িং-আপুং কুথা থিক্যা গ ?

[illegible] মিশিরের উস্‌কানিতে কম কাণ্ড সে করে নি। পট্টির অনেক খাঁইদার রসবন্ত মেয়ের দালাল হয়েছিল। পুরুষ পাকড়ে দিত। প্রথমে হাত পাকিয়েছিল মিশিরের প্রয়োজনীয় যোগান দিয়ে। পরে এটা একটা লাভজনক ব্যবসা মনে হওয়াতে পুরোপুরি নেমে পড়েছিল লাইনে। তখন আর কেবল মাত্র মিশিরের যোগানদার থাকে নি, অথবা শুধু মাত্র বাওয়ানী মেয়েদেরই দালাল—রেণ্ডী পাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাবু মহল্লার চ্যাংড়া আইবুড়ো বাবুদের নিয়মিত 'সাপ্‌লির' (সাপ্লায়ার) হয়েছিল। আর যতোই হাতে দু'পয়সা এসেছে, লোভটাও চড়ে চড়ে গিয়েছিল। ব্যবসার লাইনটাকেও মনে হয়েছে খুবই রীতিসম্মত, সৎপথের উপার্জন। খাটাখাটনি সামান্যই, অথচ রোজগার বেশ মোটা।

তারপর একদিন ওই রেণ্ডী মেয়েদের দালাল হয়েই সে ওদের সঙ্গে ওপারের শহরে চলে গিয়েছিল।

বহু ঠেক্-খাওয়া জাদান মানুষের আজ বুঝি পুরোপুরি মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। হারুলোর আকস্মিক চিৎকার করে উঠল, শোহুর যেছিলম হঁ, শোহুর। পাখ্‌না গজায়েচিল। শুয়াড়ীং থিক্যা হতে চেছিলম একুখান বড় চেঁড়ে। হাঁসিল গ। আরগুলা থেকে বড় পাখি, রাজহাঁস। আখুন সিটোর সাধ জন্মের মতো মিট্যে যেছে, হঁ। বলেই তারপর সহসা ভুরভুরিয়ে কেঁদে উঠল। পরে ধড়াস করে আবার আছড়ে পড়ল মাটির ওপর। এক খাব্‌লা মাটি খুঁটে নিয়ে দম ভরে তার আঘ্রাণ নিল। দাঁতে-জিবে ছোঁয়াল।

মেঘ সরে গিয়ে এখন আবার আলো ফুটেছে। পিছনে টিবির চূড়া স্বর্ণ-সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত মনে হয়। দূরের বন কাঁপছে সিকসিক করে। কোথায় বুঝি একটা গেঁধা পাখি ডেকে উঠল। ডাকটা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

তাদের নিবিড় অরণ্যানী ঘেরা গ্রামের মতো শান্ত, সবুজ নয় শহরের পরিবেশ। আকাশের ওই রঙ, নদীর চলাও দেখা যায় না। তার বদলে কলের ধোঁয়ায় আর কয়লার ধুলোতে সমাচ্ছন্ন বায়ুস্তর। আকাশ হয়ে থাকে গাঢ় পীতাভ রঙের। কখন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত হল, কিছুই টের পাওয়া যায় না। আর আকাশের চালিটাও যেন অনেক ছোট সেখানকার। অচিরেই নেশা কেটে গেছে।

এমনদিনে আরেকটা কাণ্ড ঘটে। একটা মাতাল লোক এসেছিল রেণ্ডী পাড়ায়। লোকটা বুঝি ফড়ে-টড়েই হবে, গুছিতে এক বাণ্ডিল তুলকার নোট ছিল। তাই দেখে লোভে চোখ নেচে উঠেছিল হারুলোরের। এক ঘাই দাগতে তৎপর হয়েছে। কিন্তু পাজীটা এমন শেয়ানা, অত মদ গিলবার পরও যে পুরোপুরি হুঁশে আছে— আগে খেয়াল হয় নি। হাতেনাতে খপাৎ করে ধরে ফেলল তাকে। তারপর বেদম পিটিয়ে চৌকিদারের কাছে হাওয়ালা করে দিল।

কারাগারের বন্ধ খোপে পরে একটি মাস তাকে কাটাতে হয়। শেষে ছাড়া পাওয়া মাত্র মনে হয়েছে, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। কেবলই মাওসী জাদান গাঁয়ের কথা মনে পড়েছে। অতদূর বিদেশ থেকে হেঁটে আসতে গেলে সময় অনেক লাগবে। পথ খরচাও কিছু দরকার। কিন্তু হারুলোরের তখন আর এক মুহূর্তও সহ্য হচ্ছিল না। এসে দাঁড়িয়েছিল নদীর তীরে। দিকটা নির্ণয় করতে যেটুকু সময় লেগেছে। উজানী স্রোতে অতঃপর বাবা-পুরকনের নাম স্মরণ করে মেরেছে এক লাফ। অবশেষে সারাটা দিন জলে ভেসে, এখন এইরাত্রে বনের পাক্‌দণ্ডী ঘুরে এসে পৌছয় আপন জেরাত-ভূমিতে।

হারুলোর এতক্ষণে বুঝি কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। সে এবার একটুক্ষণ দেখল হাসনার দিকে।—কে রে তু, চোঙার হপন্ না? তু ত ঝউলীর বাহু? চোঙার ছেলে, আর ঝউলীর পুত্রবধূ।

তারা সম্মতি জানালে, হারুলোর আবার ভ্যাঙ্গভ্যাল করে ডুকরে কেঁদে উঠল। পরে চিৎকার শুরু করল, যেন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে।—মো পাপ কর‍্যাচি। তুয়ারা মোকে শাস্তি ত্তে কেনে। একটু থেমে আবার বলল, মো এট্টা কাক্কাই। নরাধম। খুন কর্ গ, মোকে। বলে নাচের ধুম তখন কত তার। বুড়ো বয়সেও যে এমন কোমর-কাঁখাল বেঁকিয়ে কেউ নাচতে পারবে, ভাবাই যায় না। তারপর যখন বেশ হাঁপিয়ে পড়ে, আবার মাটিতে আছড়ে পড়ে কাদা খামচাতে থাকল আর সঙ্গে সেই হু-হু করে কান্না।

হারুলোরের চিৎকার ও কান্না অনেকক্ষণ ধরে কেঁপে কেঁপে বাজল। এবার হাসনা ও লাছলী এক রকম জোর করেই তাকে টেনে তুলে পট্রির পথে রওনা করিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু সহজে কি তাকে রোখা যায়! বাওয়া স্বভাবে সে এখন দুর্দম হয়ে উঠেছে। সাঁইটেল জোয়ান মদ্দ। বক্‌বক্ করেই চলেছে।

হাসনা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল। তবু বুড়োর বকবকানি বন্ধ

হয় না। আবার মুখ চলে।—কত বং হয়্যা যেছিস রি। অঁা, দেখি? হেই, এল্লাবঙ্গা! ফির্ গোঁফেরও মোচর তুলেচিস যি একুখান! সাবাস, কি হলি ধন্! বলে খপাৎ করে হাসনার দুই হাত জড়িয়ে ধরে। পাড়াঘরে এখন যে ব্যবহার ঠিক খাপ খায় না, হারুলোর তাকে নিবিড় স্নেহে বুকে টেনে নিল। এবং সম্ভবত দীর্ঘদিন পর একটা গভীর পরিতৃপ্তির স্বাদ অনুভব করল অন্তরে, একটুক্ষণ চোখ বুজে ঝিম মেরে রইল।

হাসনা ডাকল, হুডিং-আপুং, টুকুন সহজ হও গ। তার হাত ধরে মালিস করার মতো ডলে দিল।

হারুলোর বললে, হঁ রি, বুঝি সবই। খেদ কর‍্যা আর কি হবেক। তুল্কা চেছিলম মোরা, সিটো বড় কষাণ দিয়া পেছি গ।

যন্ত্রের মতো হারুলোরও আজ যেন ডমরুর কথার প্রতিধ্বনি গাইবে। গাঁয়ের এতসব শ্রীবৃদ্ধি, আর মোটেই শ্রীবৃদ্ধি বলে মনে হয় না। হঠাৎ সে হাত ছাড়িয়ে আবার ছুটে গেল নদীর দিকে। নদীর ওপর বাঁধটা বুঝি তার মনে হল প্রকাণ্ড একটা দড়ির ফাঁস। আর ওই ফাঁসেই গলা আট্‌কে একদিন তারা নিকেশ হবে। তারপর বুঝি আরো মনে হল—আগে এই নদী অরণ্যরাজ্যের পাড় ভাঙত, বন্যায় ডুবিয়ে দিত রালের ক্ষেত, রাসুজনী গমের চারারা ভেসে গেছে কতবার—কিন্তু তখন নয়, এখনই তাদের জেরাত-গাঁ বন্যায় ডুবতে বসেছে। সহসা ক্ষিপ্তের মতো হাসনার দিকে ফিরে সে ধমকে উঠল।—ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবি লাই মেলা! বুদ্ধি দিচে গ, এহেঃ! তারপর হঠাৎ যেন জানতে চাইল, পারবি তুই বেড়টো ধূলা কর‍্যা ফেলাতে? বুঝতম তয়, খাঁটি বাপই তুয়ারে জন্ম দিচে গ। ফাঁক-ফোঁকরের সান্তান লয়। তারপর গণ্ডুস ভরে খানিকটা জল খেয়ে, 'হেই আয়ু গ'বলে আরেকটা হুতোশভরা আকাশ-ফাটা চিৎকার দিল। শেষে ধেয়ে নেবে চলল নদীর গভীরে। যেন সে নয়, তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে অদৃশ্য অন্য কেউ।

লাছলী চুপ। হাসনাও।

ওরা কেউ মুখে কোন ডাক দিতে যেন পারে না। হারুলোরের দেখা চড়ির ফাঁসটা যেন তাদের গলাতেই জড়িয়ে গেছে।

ক্রমে রাত গভীর হয়। দুই পঙ্গু আত্মা ভূতে পাওয়ার মতো একঠায় বসে থাকে। দৈহিক স্থবিরতা যেন তাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। গাঢ়, গভীর নিঃশ্বাস পড়তে থাকল শুধু আর বদ্ধবাক্ অসহায়তায় আলিঙ্গন তাদের কোন সময়ই শিথিল হয় না।

নালা ঁপাচে নোংরা কিছু ভাসছে নদীতে। দুহিনায় এখনো তেমন ঝাপ্‌টা লাগে নি। তবে দিনও আর বেশী নেই, এটা বোঝা যায়। আগমনী সংকেত লেগেছে জল-জঙ্গলের বর্ণ-খেলায়। জল এরই মধ্যে অল্প-অল্প করে ঘোলা হতে শুরু করেছে। অতএব অচিরেই রঙ্গিণী নাচন শুরু হল বলে।